"ওই যে নগরী/জনঅরণ্য শতরাজপথ গৃহ অগণ্য
কতই বিপণি কতই পণ্য কত কোলাহল কাকলি—

—রবীন্দ্রনাথঠাকুর

কোলাহল মুখর জনঅরণ্য
কলকাতা শহরের
নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যকে
উন্নততর করতে
আমরা সতত সজাগ

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলকাতা পুরসভা

সাক্ষরতাই দেশের মূল সম্পদ

বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে
রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার আলো।

কমছে নিরক্ষরতা
বাড়ছে নবসাক্ষরের সংখ্যা।

কেবল উৎসাহদান নয়
আসুন, আমরাও নেমে পড়ি কাজে।

শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ঃ গণচেতনার অপর নাম

এখন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে উপজাতি, তপশিলী সম্প্রদায় ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়েছে। পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক প্রশাসনেরও উন্নয়নশীল পরিবর্তন এসেছে। স্বায়ত্তশাসনের পরিকাঠামো দৃঢ় করতে ও তৃণমূলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে গঠিত হয়েছে গ্রাম সংসদ। সভ্যতার বুনিয়াদ যে গ্রাম, তাই আজ নিশ্চিত অগ্রগতির পথে।

পঞ্চায়েত পাঁচজনের জন্য
পাঁচজনকে নিয়েই পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA—2310

নিম্ন-দামোদর উপত্যকায় বন্যা ডিভিসি কতটা দায়ী ?

দামোদর নদ এবং বরাকর ও কোনার নদীর বুকে গড়ে তোলা যথাক্রমে প্যাঞ্চেৎ এবং মাইথন, তিলাইয়া ও কোনার বাঁধের জলাধার থেকে কখন কি পরিমাণ জল ছাড়া হবে, তার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় জলসম্পদ কমিশনের নেতৃত্বে গঠিত দামোদর উপত্যকা জলাধার নিয়ন্ত্রণ কমিটি। চার সদস্যের এই কমিটিতে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ডিভিসি-র প্রতিনিধিরাও আছেন। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ কমিশনের প্রতিনিধি কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটি জলাধারে জল-প্রবাহের পরিমাণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাষ, নিম্নাঞ্চলে নদীজলের পরিস্থিতি ও অন্যান্য সম্পর্কিত অবস্থা বিবেচনা করে "দামোদর ভ্যালি রিজারভার রেগুলেশন ম্যানুয়েল"-এর হিসাবের ভিত্তিতে ডিভিসি-কে নির্দেশ দেয় কখন কত পরিমাণ জল বাঁধের জলাধার থেকে ছাড়তে হবে। ডিভিসি সেই নির্দেশই মান্য করে।

ডিভিসি নির্মিত চারটে বাঁধের সাহায্যে সাড়ে ছ'লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহকে আড়াই লক্ষ কিউসেক পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এবং বাঁধের জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ডিভিসি-র নেই।

দুর্গাপুর ব্যারেজের কি বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে ?

না। দুর্গাপুর ব্যারেজের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই। এই ব্যারেজ থেকে শুধু শিল্প ও কৃষির জন্য জলবণ্টন করা যায়। দুর্গাপুর ব্যারেজ ও নিম্ন-দামোদর উপত্যকার খালগুলির দায়দায়িত্ব ডিভিসি ১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হস্তান্তর করেছে। ব্যারেজ ও খালের রক্ষণাবেক্ষনের খরচের কিছু অংশ ডিভিসি এখনো পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেয়। কিন্তু ব্যারেজ ও খালের জল নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ও শিল্পের জন্য জলের চাহিদা মেটাতে ডিভিসি নির্মিত বাঁধ ও জলাধার-গুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে। নিম্ন-দামোদর উপত্যকায় আজ যে শিল্প ও কৃষির সমৃদ্ধি তার জন্য ডিভিসি-র পরিকাঠামোর অবদান অনস্বীকার্য।

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন
জাতীয় সমৃদ্ধির অন্যতম
অংশীদার

পরিচয়

জুন-জুলাই ১৯৯৬
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৩

১১-১২ সংখ্যা

বিয়োগপঞ্জী

প্রচ্ছদ ।।
দীপ্ত দাশগুপ্ত

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ
রঞ্জন ধর

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু অমিয় ধর

উপদেশকমণ্ডলী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৭

দাম ঃ ত্রিশ টাকা

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

রবীন সেন-রচিত 'পাঁচ অধ্যায়' গ্রন্থে সেনাবাহিনীর সকলবিভাগে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের প্রত্যক্ষদ্রষ্টার বর্ণনা আছে।) এটা ঘটেছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদানের শাস্তি দিতে উদ্যত ইংরেজ সরকারের 'দর্পচূর্ণ' করার লড়াইয়ের ফলে। স্বভাবতঃ সুভাষচন্দ্র তখন ভারতব্যাপী জনতার নয়নের মণি। মুসোলিনির উপাধি 'Duce' আর হিটলারের 'Fuhrer' শব্দ দুটির আক্ষরিক অনুবাদ 'নেতাজী' হলেও কারও মনে তা নিয়ে দ্বিধা নেই। দেশের ইতিহাসই যেন স্বাভাবিকভাবে সুভাষচন্দ্রের শিরে ঐ-মুকুট স্থাপন করেছিল। হরিপুরার পূর্বে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী সুভাষকে 'দেশগৌরব' আখ্যা দিয়েছিলেন। গান্ধীজীই যখন নিজের মহত্ত্ব ভুলে গিয়ে যেন স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাবেই সুভাষের প্রতি দুর্ব্যবহার করলেন তখন রবীন্দ্রনাথ 'দেশ-নায়ক' বলে সম্বোধন করে সুভাষকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। 'নেতাজী' বলে সুভাষকে সারা দেশ অকুণ্ঠে সম্মান তখন দেখিয়েছিল, '৪৫ সালে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু সংবাদকে বহুজনই মানেনি। আজও পর্যন্ত অনেকে মানেন না। তাই '৪৬-এর ২৩ জানুয়ারি তার জন্ম থেকে পঞ্চাশৎ বর্ষের সূচনা বলে দেশ জুড়ে তার জন্মক্ষণে (মধ্যাহ্ন) শাঁক, কাঁসর, ঘণ্টা ইত্যাদি বেজে উঠেছিল, গোটা ভারতবর্ষ সেদিন যেন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। উল্লেখ করছি এজন্য যে দেখি '৯৬ সালের ২৩ জানুয়ারি তার শতবর্ষ পূর্তির সূচনা নিয়ে অনুষ্ঠান হল সামান্য (তাও বিকৃত হল যখন প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতির উপস্থিতিতে কলকাতা বিমান বন্দরের সুভাষ-নামাঙ্কিত হবার অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা অবলীলাক্রমে ঘটল!) '৯৬-'৯৭ সাল জুড়ে দেশব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের সূচী রচিত হল না, হয়তো লোকসভা নির্বাচন আসন্ন বলে জানানো হল যে আগামী বছর ২৩ জানুয়ারি মহাসমারোহে পালিত হবে! ইতিমধ্যে সাত-আট মাস কেটে গেছে, সুভাষ-চন্দ্রের কীর্তি স্মরণের তেমন কিছু প্রয়াস দেখা যায়নি—এটা দৃষ্টিকটু, কারণ, একাধিক 'জাতীয়' নেতার জন্ম থেকে শতবর্ষ পূর্তি নিয়ে আলোড়ন হয়েছে বেশি। এ নিয়ে ঝগড়া চাইছি না, কিন্তু ভাবি শুধু যে এটা কি বর্তমানে 'মূল্যবোধ' বস্তুটিই অন্তর্ধান করার এক উদাহরণ? একটু আশ্চর্য লাগে যে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা কর্ম সংগ্রাম বিশেষত যাদের প্রায় একমাত্র রাজনৈতিক মূলধন, তারাও সোচ্চার তো হলেন না! শুধু মাঝে মাঝে শুনি আওয়াজ যে ২৩ জানুয়ারি গোটা দেশে 'ছুটি' ঘোষণা করতে হবে। কর্মবীর সুভাষচন্দ্র ছিলেন শৃঙ্খলাপরায়ণ, সতত কর্মে ব্যাপৃত হবার আকুলতা ছিল বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ 'ছুটি'-র দাবি যেন আজ জোরদার সব চেয়ে বেশি। এ নিয়ে, প্রকাশ্যে একাধিকবার, সাধারণ সভায় আমি চেঁচিয়েছি, সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ অনুচরদের উপস্থিতিতে। তাই ক্লিষ্ট হই দেখে যথাযথ-

ভাবে এই শতবর্ষপূর্তি উদ্যাপনে অদ্ভুত অনীহা। মনে এসে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কথা ঃ

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী.
রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করো নি।"

নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে কুণ্ঠা আসে কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আলোচনায় হয়তো তার একটু দরকারও আছে। ১৯৩৬ সাল থেকে সেদিনের বে-আইনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে অজীবন রাজনীতিতে জড়িত রয়েছি। হরিপুরা-ত্রিপুরী (১৯৩৮-৩৯) কংগ্রেসের সময় এ-আই-সি-সি সদস্যরূপে সুভাষবাবুর কতকটা কাছাকাছি আসতে পেরেছি। তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে ব্যক্তিগতভাবে আরও বেশি জানার সুযোগ পেয়েছি; এই দুজনের ভূমিকা মার্কিন বিদ্বান Leonard Gordon-এর "Brothers Against the Raj" বইয়ে বিধৃত রয়েছে। ১৯৩৯-৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের 'Forward Bloc' পত্রিকায় লিখেছি। মনে পড়ে ১৯৪০ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে সুভাষবাবুর কাছে গিয়ে আলোচনায় যোগ দিয়েছি। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি সুভাষচন্দ্রের স্মরণীয় ভাষণের তারিফ করেছি। ত্রিপুরীতে তাঁকে গঞ্জনা ও যন্ত্রণা দেবার যে অপচেষ্টা চলেছিল তার বিরোধিতায় থেকেছি। ১৯৪১ সালে ইংরেজের জেলখানার বাধা টপকে ছদ্মবেশে তাঁর কাবুল হয়ে ইয়োরোপ যাত্রাকালে ভগৎরাম তলোয়ার-এর মতো কম্যুনিস্টের সাহচর্য ও সহায়তার সংবাদ পরে জেনেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা ফ্যাসিস্ট পক্ষকে সাহায্য দিতে পারে আশঙ্কায় কঠোর সমালোচনা থেকে নিরস্ত হইনি। যদিও কম্যুনিস্ট প্রচার পত্রিকায় অতিরিক্ত কটু মন্তব্য ও ব্যঙ্গ চিত্র বিরক্ত করেছে। যুদ্ধশেষে 'India Struggles for Freedom' (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছি সুভাষচন্দ্রের মূলগত ফ্যাসিজম্ বিরোধিতার কথা (এর উল্লেখ একাধিকার করেছেন ফরোয়ার্ড ব্লক-এর প্রয়াত নেতা নির্মল বসু)। আজাদ হিন্দ ফৌজের দেবনাথ দাশ, প্রমোদ সেনগুপ্ত, জেনারল শাহ্ নওয়াজ খান, জেনারল ভোঁস্‌লে প্রভৃতি আমার বিশেষ বন্ধু বলে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। স্বভাবতই সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে বহুদিন অনুশীলন ও চিন্তা করেছি।

কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত (১৯৬৪) হবার আগে ১৯৬২ সালের নির্বাচনকালে সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার জনসভায় প্রকাশ্য ঘোষণা করেন যে যুদ্ধকালে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে যেভাবে দেখা হয়েছিল তা ছিল ভ্রান্ত আর তাতে আতিশয্যের মাত্রা ছিল অমার্জনীয়। কেন জানি না, কিন্তু বার বার দেখি যে এ-ধরনের কথা সত্তরের দশকের

শেষ দিকে জ্যোতি বসু বুঝি প্রথম বলেন। কিন্তু ঘটনা এই যে তার বহু পূর্বেই পার্টির সাধারণ সম্পাদক এই বিভ্রান্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন। একই সঙ্গে বলি যে ১৯৭৭ সালে ২৩শে জানুয়ারি প্রকাশিত হয় আমার লেখা "Bow of Buring Gold : A Study of Subhas Chandra Bose" পার্টিরই প্রকাশক People's Publishing House, New Delhi-র উদ্যোগে। পার্টির কাছ থেকে বাধা বা ভর্ৎসনা পাই নি। অসংখ্য সভা-সমিতিতে (এবং বিশেষত ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে) সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমার বহু বিষয়ে মৌলিক মত পার্থক্য সত্ত্বেও শ্রদ্ধা প্রকাশে কার্পণ্য করি নি। উচ্ছ্বাসের অতি প্রাবল্য পীড়িত করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'কীর্তির্যস্য স জীবতি' এ-কথা সত্যবলেই দেশের অন্যতম অবিস্মরণীয় জননায়ক রূপে সুভাষ কীর্তিত হতে থাকবেন।

★ ★ ★

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে দেশ যখন মাতোয়ারা তখন সুভাষচন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বাধীনতার লড়াইয়ে। বিলাতে সসম্মানে 'আই-সি-এস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেকালে শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে সবচেয়ে লোভনীয় চাকরির মোহ পরিত্যাগ করে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। বোম্বাই পৌঁছেই দেখা করলেন গান্ধীজীর সঙ্গে, দেখা করে খুব খুশি না হলেও মহাত্মার আহ্বানে সর্বস্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর কাছে গিয়ে একেবারে তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্যত্ব নিলেন। গান্ধী চরিত্রে বহু স্ব-বিরোধিতা সত্ত্বেও যে অনন্য মাহাত্ম্য ছিল তা মতভেদ সত্ত্বেও বুঝে-ছিলেন বলে ১৯৪৪ সালে বিদেশ থেকে মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীজীর সহায়তা চেয়ে "জাতির জনক" ("Eather of the Nation") বলে আহ্বান করতে পেরেছিলেন।

অল্প বয়সেই দেশবন্ধুর যেন দক্ষিণহস্ত স্বরূপ সুভাষচন্দ্র আজকের রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অবস্থিত মস্ত বাড়ি Sorbes Mansions-এ প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন'-এর অধ্যক্ষ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রচার ও অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মে লিপ্ত থাকলেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে কারাবরণ-কালে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে চৌরিচৌরা অভ্যুত্থানে ক্ষুব্ধ মহাত্মা প্রস্তাবিক সংগ্রাম প্রত্যাহার করায় দেশবন্ধুর ও নিজের মনের বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন কংগ্রেসে সক্রিয়; সুভাষ পেলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্য, সঙ্গে সঙ্গে নজরুল ইসলামের সামীপ্য, আর লিখলেন 'তরুণের স্বপ্ন'। অচিরে সবাই জানল এই নবীন দেশব্রতীকে, যার স্বদেশ-মুক্তি ছাড়া চিন্তা নেই। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো একান্ত একাগ্র সংকল্প নিয়ে মুক্তি প্রয়াসে কর্মশক্তি, ত্যাগ স্বীকার আর কৃচ্ছ্রসাধনে সর্বদা প্রস্তুত

এই তরুণ দেশনেতার সমাদর পেতে লাগলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুকালে (জুন ১৯২৫) সুভাষ ছিলেন জেলে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে দেশবন্ধুর স্থলাভিষিক্ত হলেন 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। কিছু পরে বিসংবাদও তখন দেখা দিয়েছিল কিন্তু স্বমহিমায় সুভাষচন্দ্রের জনমনে প্রতিষ্ঠা অটুট ছিল।

ভুলে যাওয়া অনুচিত যে দেশবন্ধুবিহীন কংগ্রেসে বহু ক্ষুদ্রতা ও ব্যর্থতা দেখা দিয়েছিল। হিন্দুমুসলমান মৈত্রীকল্পে দেশবন্ধুর পরিকল্পনা নানা কারণে পরিত্যক্ত হয়, যার ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বৃদ্ধি পায়, বাংলার কৃষকসমাজ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যে দেশ বিভাগের যন্ত্রণা আজ সবাইকে ভুগতে হচ্ছে তার সূচনার সন্ধান সেখান থেকে মিলবে। সুভাষচন্দ্র প্রায়ই কারারুদ্ধ (এবং মাঝে মাঝেই অসুস্থ) থাকায় এবং কিছু পরিমাণে বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বের অল্পমতি বিবাদ-পরায়ণতার কাছে তাঁর পক্ষে অবস্থার অধোগতি আট্‌কানো সম্ভব হয়নি। একবার এমনও আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় (১৯৩৬/৩৭ নাগাদ সময়) যে কলকাতা কর্পোরেশনের 'মেয়র' নির্বাচনে স্বয়ং সুভাষ (তখন কারাবাসে) পরাজিত হলেন নগণ্য 'নরমপন্থী' 'লিবারল' বিজয়কুমার বসুর কাছে! হয়তো এ-ঘটনা তুচ্ছ, কিন্তু বহু বৎসর ধরে বাংলায় কংগ্রেসের 'ঘরের ঝগড়া' ছিল মারাত্মক, একাধিকবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে এখানে হস্তক্ষেপ করতে হত, 'ad hoc' প্রাদেশিক কমিটি খাড়া হত, দুটো কমিটি কাজিয়া চালিয়ে যেত! আমাদের এই বাংলায় কংগ্রেসের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য যে নেই তা নয়। কিন্তু বহুবারই এখানে দেখা দিয়েছে পরস্পর কলহের চূড়ান্ত। তাকে পরাস্ত করার সাধ্য সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।

যাই হোক্, বিশের দশকের শেষ দিকে আর ত্রিশের দশক জুড়ে গোটা দেশে শুধু তরুণ সমাজ নয় সঙ্গে সঙ্গে তখন প্রবলভাবে জায়মান বামপন্থার দুই প্রধান প্রবক্তা হলেন জওয়াহরলাল নেহরু আর সুভাষচন্দ্র বসু। ইংরেজ সরকার তখন 'লাল জুজু'-র ভয়াক্রান্ত অবস্থায় 'বলশেভিজ্‌ম্‌'-এর বিপদে ব্যাকুল। গোয়েন্দা রিকোর্টে বলা হল যে এই দু'জন 'পালের গোদা' হয়ে সমাজবাদ-সাম্যবাদ আনতে চাইছে, লেনিন-স্টালিনের ভূমিকায় নাম্‌তে চলেছে! (সরকারি কেতাবে, যেমন R. Coupland-এর বইয়ে এর সাক্ষ্য রয়েছে)। এটা শুধু কথার কথা নয়, যদিও বাড়িয়ে বলার এ হল একটা উদাহরণ। কিন্তু দুজনই নিজস্ব ভঙ্গিতে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাছাড়া প্রাক্তন 'সন্ত্রাসবাদী'-দের মধ্যে অনেকেও ঐ-নতুন রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন বলে ইংরেজের ভয়টা নেহাত অমূলক ছিল না।

অবশ্য তখন সাম্যবাদীরা ছিলেন মুষ্টিমেয় আর এজন্য তাদের বাদ দিয়ে

ঐ দু'জনই হলেন সব চেয়ে সোচ্চার যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবি উঠতে থাকল (১৯২৭-২৯)। উভয়ের মধ্যে জওয়াহরলাল ছিলেন তুলনায় অব্যবস্থিতচিত্ত। গান্ধীজীর 'জাদুকরি' (এটা নেহরুরই কথা) মোহে তিনি প্রায়ই দিশাহারা হয়ে পড়তেন। সমঝোতা করতে সুভাষও বার বার বাধ্য হতেন কিন্তু তুলনায় তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, তার গঠনে লোহার ভাগ ছিল বেশি।

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বাধিনায়ক ('General Officer Commanding') রূপে দেখা গেল সুভাষকে। বিদ্রূপ করল কেউ কেউ ('শনিবারের চিঠি' ব্যঙ্গচিত্র ছাপাল 'গক্' বলে, নতুন এক আখ্যা ঐ-কাগজই সুভাষকে দিয়েছিল ঃ 'খোকা ভগবান'!), কিন্তু সাধারণ মানুষ মুগ্ধ হল। এটা কিন্তু শুধু পোশাকের ব্যাপার নয়, আমাদের মতো শিথিল, আলগা স্বভাবের দেশে শৃংখলা (যার পরাকাষ্ঠা সামরিক পদ্ধতিতে যে কত গুরুতর তা সুভাষ সর্বদা বুঝতেন আর সেজন্যই উত্তর জীবনে একক কীর্তির প্রোজ্জ্বলতম পর্যায়ে) 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর সর্বাধিনায়ক এই মানুষটিকে দেশ দেখেছে। মনে পড়ে যায় ব্রহ্মদেশে ('মিয়ানার') কারাবাস-কালেই মান্দালয়ে দিল্লীর শেষ বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ জাফর-এর সমাধি পার্শ্বে সুভাষচন্দ্রের অশ্রুবর্ষণ। তাঁর মনে এসেছিল সম্রাট-কবি ঐ-হতভাগ্যেরই রচনা ঃ "আত্মত্যাগী যোদ্ধাদের কর্তব্যপরায়ণতার সৌরভ অক্ষুণ্ণ থাকলে হিন্দোস্তানের তলোয়ার লণ্ডনের সিংহাসন পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য বেগে ছুটে যাবে!"

★ ★ ★ ★

সন্দেহ নেই যে 'গান্ধী মহারাজ' (এ নামেই একদা সারা দেশ তাঁকে জানত) সুভাষকে স্নেহ করতেন। সুভাষের 'মৃত্যু সংবাদ' (১৯৪৫) ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী সুভাষের মাতৃদেবীকে জানান তিনি বিশ্বাস করছেন না। যাই হোক্, অনেকেই জানেন না যে গান্ধী ভক্তদের মধ্যে 'সর্দার' বলে নন্দিত বল্লভভাই পটেল সুভাষের ওপর এমনই খাপ্পা ছিলেন যে ইয়োরোপে একত্র প্রবাসকালে একত্র বাস করে তাঁর দাদা ভিঠলভাই পটেল (পূর্বতন কংগ্রেস নেতা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ) 'উইল' করে সুভাষকে দেশহিতকর কর্মের ভার পালনের জন্য যখন লক্ষাধিক টাকা দিয়ে যান তখন নোংরা আক্রোশ নিয়ে বল্লভভাই মামলা ঠুকে দেন আর সুভাষকে সে টাকা থেকে বঞ্চিত রাখেন! গান্ধী ভক্তির নামে সুভাষের নেতৃত্বকে বাধা দেবার জন্য যে কত-কুকর্ম ঘটে তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছি হরিপুরা (১৯৩৮) আর ত্রিপুরী (১৯৩৯) কংগ্রেসে। যাক্ সে-কথা। কিন্তু দুঃখ হয় ভেবে যে ত্রিশের দশকের শেষ দিক থেকে বামপন্থী

মহল হয়তো প্রকৃত শক্তিশালী হয়ে দেশের গোটা ভবিষ্যৎ অন্য খাতে বদ্‌লাতে পারত যদি সেদিনের জনগণ মোর্চা সুভাষ এবং জওয়াহরলালের সমবেত সমর্থনে পুষ্ট হতে পারত। খেদ করে লাভ নেই, তবু মনে পড়ে বলে লিখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে যে জওয়াহরলালকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন সুভাষের সঙ্গে খোলা মনে হাত মেলাতে তিনি পারেননি। ম্লান হেসে জওয়াহরলাল একটু স্তব্ধ হয়ে থাকার পর বলেন যে সুভাষ এবং তার দাদা শরৎকে তিনি সত্যই স্নেহ করতেন কিন্তু হয়তো মেজাজের তফাত (বিশেষত আন্তর্জাতিক ঘটনা বিশ্লেষণে) কেমন যেন ছিল আর কংগ্রেসের তৎকালীন হালচালের কারণ কতকগুলো দুস্তর বাধা এসে পড়ত। "সবকিছু বোঝানো কঠিন" বলে জওয়াহরলাল আমাকে মন দিয়ে "A Bunch of old Letters"-এ সুভাষ-শরতের সঙ্গে পত্রালাপ পড়তে পরামর্শ দেন। বলে রাখি যে তা ছিল আমার আগেই পড়া কিন্তু আমার মন তুষ্ট হয়নি। তবে এই দুই মহারথীকে একত্র করতে না পারার দায়িত্ব যে বেশ কিছু পরিমাণে পড়ে আমাদেরই, অর্থাৎ কম্যুনিস্ট-সোসালিস্ট নেতৃত্বের উপর পড়ে তা অস্বীকার করতে পারি না। আক্ষেপ করে লাভ নেই, তবে মনে রাখা দরকার। আজও পর্যন্ত বামপন্থী (অর্থাৎ আমাদেরই) প্রচারে গান্ধী-নেহরু থেকে শুরু করে কেবলই অপর নেতাদের দেশের সর্ববিধ দুর্গতির জন্য দায়ী করার 'স্বভাব' গেল না। জাতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক না হলেও প্রভাবশালী হতে পারতাম অথচ পারিনি—এই চিন্তা হয়তো আমাদের আন্দোলনকে একই সঙ্গে সুবিনীত, সততা-চালিত ও যথাসম্ভব সার্থক করতে পারত।

সুভাষচন্দ্রের সুহৃৎ ও সহযোগী কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 'সুভাষ-চন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' শিরোনামায় এক সুপাঠ্য গ্রন্থ লিখে গেছেন। উচ্ছ্বাসের আধিক্য বিকৃতি ঘটায় বলে সুভাষচন্দ্রের জীবন সাধনা কায় মনোবাক্যে লক্ষ্যসাধনের একাগ্র প্রজ্বলন্ত পরিক্রমার যথোচিত বিশ্লেষণের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। সেই কর্মকাণ্ডের ক্রমান্বিত বিবর্তন (যা চল্লিশের দশকের সূচনাকালে প্রায় মহাকাব্যিক চরিত্র নিয়েছিল)। নানা দিক থেকে জওয়াহরলালের ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত আকর্ষিত করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ত্রিশের দশকের শেষদিকে কবি 'দেশনায়ক' সম্বোধন-সহ সুভাষকে; "দুঃসাহসিক অভিযানে তোমাকে আমাদের যাত্রা নেতার পদে আহ্বান করি।" পার্থিব অর্থে বহু অসার্থকতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের কপালে এই জয়টীকা তার সবচেয়ে অম্লান সম্মান হয়ে ঠেকেছে।

এভাবে লিখছি বলে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রায় আজীবন সংশ্লিষ্ট বলে আমাকে কিছু বিদ্রূপ শুনতে হয়েছে এবং হবে জানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-

কালে ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর মতো বীভৎস পৈশাচিক শক্তিকে প্রতিহত করার স্বার্থে সুভাষচন্দ্রের অনুসৃত পথের সুতীব্র নিন্দা আমরা করেছি। না করে পারি না। যখন জওয়াহরলালের মতো ব্যক্তি চীন আর সোভিয়েটের ধ্বংস-সম্ভবনা ভেবে এমনই ব্যাকুল যে গান্ধীজী লিখছেন যে "সেই আবেগ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না", যখন জাপানি সহায়তায় সুভাষচন্দ্রের স্বদেশে উপস্থিত হবার কোলাহল সর্বত্র, তখন জওয়াহরলাল বলেছিলেন যে অমন কিছু ঘটলে "আমি নিরস্ত্র হয়েও বাধা দেব শেষ অবধি" তখন ফ্যাসিজ্‌ম্‌-এর বিশ্বজয় সম্ভাবনা প্রকট বলে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য অনুমান করা খুব কঠিন হবার কথা নয়। আমাদের প্রচার-পত্রাদিতে কটু কথার বাহুল্য অবশ্যই নিন্দনীয়, কিন্তু 'দেশদ্রোহী' বলে যখন আমরা অভিযুক্ত হয়ে চলেছি, দেশাভিযান থেকে সমাজবাদ-সাম্যবাদে উত্তীর্ণ হয়েও যখন সবচেয়ে সাংঘাতিক ও যন্ত্রণাদায়ক এই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি। তখন আমাদের প্রতিক্রিয়ায় আতিশয্য দেখা দেওয়া আশ্চর্য ঘটনা তো নয় (তাছাড়া জার্মানি ইতালিতে ১৯৪১-৪২-এ সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিষয়ে সংবাদও আমরা যথাযথ পেতাম না। এজন্যই অর্থাৎ আমাদের প্রকৃত মনোভাব অজানা ছিল বলেই ১৯৪৫-৪৬ সালের "An Almost Revolution" কালে (কমুনিস্ট বিদ্বান গৌতম চট্টোপাধ্যায়-এর রচনা) আমরা সবাই মিলে বেশ কিছুকাল লড়াইয়ে নেমেছি। নিজের কথা বলতে কুণ্ঠা, কিন্তু এজন্যই স্বয়ং শরৎ-চন্দ্র বসুকে আমি আনতে পেরেছি কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির সভায়, যেখানে তিনি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার বেশ মনে আছে তাঁর সঙ্গে লম্বা আলোচনা যার শেষে আমাকে তিনি বলেছিলেন (অনেকে অবিশ্বাস ভাববেন, কিন্তু আমর কানে আজও তা বাজছে) "Perhaps, Hiren, may concede that we had made a historic miscalculation" (কথাটা ইংরেজীতেই বলেছিলেন। যদিও সাক্ষী ডাকতে পারব না।)

"The Indian Struggle" গ্রন্থে কম্যুনিজ্‌ম্‌ ও ফ্যাসিজ্‌মের একটা সামঞ্জস্যের কথা বলার পর সুভাষচন্দ্র মত পরিবর্তন করেন। রজনী পাম্‌ দত্ত-এর 'Labour Monthey-তে প্রবন্ধ লেখেন, দেশে কম্যুনিস্ট পত্রিকা 'National Front'-এ লিখতে সংকোচ করেন নি। তাঁর নিজস্ব 'Forward Boloc' পত্রিকায় কমরেড গোপাল হালদারকে সহায়ক রূপে নিয়েছিলেন। আমাকেও একাধিকবার লিখিয়েছিলেন। হরিপুরা কংগ্রসে সুভাষচন্দ্রের ভাষণকে কম্যুনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতা বলেন "the best ever" 'সেই বক্তৃতায় (১৯৩৮) ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দেশবিভাগ চক্রান্ত এবং তার বাস্তব আশঙ্কার কথা সুভাষচন্দ্রের মতো স্পষ্টভাবে কেউ বলেননি। ত্রিপুরী কংগ্রেস

সভাপতিরূপে তাঁর দ্বিতীয় নির্বাচন প্রস্তাব প্রথম এসেছিল কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। হরিপুরা অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র শুধু দেশবিভাগের সম্ভাবনা আলোচনা করেননি, ১৯২৮-২৯ থেকে নেহরু প্রচারিত ও সোভিয়েট আদর্শে অনুপ্রাণিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং পরে কলকাতায় এক সভায় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার প্রশ্নের জবাবে বলেন যে আমাদের মতো দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে হলে চাই "a forced march"—অর্থাৎ তথাকথিত 'গণতন্ত্রে'র দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক সুব্যবস্থাকে বাধা দিতে দেওয়া হবে না। হরিপুরা অভিভাষণেই রোমান হরফে 'হিন্দোস্তানী' প্রচলনের ওপর জোর দিয়েছিলেন—পরে আজাদ হিন্দ ফৌজে এটা তিনি কার্যকরী করেন বহু পূর্বে কলকাতায় ব্রাত্যসমাজ কর্তৃক স্থাপিত 'সিটি কলেজে' ছাত্রদের সরস্বতীপূজা করার অধিকার নিয়ে তিনি আন্দোলন করেছিলেন, পারিবারিক সূত্রে শাস্ত্রীয় বিধিবিধানে যার আস্থার অভাব ছিল না, জ্যোতিষেও যার বিশ্বাস ও কিঞ্চিৎ নির্ভরতা ছিল, মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি যজ্ঞ করে মানুষের ইষ্টানিষ্ট সম্ভব বলেও হয়তো তিনি ভাবতেন (১৯৩৮-৩৯ নাগাদ সময়ে তাঁর লেখা "A Strange illness" "রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের Modern Reniw-তে প্রকাশিত)। তিনি যে যুদ্ধকালে আচার বিষয়ক সকল ক্ষুদ্রতা উর্ধ্বে উঠেছিলেন তা বিস্ময়কর।

মুসোলিনি-হিটলার-এর আসল মতলব ধরতে পেরে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতা হিসাবে আত্মমর্যাদা ও দেশের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের অসমসাহস তৎকালে জানা না থাকলেও পরে আমরা জেনেছি। সোভিয়েট যুদ্ধে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর একজনকেও নিযুক্ত করা যাবে না ছিল তাঁর দাবি। বেশ কয়েকজন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর সদস্যকে এজন্য প্রাণও দিতে হয়েছিল কিন্তু সুভাষচন্দ্র ছিলেন অটল। পশ্চিমী ফ্যাসিস্টরা যে ভারতবর্ষের মুক্তি বিষয়ে শুধু উদাসীন নয় শত্রুতাও পোষণ করে। একথা জেনেই তিনি নিজের ও দেশের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে গেলেন যুদ্ধের প্রাচ্য ভূখণ্ডে। বহুকাল অস্ত্র ব্যবহায়ে অনভ্যস্ত, যুদ্ধের মতো সামগ্রিক জাতীয় সংকটের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত (শুধু উলুখড়ের মতো মরা, অনাহারে অত্যাচারে মরা ছাড়া) দেশের প্রতিনিধি এই সমুজ্জ্বল মানুষটি 'সাব-মেরিন' যাত্রা করলেন বিপৎসংকুল সুদীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রমের জন্য। সঙ্গে নিলেন একমাত্র সাথী আবিদ হাসানকে। এখানেই বলে নিই আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বে মুসলমান, শিখ খ্রিস্টান, হিন্দু সবাই ছিলেন 'সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের সহযোগী হয়ে। হবিবুর রহমান, জেনারল কিয়ানি, শাহ্‌নওয়াজ খান প্রভৃতি তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁর সহযোগী জেনারল এ-সি-চ্যাটার্জি'র বইয়ে আছে যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এক মন্দির

থেকে বহু অর্থ দেবার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করার জবাবে তিনি বলেন যে যেতে পারেন শুধু এক শর্তে তাঁর সঙ্গে মুসলমান, শিখ ও খ্রিষ্টান সহ যোগীরাও যাবেন!

★ ★ ★

কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়ে মানুষ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন যেন এসেছিল। চরিত্রবলে অপরকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ছিল সহজাত। কিন্তু তখন যে তিনি এক নতুন মানুষ। স্ত্রী পুরুষ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সহজ ব্যবহার তখন তাঁর যেন অভ্যস্ত। মনে আসছে তাঁর আজীবন বন্ধু দিলীপকুমার রায় এর কৌতুক যে ছাত্রাবস্থা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তায় তার ছিল অদ্ভুত আড়ষ্টতা (যা অবশ্য ভারতীয় সুলভ!) আজাদ হিন্দ ফৌজে সর্বাধিনায়ক ও আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধানরূপে সামরিক পরিচ্ছদে, কূটনৈতিক আদবকায়দায়, বহুবিধ পরিস্থিতিতে সাবলীল তেজস্বী উপস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের ঔজ্জল্যের সাক্ষ্য বহু সূত্র থেকেই মেলে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সম্পন্ন ভারতীয় পরিবার গুলির উপর আশ্চর্য প্রভাব এই ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় দেয়। তাই দক্ষিণ ভারতের সুপরিচিত (এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ) স্বামীনাথন পরিবারের লক্ষ্মীকে তিনি 'রানী ঝাঁসি বাহিনী'-র পরম উৎসাহী নায়িকা নিযুক্ত করতে পারলেন। জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্জির মতো অভিজাতমনস্ক পরিবার তাঁর একান্ত অনুগত হলেন, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সম্পন্ন ভারতীয়দের মধ্যেও বিপুল উৎসাহ তিনি জাগালেন স্বদেশের আসন্ন মুক্তিসংগ্রামে টেনে এনে। আমি লোকসভা সদস্য হিসাবে দেখেছি শাহ্‌নওয়াজ (তখন মন্ত্রী) বক্তৃতা করতে উঠে সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ করে অশ্রু-সংবরণে অসমর্থ। যদি কেউ বলে এটা রাজনৈতিক নাটক তাহলে আমি অন্তত মানব না। আমার আরও নিকট বন্ধু ছিলেন জেনারল ভোঁস্‌লে; একদিন তিনি তাঁর বাড়িতে আমার পাশাপাশি বসে সুভাষের কথা বলতে গিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ধারায় কাঁদলেন। Sandhurst-এ শিক্ষিত কিছুটা ব্রিটিশ মেজাজের এই মানুষটির অমন ভাবান্তর দেখার সাক্ষী তো আমি ছাড়া কেউ ছিল না। আরও অনেক

কথা জানি। কিন্তু দরকার নেই কথা বাড়াবার। নানাস্তরের নানা চরিত্রের মানুষের উপর যাদের প্রভাব এমন গভীর হয় তারা তো সামান্য ব্যক্তি নন। কেউ অবশ্য সনুভাষকে সামান্য মানুষ ভাববেন না। কিন্তু তিনিও তো রক্তমাংসে গড়া। যদিও তার উপাদানে ছিল এমন বহু পদার্থ যা মহত্ত্বেরই সূচক। এই সঙ্গে বলে রাখি যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে সুভাষচন্দ্রের এক মন্ত্রী ছিলেন (বোধ হয় কে-পি-কে-মেনন) তিনি ছিলেন রহস্যপ্রিয় আর মাঝে মাঝেই দফতরে এসে বলতেন ঃWhat is the state of head to day of our Head of state ?" এই সরস কৌতুকও বোধ হয় সুভাষ হাসিমুখে মানতেন।

"আমাকে রক্ত দাও, আমি দেশের মুক্তি এনে দেব"—সুভাষচন্দ্রের এই নির্ঘোষ শুধু ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে নয় তার চেয়ে বেশি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মাতিয়ে তুলেছিল, অকল্পনীয় উদ্দীপনার ঢেউ এনেছিল, দোষ-ত্রুটিশূন্য মানুষ কখনও হতে পারে না কিন্তু এই মহামতির সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে এসে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে যেন এক মানব বিপ্লব ঘটেছিল। মণিপুর রাজ্যের ইম্ফলের উপকণ্ঠে এসেছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ; জাপানের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাহায্য ব্যতিরেকেই এই অগ্রগতি। কঠোর বাস্তবের চাপে জাপানের অকাট্য আসন্ন পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে বঞ্চিত হতে হল লক্ষ্যসিদ্ধি থেকে। সতীর্থদের সম্মতি নিয়ে সুভাষ চললেন নব পথের সন্ধানে। হয়তো বা সোভিয়েতের ভূমির উদ্দেশ্যে। ভবিষ্যৎ হয়তো সেই মহাপ্রস্থানের বৃত্তান্ত উদ্ধার করতে পারবে। তিনি মৃত কি জীবিত, তা নিয়েও দেশবাসীরা অনেকে আশার আলো জেবলে রাখতে চাইছেন। ইতিমধ্যে দেশবিভাগের মূল্য দিয়েও দেশ যে স্বাধীন হতে পারল, সে-বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে এক প্রধান নির্ণায়ক শক্তি যে সুভাষচন্দ্রের কর্ম-কাণ্ড তা নিয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

সুভাষচন্দ্রের পূর্বসূরীদের মধ্যে ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে যতীন মুখার্জি ('বাঘা যতীন'), ১৯২৯-৩১ নাগাদ সময়ে তরুণ ভগৎ সিংয়ের

নেতৃত্বে হিন্দোস্তান রিপাবলিকান সোসালিস্ট আর্মি চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানের (১৯৩০) অবিস্মরণীয় নায়ক সূর্য সেন-এর মতো দেশব্রতী, জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোত (শত ত্রুটি সত্ত্বেও ছিল কংগ্রেস। যার সঙ্গে সুভাষ-চন্দ্রের যেন নাড়ির সম্পর্ক ছিল। অনন্য এই নায়কের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কালে কত বিস্মৃত কথাই না মনে ভিড় করে আসে। ইংরেজ শাসনের কৌশল ও কুহকে (কেবল তার শক্তির জন্য নয়) বন্দী হয়েছিল ভারতবর্ষ বহুবিধ অর্থে তার পূর্বসত্তা যেন হারিয়ে গিয়েছিল। নবজীবনের সূত্রসন্ধান পদানতও অবস্থায় সম্ভবই ছিল না। খণ্ডিত হলেও ভারত ভূখণ্ডের স্বাধীনতা বিশ্বের মানচিত্রে শুধু নয় তার মানসচিত্রেও পরিবর্তন আনল।

কল্পনা করে লাভ নেই যে হয়তো সুভাষচন্দ্র থাকলে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের অবনতি আর দেশবিভাগের সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে ওঠার মতো দুর্ঘটনা দেখা যেত না। অনুমাননির্ভর মন্তব্যের মূল্য অতি স্বল্প। তবু দুঃখ হয় ভেবে যে স্বয়ং গান্ধীজী দেশবিভাগ তাঁর শবদেহের উপর দিয়ে ছাড়া ঘটবে না ঘোষণা করেও ক্ষুণ্ণ মনে। জীবনধনদীন মুহ্যমান অবস্থায় বললেন; "কেউ কেউ বিপ্লবের কথা বলছেন; যদি তারা পারেন তো করুন, আমি অসহায়, অবসন্ন, অসমর্থ।" প্রিয় শিষ্য আবদুল গফ্‌ফার খান্ অনুযোগ করলেন যে তাকে নেকড়ে বাঘের মুখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ গান্ধীজীর তখন যেন হাত-পা-বাঁধা অবস্থা। স্বাধীনতার পাঁচ মাস পরে পাকিস্তানকে ভারত রাষ্ট্রের প্রদেয় ৫৫ কোটি টাকা দেবার জন্য নৈতিক চাপ তার কাছ থেকে এসেছিল বলে ক্ষিপ্ত হিন্দুত্ববাদী হত্যাকারী ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে মহাত্মাকে গুলি করে মারল। জওয়াহরলাল নেহরুর মতো রাজনীতিক্ষেত্রে বিরল সংবেদনশীলতার অধিকারী মানুষের মুখ থেকে এল হতাশ স্বীকৃতি; "আমরা ক্লান্ত, চারদিকে সাম্প্রদায়িক পৈশাবিকতাকে ঠেকাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র সম্ভাবনা ছিল দেশবিভাগ মেনে নেওয়া" (Michael Brecher, ক্যানাডাবাসী জীবনী লেখককে বলা কথা)। নেতৃত্বের উচ্চাসনে ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অভিমত হল ঝগড়া যখন এত বেশি তখন দেশবিভাগ মানাটাই দরকার—

তাছাড়া যুক্তি হল (যা সহজে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়) যে একই সঙ্গে পাঁচ শতাধিক চিত্রবিচিত্র 'দেশীয় রাজ্য'-কে অন্তর্ভূত করার কাজটা কম কঠিন নয়। সন্দেহ নেই যে বিবিধ হেতু সমাবেশে সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্বকল্পিত দেশভাগভিত্তিক "স্বাধীনতা" (ইংরেজ সংসদীয় আইনের ভাষায় বলল "ক্ষমতার হস্তান্তর") প্রায় যেন অনিবার্যরূপে দেশকে স্বীকার করতে হত। এর একমাত্র প্রতিবিধান ছিল বিপ্লব, ব্যাপক জন-অভ্যুত্থানের নবনির্মাণের সংগ্রাম। আমরা বামপন্থীরা যদি এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকি যে গান্ধী-নেহরুর ব্যর্থ হল, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দূরের কথা। তাকে এড়িয়েই রইল, তো আত্মতুষ্টি ঘটতে পারে কিন্তু তা হবে অতি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর অনুভূতি। সুভাষ তখন থাকলে কি হত। কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হয়েও কোনো লাভ নেই, বৃথা জিহ্বাদংশনে একটা জাতির শক্তির পরিচারক নয়। মূল কথা হল আমাদের বিভিন্ন স্তর ও বিভক্ত-বিশিষ্ট জাতীয় স্বাধীনতা প্রয়াসের অভ্যন্তরেই ছিল গভীর দুর্বলতা। বাম, দক্ষিণ, মধ্য—ইত্যাদি ভেদাভেদ এড়ানো চলে না। কিন্তু বাস্তব হল এই যে আমরা সবাই—বাম থেকে দক্ষিণ সর্বস্তরেই—দায়ী এই বিপুল ব্যর্থতার জন্য। আজীবন কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট থেকে আমার মন বলে যে আমাদের দায়িত্বও অস্বীকার করা চলে না। "এ আমার। এ তোমার পাপ!" গান্ধী-নেহরুর তুলনায় আমাদের দায়িত্ব কম হতে পারে কারণ অনেক বেশি আর ব্যাপক সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন, দেশবাসীর উজাড় করে দেওয়া আনুগত্যও মিলেছিল, কিন্তু তা বলে আমাদের দায়িত্ব কমে না। লজ্জার ভার লাঘব হয় না।

সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন স্মরণ করে বলতে ইচ্ছা যায় যে আমাদের প্রজন্মের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মতো ইতিহাসে বিরলতম পুরুষোত্তমের কিঞ্চিৎ সামীপ্য আমরা পেয়েছি। আরও কাছ থেকে জেনেছি জওহরলাল (১৮৮৯-১৯৬৪) আর সুভাষচন্দ্র বসুর (জন্ম ১৮৯৭) মতো ক্ষণজন্মা প্রতিভার পরিচয়। বিশ্বপরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের মুক্তিপ্রয়াসের উপস্থাপক জওয়াহরলাল সম্পর্কে তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউ, এন, ও) অধিবেশনে মরক্কোর প্রতিনিধি বলেছিলেন ঃ

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বর্তমান যুগ ঃ

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মের পর একশ বছর কেটে গেছে। এই একশ বছরে পৃথিবীটাই পাল্টে গেছে। প্রথমত ইতিমধ্যে ফ্যাসিবাদ ও বলশেভিক সাম্যবাদের অবলুপ্তি ঘটেছে। এই দুটি মতাদর্শ বেশ কিছুকাল পৃথিবীকে মাতিয়ে রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাভব ঘটে। আর অন্তর্লীন অসঙ্গতি ও সংকটের আবর্তে পড়ে সাম্যবাদের অবলুপ্তি ঘটে। সাম্যবাদের যে এত দ্রুত ভাঙন হবে, তা অনেকেই ভাবতে পারেননি। দ্বিতীয়ত ১৯৩০ সালেও যে সাম্রাজ্যবাদকে মনে হত অমিত শক্তিশালী, সেই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাও আজ ভেঙে গেছে। আজ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নানা দেশ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। তৃতীয়ত বর্তমান যুগটাকে অনেকে চিহ্নিত করেছিলেন "প্রলেতারীয় বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের" যুগ হিসাবে। ইতিহাস দেখিয়েছে যুগটা আসলে মহাজাগরণের—জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির, দেশগঠনের যুগ। সদ্য স্বাধীন সব রাষ্ট্রই আজ উন্নয়নের দৌড়ে যোগ দিচ্ছে; নিজ নিজ অবস্থা বুঝে, জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী হচ্ছে। চতুর্থত এ যুগটায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এমন অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটেছে, একে সঙ্গতভাবেই বলা চলে technology-intensive [প্রযুক্তি-নিবিড়] information-rich age [বার্তা-সমৃদ্ধ] যুগ। পঞ্চমত এ-যুগে সত্যই পৃথিবীটা আজ ছোট হয়ে গেছে, এখনকার পরিভাষায় "global village"। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় অনেকেই বুঝতে পারছেন যে, প্রাচীনকালের গ্রাম্যতা, আঞ্চলিকতা, দেশাভিমান ও কূপমণ্ডূকতার গণ্ডী ভেঙে ধন-ধান্যে, ধর্ম-কর্মে শিল্পে-বাণিজ্যে, সমস্তই আজ বিশ্ব পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের উপযোগী করে তুলতে হবে। ষষ্ঠত সাম্যবাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস অধুনা দুটি জিনিসকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে।

(ক) অর্থনৈতিক দক্ষতা ও কার্যকারিতার দিক থেকে বাজার-অর্থনীতির

বিকল্প নেই। (খ) কিন্তু সম্পদ-বণ্টনের ক্ষেত্রে বাজারকে একমাত্র সঞ্চালক শক্তি করে তুললে সমাজে অসাম্য বাড়বে। কীভাবে বাজার-অনুপ্রাণিত অর্থনীতির সঙ্গে সমাজ-অনুপ্রাণিত অর্থনীতিকে সমন্বিত করা যায়, কেমন করে এই দুই ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট দিকগুলির সমন্বয় সাধন করে একটি 'নতুন ব্যবস্থা' উদ্ভাবন করা যায়, এটাই এ যুগের ভাবনার বিষয়।

এ যুগের তিনটি সমস্যার উল্লেখ করাটা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমত প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ আজ সর্বশক্তিমানের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু যন্ত্রকুশলী, বিজ্ঞাননির্ভর যে শিল্প-সভ্যতা মানুষ গড়ে তুলেছে বা গড়ে তুলতে চাইছে, তার কুফলগুলি সম্পর্কেও চোখ বুজে থাকা চলে না।

(১) পরিবেশের উপর প্রভাব। আজ মানুষের হাতে এমন ক্ষমতা এসেছে যার সাহায্যে পৃথিবীতে গাছপালা, অরণ্য, বনাঞ্চল, জীবজন্তু ও মানুষের বসবাসের পরিস্থিতিকে ধ্বংস করা যায়, অন্তত জেনে, না-জেনে, তার অসম্ভব ক্ষতি করা যায়। অতি দ্রুত হারে লাগামছাড়া বিকাশ ও উন্নয়নের ফলে 'প্রকৃতির ভারসাম্য' নষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে, প্রকৃতির ভাণ্ডার ক্রমশ নিঃশেষ হচ্ছে, মানুষের 'চাই-চাই' দাবি মেটাতে প্রকৃতি-মাতা নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে পড়ছে।

(২) এখন পর্যন্ত শিল্পায়িত সমাজ যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে তার একটা কুফল, সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তির পরও প্রত্যক্ষ। পৃথিবীর উন্নত, ধনী দেশগুলির অধিবাসীদের তুলনায় অনুন্নত দেশগুলির বাসিন্দাদের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান। এর কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এটাই সাধারণ চিত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে বিশ্বের মোট সম্পদ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা নিচের তলায় চুঁইয়ে পড়েনি। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তৃতীয় কুফলটা এই ঃ

(৩) শিল্পায়িত, যন্ত্রকুশলী সমাজ মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা ও মর্যাদা দিতে পারেনি। সমাজ জীবনে 'নতুন সামাজিকতা' সৃষ্টি করতে পারেনি। অপরপক্ষে, মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয় ঘটিয়েছে। সব মিলিয়ে, আজ সৃষ্টি হয়েছে এক শূন্যতার ও অর্থহীনতার পরিমণ্ডল। এই সমাজ ভোগলোলুপ, লোভাতুর ; ব্যক্তির তাৎক্ষণিক চাহিদা ছাড়া কোন কিছুরই এ সমাজে মূল্য নেই। নেতাজি যে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে এত ভাবিত ছিলেন, সেই

সাম্রাজ্যবাদের আজ বিলুপ্তি ঘটেছে। ফ্যাসিবাদ ও বলশেভিক সাম্যবাদেরও অবসান ঘটেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এখনও ক্ষুধা আছে, অপুষ্টি আছে। মারণাস্ত্রের ভীতি আছে, উগ্রপন্থার সন্ত্রাস ও তাণ্ডব আছে, দূষণের সমস্যা আছে। শুধু 'স্বাধীনতা' দিয়ে, কিংবা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের 'মন্ত্র' উচ্চারণ করে, এমন কি শুধু বাজারের অর্থনীতি দিয়ে, এসব সমস্যার সমাধান হবে না। মানবিক সমাজ গড়ার কাজ এখনও অসমাপ্ত। সেই দুঃখগম্য তীর্থের কোন সুখগম্য পথ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ এ-যুগে নেতাজির প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু ?

॥ ২ ॥

সাম্রাজ্যবাদী যুগ ও বাংলার নবজাগৃতি ঃ

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের যুগটাকে বলা যায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণযুগ। ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য এবং প্রতাপ তখনও খুব একটা কমেনি। অন্য দিকে এশিয়ার ইতিহাসও থেমে থাকেনি। বহু কালের সুপ্ত এশিয়ায় দেখা গেল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে ও সংস্রবে জাপান অতি অল্পসময়ে বিশ্বসভায় সম্মান ও সম্ভ্রমের আসন জয় করে নিল। দেখা গেল ভারতবর্ষেরও ঘুম ভাঙছে।

সুভাষচন্দ্র জন্মেছিলেন এক মহান যুগে। রামমোহন থেকে যে ধর্ম-আন্দোলনের সূত্রপাত বঙ্গদেশে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র হয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আন্দোলনে যার পরিণতি, সেই আন্দোলনের ফলে বাঙালির চিত্তভূমি অনেকটা সরস হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে, মননে, রুচিতে এবং স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে ইতিমধ্যেই বিপ্লব ঘটিয়েছেন। ১৮ শতক থেকেই বাঙালি জাতি নিজেকে খুঁজে ফিরছিল। জাতীয় চেতনা ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র ক্রমশ তৈরি হচ্ছিল।

সমাজ ও ধর্মসংস্কারের যুগের পরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার যুগের আবির্ভাব হয়। সুভাষচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই কাব্যে, নাট্যে, উপন্যাসে, সঙ্গীতে, সাহিত্যের সকল বিভাগেই বঙ্গদেশে নূতন স্বাধীনতার ভাবটা মুখরিত হয়ে ওঠে। মনে রাখা প্রয়োজন, ইংরেজ-বিদ্বেষ এই যুগের স্বাদেশিকতা বা পেট্রিয়টিজমের মূল প্রেরণা ছিল। এই বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন মুক্তিপাগল, রোমান্টিক বিপ্লবী, অকুতোভয় কর্মযোগী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী নায়ক। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন যেমন বর্ণাঢ্য তেমনি রোমাঞ্চক। দর্শনে, ধর্মবোধে, স্বাদেশিকতায় স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য এবং রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মন্ত্রশিষ্য নেতাজির কর্মতৎপরতার ইতিহাস বহুধা-বিস্তৃত।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে নেতাজির ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে। তিনি ছিলেন এমন এক দেশনায়ক, মাতৃভূমির শৃঙ্খল-মোচনের জন্য সমাজ, পরিবার, সংসার সমস্ত কিছুই ত্যাগ করে যিনি জাতীয় বিপ্লবের হোমাগ্নিশিখায় নিজের জীবনকে আহুতি দিয়েছিলেন।

॥ ৩ ॥

নেতাজির জীবনবেদের উপাদান :

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদে যে উপাদানগুলি লক্ষ্যণীয় তার দু'একটির বিস্তার করা যেতে পারে।

(ক) বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের প্রভাব।

(খ) হেগেলের সামুহিকতাধর্মী ব্রহ্মবাদ এবং ডায়ালেকটিক্স-এর প্রভাব।

(গ) শোপেনহাওয়ারের ইচ্ছামন্ত্রের (the world as will) প্রভাব।

(ঘ) ডারউইন হার্বার্ট স্পেনসার ও বের্গস-র সৃজনশীল বিকাশতত্ত্বের [creative evolution] প্রভাব। তবে বিবেকানন্দ ও হেগেলের দর্শনই সুভাষচন্দ্রের ভাবনার মধ্যমণি।

মনে রাখা ভাল যে, নেতাজি মুখ্যত রাজনীতির মানুষ, দার্শনিক এবং তত্ত্বজ্ঞ নন। তিনি দর্শনের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় তিনি অর্থনীতি এবং বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেরও পাঠ নিয়েছিলেন। কিন্তু যে-অর্থে গান্ধীজি ছিলেন সভ্যতার দার্শনিক, সেই অর্থে নেতাজি সুভাষচন্দ্র দার্শনিক ছিলেন না।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছেন, আদর্শ হিসাবে মধ্যযুগের স্বার্থসর্বস্ব সন্ন্যাস-জীবন কিংবা আধুনিক যুগের মিল, বেন্থামের utilitarianism [হিতবাদ] কোনটাই সার্থক নয়।

বিবেকানন্দের প্রভাব ঃ

বিদ্যালয়-জীবনের শেষের দিকে সুভাষচন্দ্রের মনের মধ্যে এক বিষম ওলট-পালট শুরু হয়। প্রায় বছর ছয়েক তিনি অসহ্য মানসিক অশান্তিতে ভুগেছিলেন। সুভাষচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে তাঁর মনের গড়নটা আর দশজনের মত ছিল না। তিনি শুধু আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না। অনেক দিক দিয়ে অকালপক্কও ছিলেন। এর ফলে যে বয়সে তাঁর ফুটবল মাঠে কাটাবার কথা, সে সময়ে তিনি বসে বসে গুরুগম্ভীর নানা রকম সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেন।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কটকে সুভাষচন্দ্রের এক আত্মীয়ের ঘরে বসে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁর নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির উপর। কয়েক পাতা পড়েই তিনি বুঝতে পারলেন, এই জিনিসই তিনি খুঁজে ফিরছিলেন। স্বামীজির আদর্শ ছিল—"আত্মনঃ মোক্ষার্থং, জগদ্ধিতায়"—অর্থাৎ আত্মার বন্ধনমুক্তি এবং জগতের কল্যাণ সাধনই জীবনের চরম আদর্শ। জগৎ-হিত বলতে স্বামীজি বুঝেছিলেন মানবজাতির সেবা, স্বদেশ সেবা এবং নরনারায়ণ-সেবা। সুভাষচন্দ্র এই আদর্শ গ্রহণ করেন।

স্বামীজির লেখায় সুভাষচন্দ্র এমন কিছু খুঁজে পেলেন যা তাঁর সমগ্র সত্তাকে আজীবন প্রভাবান্বিত করেছে। সুভাষচন্দ্রকে স্বামীজির ভাবশিষ্য বললে তাই ভুল হবে না।

স্বামীজি হিন্দুর ধর্ম ও কর্মলোকে পাশ্চাত্যের প্রাণশক্তিকে [vitality] ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস পান। তাঁর তীব্র বৈরাগ্যে, রোমাণ্টিক নবজাগৃতির অভীঃমন্ত্রে, ব্যবহারিক বেদান্তের তত্ত্বকথায়, সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—জীবনের প্রতি পদে, যে-সব দ্বিধা, যে সব সংশয় মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলত, সুচিন্তিত একটি 'জীবন-দর্শন' ছাড়া আর কিছুতেই তাদের জয় করা সম্ভব ছিল না। "বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ আমাকে এই রকম একটি আদর্শের সন্ধান দিয়েছেন। এই আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করার ফলে বহু সমস্যা, বহু সংকট আমি সহজে পার হয়ে এসেছি"।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে

আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ······আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম"।

সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ যুগসত্যকে বুঝে ভারতবাসীদের আত্মপরিচয় ঘটানোর মহৎ কর্তব্য নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আত্মপরিচয়-সন্ধানীদের যে-দল পিছনের দিকের অচল খোঁটায় দেশকে বাঁধতে চেয়েছিল, শুধু ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রক্ষণশীলতার প্রবক্তা হয়ে উঠেছিল, স্বামীজি তার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সত্যের জায়গায় শাস্ত্রকর্তা, পুরুত-পাণ্ডা, শাসনকর্তাদের মানতে বলেননি কোনদিন। মর্ত্যপ্রেমী ও জীবনপ্রেমী স্বামী বিবেকানন্দ সেজন্যই সুভাষচন্দ্রের আদর্শ পুরুষ।

স্বামীজির সামাজিক দর্শনই সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন। অধর্ম, সুবিধাবাদ ও চালাকির দ্বারা মানুষ সাময়িকভাবে সাফল্য এবং কল্যাণও পেতে পারে, অধর্মের দ্বারা সে শত্রুদের পরাস্তও করতে পারে, কিন্তু এতে শেষরক্ষা হয় না। একদিন না একদিন ধ্বস নামবেই এবং তখন একেবারে মূল থেকে বিনাশ ঘটবে। স্বামীজির পদাংক অনুসরণ করে সুভাষচন্দ্র পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে মিলিয়ে নতুন 'সংগ্রামী স্বাদেশিকতা' ও দেশভক্তির আলো জ্বালাতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে। রাষ্ট্রভাবনায়, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শ্রমিক-কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে মতামতে সুভাষচন্দ্র নির্ভেজাল বিবেকানন্দপন্থী।

আগেই বলা হয়েছে সুভাষচন্দ্র দর্শনের ছাত্র ছিলেন। ভারতীয় দর্শন ও তৎকালীন পাশ্চাত্যদর্শনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সাংখ্য দর্শনের ক্রমবিকাশতত্ত্ব তাঁর মনঃপুত ছিল না। শংকর বেদান্ত, যার অপর নাম 'মায়াবাদ'ও তাঁর মর্ত্যভাবনার সঙ্গে মেলেনি। বিবেকানন্দের "ব্যবহারিক বেদান্ত"—যার সারবস্তু হল লৌকিক তপঃশ্চর্যা, সুভাষচন্দ্র তাকেই দর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

হেগেলের ব্রহ্মবাদ ঃ

পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল হেগেলের 'ডায়ালেটিকাল ব্রহ্মবাদ'। বিজ্ঞানীরা কোন সময়েই হেগেল দর্শনকে

গ্রহণ করেননি। শোপেনহাওয়ারের মতো দার্শনিকেরাও হেগেল দর্শনকে ধোঁয়াটে দর্শন বলে বাতিল করেছিলেন। কিন্তু প্লেটো, হেরাক্লিটাসের ঐতিহ্যকে বহন করে হেগেল যে বিশ্বকোষী ত্রিভঙ্গময়ী (triod) [thesis, anti-thesis, synthesis] অধ্যাত্মবাদ প্রতিপন্ন করেন, চিন্তার জগতে তার প্রভাব ছিল অপরিসীম। পরবর্তীকালে সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ, হেগেল-দর্শনের রসে জারিত হয়ে পরাক্রান্ত দুটি মতাদর্শ (Ideology) হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

ইতিহাসে সব যুগেই দুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে একটা তর্ক ছিল। ব্যক্তি আগে না সমাজ আগে—কে মুখ্য কে গৌণ কে কার ওপর আশ্রিত? ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলতেন, ব্যক্তিরই শুধু চরমমূল্য আছে, সমাজের আছে উপকরণ মূল্য। অন্যদিকে সমষ্টিবাদীরা (totalitarians) বলতেন, সমাজই মূলসত্তা, ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু সমাজ-সমুদ্রে বিলীন হয়, তবেই তার চরিতার্থতা।

হেগেল ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্কের প্রশ্নে অনেক ভেবেছেন। প্রশ্নটাকে তিনি অন্যভাবে তুলেছেন। রাষ্ট্র তো সমষ্টির প্রতীক। তাই প্রশ্নটা হল,—রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কটা কেমন?

একদিক থেকে বলা যায় সমষ্টির জীবনেই ব্যষ্টির জীবন; সমষ্টির সুখেই ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টিকে বাদ দিয়ে ব্যষ্টির অস্তিত্বই সম্ভব নয়। হেগেলের মতে, এই অনন্ত সত্যই জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে [শ্রেণী, সম্প্রদায়, নেশন ইত্যাদি] সহানুভূতিযোগে,—তার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করে, অগ্রসর হওয়াই ব্যক্তির কর্তব্য।

সুভাষচন্দ্র হেগেল ও জন স্টুয়ার্ট মিলের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, যদিও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্বন্ধে এরা দু-জন পরস্পর-বিরোধী মতবাদ পোষণ করতেন। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের অধীনতাতেই মানুষের 'প্রকৃত স্বাধীনতা'। রাষ্ট্রই সমষ্টির প্রতীক। অনেকে বলেন, হেগেল ব্যক্তি স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করে যে totalitarian—সমষ্টিবাদ প্রতিপন্ন করেন তারই দুটি সন্তান: এক—ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র, এবং দুই—বলশেভিক সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র। সুভাষের রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ কম। কিন্তু তাঁকে ফ্যাসিস্ট কিংবা কমিউনিস্ট কোনটাই বলা চলে না। সুভাষচন্দ্র ছিলেন নির্ভেজাল 'জাতীয়তাবাদী'।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র কি সমাজতন্ত্রী ছিলেন ?

সরকারি মার্কসবাদীরা অনেকদিন ধরে বলে এসেছেন সাচ্চা 'সমাজতন্ত্রী' হতে হলে কতকগুলি মূল সূত্র মেনে নিতে হয়। সেই সূত্রগুলি এই ঃ

১। দর্শনে 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' মেনে নেওয়া।

২। ইতিহাসের সঞ্চালকশক্তি হিসাবে 'শ্রেণী-সংগ্রাম' তত্ত্বকে এবং 'শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ'কে মেনে নেওয়া।

৩। পুঁজিবাদের সঙ্গে সংকটের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক মেনে, ক্রমবর্ধমান দুর্দশার (Pauperisation) তত্ত্ব মেনে নেওয়া।

৪। উদারনৈতিক সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর অত্যধিক গুরুত্ব না দেওয়া এবং স্বীকার করা যে, এই গণতন্ত্র আসলে প্রহসনই।

৫। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে, চিত্রকলায় শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা।

৬। সমাজতন্ত্রের জন্য সংস্কারে নয় [reforms] চাই বিপ্লবে অগাধ বিশ্বাস এবং

৭। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতায় আস্থা।

সুভাষচন্দ্র 'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' মেনে নেননি। নিজ প্রকৃতির তাগিদে এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে তিনি ছিলেন ডায়ালেকটিকাল ভাববাদী। হেগেলের বহুমাত্রিক ক্রমবিকাশ ও প্রগতির তত্ত্ব তিনি মেনে নিয়েছেন। তাই তিনি মনে করতেন, প্রগতির পথ বন্ধুর, দুঃখগম্য। এই পথ পরিক্রমায় সংঘাত আছে, সংঘর্ষ আছে, আছে পতন এবং উত্থান। প্রগতির পথ সরলরেখার মতো নয়। এই পথে ক্রমিক পরিবর্তন যেমন আছে, আছে টুকরো টুকরো সংস্কার, তেমনি আছে উৎক্রান্তি, বিপ্লব।

নেতাজি 'শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ'কে মেনে নেননি। সাহিত্যে, সঙ্গীতে চিত্রকলায় শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিও গ্রহণ করেননি। মার্কসীয় অর্থনীতির প্রসঙ্গে তাঁর মৌনতাই লক্ষ্যণীয়। ফলে নিদ্বির্ধায় বলা চলে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী' কিংবা বলশেভিক সমাজতন্ত্রী ছিলেন না।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে হেগেলের কাছ থেকে তিনি রাষ্ট্র পূজার ও স্বাদেশাভিমানের তত্ত্ব শিখেছিলেন। হেগেল বলেছেন—"The state is the Divine Idea as it exists on earth...We mast

therefore worship the state...The state is the march of God through the world." এই জাতি-রাষ্ট্র পূজাই তাঁকে ভারতীয় সাম্যবাদের রূপরেখা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত করেছিল। সুভাষচন্দ্রের কাছে শ্রেণী-বাৎসল্যের চাইতেও অনেক বড় কথা স্বদেশ ও স্বজাতি-বাৎসল্য।

সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে, বিশ্বজগতের, মানবজীবনের, এমন কি সভ্যতা-সংস্কৃতির ঘটনা পরম্পরার অন্তরালে একটা অদৃশ্য নিয়ম নিহিত থাকে যাকে আকস্মিক বলা যায় না। একে দুর্দৈবও বলা চলে না। ইতিহাস চলমান হলেও, আকস্মিকের মালা নয়। মানুষের জীবনের মতো সভ্যতারও একটা জীবনকাল থাকে। প্রাণশক্তি থাকলে কোন সভ্যতার পুনর্জন্ম হতে পারে। সুভাষচন্দ্রের মতে ভারতীয় সভ্যতার অন্তঃস্থলে একটা সঞ্জীবনীশক্তি আছে। সেজন্যই এই সভ্যতা বারবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে। ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীন হয়েও তাই চিরনবীন।

ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ১৭ শতকে ইংলণ্ড সমাজের অগ্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক চিন্তার পীঠস্থান ছিল ইংলণ্ড। ১৮ শতকে ফ্রান্স সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরে সমাজকে উন্নততর স্তরে নিয়ে গেছে। সুভাষচন্দ্রও স্বীকার করেছেন যে ১৯ শতকের ইতিহাসে সর্বোত্তম অবদান জার্মানির মার্কসীয় দর্শন। ২০ শতকের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সংযোজন রুশবিপ্লব ও শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতি।

দেশাভিমানী সুভাষচন্দ্র বলেছেন, এর পর মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষবিধানের দায়িত্ব ভারতবর্ষের।

ভারতের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে, অভ্যুদয়-পতন-অভ্যুদয়, এই চক্রের আকারে ইতিহাস আবর্তিত হয়। প্রগতির পথ প্রসারিত করতে হলে চাই নতুন চিন্তা, উন্নত মননশীলতা, ঐক্য, উৎকৃষ্ট সমরকুশলী মানুষের নেতৃত্ব। ভারতবর্ষে অনেক জাতের মানুষ এসেছে, অনেক বিদেশীও এসেছে, কিন্তু সবাই এদেশের সমাজে মিশে গেছে। ইংরেজরাই তার একমাত্র ব্যতিক্রম। শাসন এবং শোষণ ছাড়া তারা আর কিছুই করেনি। ইংরেজেরা যখন শুধু বাণিজ্যিক কাজেই তৎপর ছিল, তখন এদেশে ইংরেজ-বিদ্বেষ তেমন জোরালো হয়নি। ক্রমে ইংরেজ সর্বময় প্রভু হয়ে উঠে নিজেদের শাসন-বিধি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ এদেশে চাপিয়ে

দেওয়ায় সংঘাত শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, বিদেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে ভারতাত্মার প্রতিবাদ রামমোহনের কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। এক পর্বে আবির্ভাব ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের। সুভাষচন্দ্রের মতে, তিনিই জাতীয়তাবাদের 'আধ্যাত্মিক জনক'। স্বাধীনতার সংগ্রামের অগ্রণী নায়ক, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আজীবন অবস্থিত হয়েও সুভাষচন্দ্র ছিলেন অধ্যাত্মভাবনায় অনুপ্রাণিত। তাঁর কথায়, "সত্য হইতেছে আত্মা, যাহার সার প্রেম ; উহা পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহ ও ঐগুলির সমাধানের নিত্য লীলার মধ্য দিয়া নিজেকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছে।" হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস এবং ব্যবহারিক বেদান্ত মিলিয়ে সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ তৈরি হয়।

আগেই বলা হয়েছে সুভাষচন্দ্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী কিংবা বলশেভিক সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। মনে রাখা প্রয়োজন, মার্কসবাদীরা যে অর্থে সমাজতন্ত্রকে বুঝেছেন অর্থাৎ মূলত সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থে, ১৮৩০-এর আগে শব্দটির সে তাৎপর্য ছিল না। আদিতে সমাজতন্ত্রের অর্থ ছিল 'সামাজিকতা' বা 'সমবায়-নীতি'। তখন সমাজ-বিপরীতে পুঁজিবাদ (capitalism) ছিল না, ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা অহংবাদ। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, শ্রমিকরাজ স্থাপন, পরিকল্পিত রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতির ধারণা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মিশে গেছে পরবর্তীকালে।

সুভাষচন্দ্রের আমলে, ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর খুব সামান্য অংশেই লিবারেল বুর্জোয়া গণতন্ত্র ছিল। আর সে সময় পুঁজিবাদী অর্থনীতিও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তখন পুঁজিবাদের সংকটের যুগে অনেকেই ভেবেছিলেন, যে-কোন ধরনের সমাজতন্ত্রই পুঁজিবাদের চেয়ে ভাল। আর অনেকেই তখন মনে করেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রে অর্থাৎ কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত হুকুমদারি অর্থনীতির সাহায্যেই অনুন্নত দেশের অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ সম্ভব। সত্তর বছর আগে অ-কমিউনিস্ট দেশপ্রেমিক হয়েও সুভাষচন্দ্র সোভিয়েট ধাঁচের পরিকল্পনার গুণগ্রাহী ছিলেন।

গান্ধীবাদ, সুভাষবাদ ও সাম্যবাদ ঃ

সুভাষচন্দ্রর জীবনবেদ গান্ধীজির দর্শন থেকে একেবারেই আলাদা। গান্ধীজির সত্য ও অহিংসার তত্ত্ব, তাঁর অহিংস অসহযোগ, গান্ধীজির অছিবাদ [theory of trusteeship], বিকেন্দ্রিত অর্থনীতির গুণগান,

শোষণ ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, ভোগসর্বস্ব শিল্পসভ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীজির নিরলস সংগ্রাম, সুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেনি।

গান্ধীজি পুঁথি-পড়া, গগনবিহারী দার্শনিক ছিলেন না, ধর্মোপদেষ্টাও ছিলেন না। তাঁর ভূমিকা ছিল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের মহানায়কের। বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা ও অচ্ছুৎমার্গের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামকে যতটা সম্ভব অহিংস পন্থায় পরিচালিত করেছেন। জাতিকে নতুন মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন। জনগণমন-অধিনায়ক গান্ধীজি, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক। গান্ধীজি তাই ইতিহাসের এক কালপর্বে হয়ে ওঠেন 'গান্ধী মহারাজ'।

শহরে বুদ্ধিজীবীদের মতো সুভাষচন্দ্রও গান্ধীজীর রাজনীতি, অর্থনীতি ও জীবনদর্শনে আস্থাশীল ছিলেন না। অনেকের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও মনে করেছেন, গান্ধীবাদ প্রতিক্রিয়ারই দর্শন; কেননা গান্ধীজি অতি-স্ফীত যন্ত্রসভ্যতার বিপক্ষে, আধুনিকতারও বিপক্ষে। তাঁর জীবনবেদ পশ্চাদ্‌মুখী রক্ষণশীল!

রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র ছিলেন 'বামপন্থী'। সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে লিখেছিলেন—

"ভারতবর্ষের জীবনের বর্তমান অধ্যায়ে বামপন্থার একমাত্র লক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা।" তাঁর মতে, তিনিই প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যাঁর নির্ভেজাল, পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতায় আস্থা আছে—মহাত্মা গান্ধীর মতো শুধু 'স্বাধীনতার মর্মবস্তুতে নয়'। সুভাষচন্দ্রের মতে, বামপন্থার দ্বিতীয় লক্ষণ হল, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'আপোসহীন সংগ্রাম'।

সুভাষচন্দ্রের বিচারে, গান্ধীজি নির্ভেজাল, পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন না, আপোসহীন সংগ্রামেও তাঁর আস্থা ছিল না। উপরন্তু গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বিত্তবানদের সঙ্গে (haves)। সর্বোপরি, সুভাষচন্দ্রের মতে, সমাজসংগঠন সম্পর্কে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি 'মধ্যযুগীয় এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী'।

গান্ধীবাদ সত্য ও অহিংসার দর্শন। সুভাষ অহিংসাতত্ত্বকে চরমমূল্য দিতে অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, স্থান, কাল ও পাত্র বিচার করে হিংসা-অহিংসার প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। সুভাষচন্দ্র মনে করেছেন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের ধারা বয়ে চলে। ফলে কোন কোন

অবস্থায় অহিংসা প্রয়োজনীয় হলেও, ইতিহাসে হিংসা ও সংঘর্ষের স্থান আছে।

সুভাষচন্দ্র ব্যবহারিক রাজনীতির কথা মনে রেখে ভেবেছেন যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করাই সঙ্গত। গান্ধীজি বলতেন, "উদ্দেশ্য সৎ হলেই হবে না, উপায় ও উপকরণকেও সৎ হতে হবে।" সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল, "সৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপ দিতে পারে যে উপায়, সেটি-ই সৎ।" উদ্দেশ্য উপায় নিয়ে বিতণ্ডা তাঁর কাছে অপ্রাসঙ্গিকই ছিল।

সুভাষচন্দ্র তাঁর 'বামপন্থা'র তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তাঁর বামপন্থা একাধারে (ক) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী (খ) বলশেভিক সাম্যবাদ-বিরোধী (গ) সমাজতান্ত্রিক।

সুভাষচন্দ্র বলশেভিক সাম্যবাদের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রথমত সাম্যবাদীরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না, দ্বিতীয়ত, তাঁরা নাস্তিক ও ধর্মে অবিশ্বাসী, তৃতীয়ত তাঁরা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার উপরে উঠতে পারেনি। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদী হওয়ায় এঁদের ইতিহাসবোধ অসম্পূর্ণ।

চতুর্থত, সাম্যবাদী অর্থনীতি শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রামের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় একপেশে ও গতানুগতিকতার উপরে উঠতে পারেনি। মুদ্রার তাত্ত্বিক আলোচনায় সাম্যবাদের কোন অবদান নেই।

পঞ্চমত প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার কথা বললেও সাম্যবাদীরা বিশ্ববিপ্লবের চেষ্টা বর্জন করে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলতে তৎপর।

তবুও সুভাষচন্দ্র 'মার্কসবাদ'কে আধুনিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেন্দ্রীভূত, পরিকল্পিত অর্থনীতিতেও সুভাষচন্দ্রের ছিল বিশ্বাস।

ফ্যাসিবাদ : সুভাষবাদ ও ভারতীয় সাম্যবাদ : ১৯৬৬ সালে অধ্যাপক জে, এল, ট্যালমন-এর (J. L. Talmon) বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Origins of Totalitarian Democracy' [টোটালিটেরিয়ান গণতন্ত্রের উৎসসমূহ] লণ্ডনের Mercury Books থেকে প্রকাশিত হয় [দ্বিতীয় সংস্করণ]। লেখকের মূল বক্তব্য, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উদয় ১৮ শতকে। ঐ সময় থেকেই সমান্তরালভাবে আর একটি ধারার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধারাটির নাম দেওয়া যায় 'সামূহিকতার গণতন্ত্র' [totalitarian democracy]।

১৮ শতক থেকে এই দুই ধারা পাশাপাশি অবস্থান করেছে। এই দুই ধারার অভিঘাতেই ইউরোপের ইতিহাস অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে এবং এই অভিঘাতের ইতিহাসকে সঙ্গতভাবেই ইউরোপীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে স্বীকার করতে হয়।

উদারনীতির ধারা এবং সামূহিকতার ধারার মধ্যে পার্থক্যটা এই নয় যে, প্রথমটি 'স্বাধীনতার" (liberty) মূল্য স্বীকার করে অপরটি করে না। পার্থক্যটা অন্যত্র। উদারনীতিবাদ মনে করে যে জীবনের বিচিত্র কর্মধারার নানা স্তর আছে, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, নৈতিক, নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক। রাজনীতি এই কর্মধারার একটি অংশমাত্র। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ধ্রুব ও সনাতন সত্য বলে কিছু নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী এদের কাজে লাগানো যায়, প্রয়াস ও ভ্রান্তির (trial & error) মধ্য দিয়েই এদের যাথার্থ্য নিরূপিত হতে পারে।

সামূহিক (totalitarian) গণতন্ত্র মনে করে যে, রাজনীতিতে এক, অদ্বিতীয় ধ্রুব সত্য আছে। অর্থাৎ, এর মতে, মানুষের অস্তিত্বের একটিই মাত্রা আছে, এবং সেটি রাজনৈতিক।

"It widens the scope of politics to embrace the whole of human existence ।"

সামূহিক গণতন্ত্রের দাবি হল, মানুষের জ্ঞানকর্মযোগের 'সামাজিক' তাৎপর্য আছে। এর অভাবে জ্ঞানকর্মযোগের কোন মূল্যই নেই। সামাজিক তাৎপর্য আছে বলেই মানুষের কর্মলোক, ভাবলোক—সমস্ত কিছুই, রাজনৈতিক কক্ষপথের অন্তর্ভুক্ত।

সামূহিকতাবাদের (totalitarianism) দু'টি রূপ—একটি দক্ষিণপন্থী (right) অপরটি বামপন্থী (left)। Talmon (ট্যালমন) বলেছেন, তত্ত্বগতভাবে এই দুই মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বামপন্থীদের যাত্রার শুরু 'মানুষ' থেকে। মানুষের যুক্তি, বিচার এবং মানুষের মুক্তিই এদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু। দক্ষিণপন্থীদের কাঙ্খিত বস্তু কোন সমষ্টি (collective entity) কখনো হয়তো তা রাষ্ট্র, কখনো জাতি (nation) কখনো বর্ণ (race)। শ্রেণী-বাৎসল্যকে কিংবা পার্টিয়তাকে যখন বামপন্থীরা অদ্বৈতভূমিতে নিয়ে গেছে, তখনও তত্ত্বগতভাবে এরা ব্যক্তিমুক্তি, যুক্তিবাদ, ও বিচারের প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখিয়েছে।

যদিও গত সত্তর বছর ধরে বাম-টোটালিটেরিয়ানরা মূঢ়বিশ্বাস ও চরম সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যুক্তি, বিচার ও ব্যক্তির চারপাশে তাত্ত্বিক-পঞ্জিকার প্রাচীর তোলার প্রয়াসী হয়েছে তবু তার মধ্যে ফাঁক করে কখনো কখনো বিচারের ও যুক্তির আলো প্রবেশ করেছে। সেই জন্যই বাম-সামূহিকতাবাদ তাদের মতবাদকে দিতে পেরেছিল একটা বিশ্বরূপ (universal creed), দক্ষিণপন্থী সামূহিকতাবাদের এই চরিত্র ছিল না।

এই দুই ধারার অপর একটি পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। মনুষ্যপ্রকৃতি সম্পর্কে এদের ভিন্ন মত। বামেরা ঘোষণা করেছে, মনুষ্যপ্রকৃতি স্বতঃই সৎ এবং ক্রমশ এর পরিবর্তন ঘটানো যায়। দক্ষিণপন্থীদের মতে, মানুষ স্বভাবতই দুর্বল, দুর্নীতিপরায়ণ ও পরমুখাপেক্ষী। উভয় মতবাদেই জোরজুলুম ও বলপ্রয়োগ পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। দক্ষিণপন্থীরা মনে করেছে, মানুষ যেহেতু দুর্বল ও দুর্নীতিপরায়ণ, তাই সমাজে শৃংখলা বজায় রাখতে হলে শক্তি খাটাতে হবে। এটাই শৃংখলা রক্ষার স্থায়ী পথ। বামেরা ভেবেছে বলপূর্বক মানুষকে সুখী করা যায়, শক্তিপ্রয়োগ করে মানুষকে আরও ভাল করা সম্ভব। প্রগতির শেষ প্রান্তে একবার পৌঁছলে যখন নতুন শ্রেণীহীন, সুসমঞ্জস সমাজ গড়ে উঠবে, তখন আর শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত বলপ্রয়োগ করেও মানুষকে সুখী করতে হবে।

একথা অস্বীকার করা চলে না যে নেতাজির চিন্তায় ও রাষ্ট্রভাবনায় এই দুই ধারারই বিশেষ প্রভাব ছিল।

লিবারেল গণতন্ত্রে নেতাজির আস্থা ছিল না। এই পথে ভারতের মতো অনুন্নত দেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে, এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে, অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পন্ন করা অসম্ভব। পশ্চিমী ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্রে সুভাষচন্দ্রের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না।

নেতাজি জার্মানির ফ্যাসিস্টদের নিয়মানুবর্তিতা, ফৌজি রীতি-নীতির কার্যকারিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আবার লেনিন সম্পর্কেও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একপার্টিনায়কতার সাহায্যে জার্মানি ও রাশিয়া দেশোন্নয়নের যে প্রয়াস পেয়েছিল, তাতেই নেতাজি সমষ্টিবাদী (collectivist) চিন্তার অনুরাগী হয়েছিলেন।

জার্মানি ও রাশিয়া—দুদেশেই ছিল একপার্টিনায়কতা, দুদেশই লিবারেল গণতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও হুকুমদারি পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে দেশগঠনে ব্রতী হয়েছিল। কৈশোর থেকেই নেতাজির কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সামরিক রীতি-নীতি, সমরকুশলী নেতাদের প্রতি অনুরাগ ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ও ফ্যাসিস্ট জার্মানির ক্রমবর্ধমান শিল্পশক্তি ও সামরিক শক্তি দেখে এক সময় ইউরোপেও সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস চালু হয় যে, দক্ষতা ও কার্যকারিতার দিক থেকে একনায়কী ডিক্টেটরী শাসন গণতন্ত্রের তুলনায় অনেক ভাল। আমাদের যৌবনে ইতালির দিকে তাকাতে বলা হত। এমন কথাই বলা হত—"সেখানে ট্রেন চলে ঠিক সময়ে।"

সুভাষচন্দ্রের অনেক লেখায় তাঁর totalitarianism (সমষ্টিবাদ) সম্পর্কে অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

নীট্শের Superman [অতিমানব] সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করে তিনি বলেছেন যে নীট্শের শক্তিতত্ত্ব ও অতিমানব-তত্ত্ব জাতীয়-রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর। সুভাষচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছেন, সমষ্টিকে বা জাতিকে বাদ দিয়ে যে সাধনা, তার কোন সার্থকতা নেই। এক অদ্বৈত আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, অরাজকতা দমন করে ভারতবর্ষের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সামরিক নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ অমিতশক্তিশালী একদলীয় শাসন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, দক্ষিণ [Fascism] কিংবা বাম [Communism] এই দুই ধারার totalitarianism [সমষ্টিবাদ] কোনটিকেই তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি। তিনি বিবর্তনবাদকে যেভাবে বুঝেছিলেন তাতে তিনি ভেবেছেন যে, Fascism [ফ্যাসিবাদ] ও Communism-এর [সাম্যবাদ] সমন্বয়ে ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদর্শন নির্মাণ হওয়া উচিত। তাঁর কথায়, "পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে আমাদের নূতন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব করতে হবে।" এ বক্তব্যের তত্ত্বগত যৌক্তিকতা কতখানি সে আলোচনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র।

সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রথমত, দুটি মতাদর্শই লিবারেলতন্ত্রবিরোধী এবং এক-পার্টি-নায়কতায় বিশ্বাসী। দুটি ব্যবস্থাই অনিয়ন্ত্রিত, মুক্ত, উদার, বাজারি অর্থনীতির বিরোধী। জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও শক্তিবিধানে উভয় ব্যবস্থাই তৎপর।

উভয় ব্যবস্থাতেই বাক্-স্বাধীনতা, দল গঠনের স্বাধীনতা, স্বাধীন বিচারালয়, আইনের শাসন অস্বীকৃত। উভয় ব্যবস্থাতেই দেখা গেছে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত, হুকুমদারি অর্থনীতির একাধিপত্য। উভয় ব্যবস্থাতেই প্রচার ও প্রপাগাণ্ডার অসীম গুরুত্ব স্বীকৃত।

সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদে সমষ্টিবাদী [totalitarian] চিন্তাধারার প্রভাব অনস্বীকার্য। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি 'ফ্যাসিবাদী' ছিলেন। দেশকে মুক্ত করবার উদগ্র আবেগে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তির সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। "শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু" এই প্র্যাগম্যাটিক নীতি মেনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির জন্য নেতাজি হিটলার ও তোজোর সাহায্য নিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'হিটলারবাদের আমি বিরোধী, তা সে হিটলারতন্ত্র কংগ্রেসের মধ্যেই থাকুক বা অন্য দেশেই থাকুক। আমার মনে হয়, হিটলারবাদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় সমাজতন্ত্র।'

জাপান যে পাশ্চাত্য শক্তিকে তাড়াতে চায়, তার জন্য সুভাষচন্দ্র জাপানের গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু জাপানের চীনের মতো প্রাচীন একটা জাতকে আক্রমণ তিনি অনুমোদন করেননি; বলেছেন, "জাপানের কৃতিত্বের যতই প্রশংসা করি না কেন, আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ চীনের এই বিপদের সময় চীনেরই কাছে যাবে।"

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যেই দেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সুভাষচন্দ্র তা বিশ্বাস করতেন। সেজন্যই অতি-কেন্দ্রীভূত, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েত প্ল্যানিং-ব্যবস্থারও তিনি অনুরাগী ছিলেন। পরিকল্পিত অর্থনীতির সাহায্যেই শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি করা যাবে। অন্যান্য সুযোগসুবিধাদি দেওয়া যাবে, তাদের জন্য হিতকর নানা প্রতিষ্ঠান গড়া যাবে, এ-সবে সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল। তাঁর মতে, অন্তত বহির্বাণিজ্যকে রাষ্ট্রাধীন করতেই হবে। সুভাষচন্দ্রের নানা লেখায় জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, জনগণের পূর্ণ আর্থিক মুক্তি এবং কৃষকশ্রমিকদের পক্ষে, পুঁজিবাদ-বিরোধী নানা বক্তব্য আছে।

সমাজতান্ত্রিক উপাদান থাকলেও সুভাষচন্দ্রের মূল প্রেরণা দেশাভিমান বা জাতীয়তাবাদ (nationalism)। সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে

সমাজতন্ত্রকে যুক্ত ক'রে 'জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের' (national socialsim কথা ভেবেছেন।

সুভাষচন্দ্রের 'ভারতীয় সাম্যবাদ' ভারতের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেননি এবং জাতীয়তাবাদ কিংবা সমাজতন্ত্র যে বিদেশী চিন্তাধারার ফসল, তাও স্বীকার করেননি।

সুভাষচন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন—"কার্ল মার্কসের গ্রন্থ হইতে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয় নাই। ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতিতে ইহার উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ যে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রচনায় ও কর্মে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।" তিনি ভেবেছিলেন, একদিকে গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র অন্যদিকে বলশেভিক সমাজতন্ত্র, এই দুই মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র এক সমাজতন্ত্রের রূপরেখা নির্মাণ করতে হবে। সেই সমাজতন্ত্রে একদিকে থাকবে কমিউনিজমের অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ অন্যদিকে থাকবে জাতীয়তাবোধ, এক পাথুরে একতা, কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা, দেশপ্রেমিক নেতার সর্বময় কর্তৃত্ব।

জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের তাত্ত্বিক আলোচনা সুভাষচন্দ্রের লেখায় বিশেষ পাওয়া না গেলেও, হেগেলের প্রভাবে, জাতির উপরে তিনি এক দিব্যসত্তা আরোপ করেছেন, সমষ্টিকে ব্যক্তির উপর স্থান দিয়েছেন, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে 'এক ভারতীয় জাতি' গড়বার স্বপ্ন দেখেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর একমাত্র স্বপ্ন।

আধ্যাত্মিক প্রবণতা থাকলেও নেতাজি রাজনীতিবিদ ও কর্মযোগী হিসাবে মানুষকে দেখেছিলেন রাজনৈতিক জীব হিসাবে। আসলে মানুষের স্বরূপ জটিল এবং আপাত-অসমঞ্জস। এই অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতির একটা সরল পথ বার করাটাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমাদের মুখ্য কাজ। জড়জীবনই ক্রমোত্তরণের ভিত্তি সন্দেহ নেই। প্রকৃতি সেখান থেকেই ক্রমবিকাশ আরম্ভ করেছিল। মানুষও সেখান থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে, প্রাকৃতিক শক্তি সমূহকে আজ দাসীবাঁদী করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ কি সেই সর্বজনীন নীতি যা বর্তমান দুনিয়াকে সত্যই 'একনীড়' করে তুলতে পারে ? অনেকের মতে সেই নীতিটা জাতীয়তাবাদ, আবার অনেকের মতে সেটি হল সমাজতন্ত্র। দেখা গেছে নেশন-স্টেট কিংবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অতি সহজেই হীন স্বার্থসাধনের যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

আধুনিক নেশন-স্টেট কিংবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারলেও মানুষের অন্তরের সুপ্ত রাক্ষস যে ধীরে ধীরে জাগ্রত হবে না, এমন নিশ্চয়তা কোথায় ?

মানুষের ক্রমপরিণতির পথে আজ একটা সংকট-সময় এসেছে। একদিকে সে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে পৃথিবীটা আজ এক হয়ে গেছে। অপর দিকে মানুষের বাড় থেমে গেছে। অথচ একপেশে বাড় ক্রমপরিণতির অতি মারাত্মক রোগ। প্রকৃতির ও টেকনোলজিকাল সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে এই অতিবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন [overspecialisation] রোগগ্রস্ত প্রাণী তাল রেখে চলবে কেমন করে ?

মানুষ যে জাতীয় রাষ্ট্র কিংবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়েনি তা তো নয়। মানুষ বিশাল জটিল সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। কিন্তু তার অসীম বুদ্ধি, তার অপরিণত নৈতিক-আধ্যাত্মিক সত্তা সেই বিরাট সংগঠনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। তার সৃষ্ট সভ্যতা-সংস্কৃতি তাকেই আজ গ্রাস করতে বসেছে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদে এ-সব মৌলিক প্রশ্ন খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয়। এ যুগে সুভাষবাদের প্রাসঙ্গিকতা সামান্য। তার কারণ, সুভাষচন্দ্র পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামীর চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখেছেন, কালোত্তীর্ণ কোন জীবনবেদ প্রতিপাদন করার প্রয়াস তিনি পাননি।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। ভারত পথিক
২। The Indian Struggle
৩। নূতনের সন্ধান
৪। তরুণের স্বপ্ন

যুগান্তর, অনুশীলন ও সুভাষচন্দ্র

অশোক মুস্তাফি

সুভাষচন্দ্র এবং তার যোগ্য উত্তরাধিকারী যতীন্দ্রমোহন উভয়ই দেশের সন্ত্রাসবাদের উদ্ভবের জন্য মূলতঃ সরকারকেই দায়ী করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন বিপ্লবীদের মনস্তত্ত্বকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য। আর সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তার সক্ষম রাজনৈতিক জীবনে অনেকখানি জুড়ে এদের সমর্থনের দ্বারা পুষ্ট ছিলেন। তাঁর বরেণ্য গুরু চিত্তরঞ্জনের মতই তিনি বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করেছেন। তাঁদের গোপন আস্তানার ব্যবস্থা করেছেন, কর্পোরেশনে তাদের প্রাথমিক শিক্ষকের পদে নিযুক্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে গোপীনাথ সাহা, ভগৎ সিং প্রভৃতির প্রতি প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, নিজে কংগ্রেসী হয়েও, বহু বিপ্লবী তাঁর সহবন্দী ছিলেন এবং দেশের ছাত্রশক্তির জাগরণে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে তিনি বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। পর্যায়ক্রমে তিনি যুগান্তর ও অনুশীলন বিপ্লবীদের সহমর্মিতা অর্জন করেছেন দেশের রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে। বিপ্লবীরাই ছিলেন দেশান্তরিত নেতাজী ও চল্লিশের ভারতবর্ষের মধ্যেকার যোগসূত্র। আজাদ-হিন্দ পর্যায়ে তিনি আমাদের মুক্তি আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন একাধিকবার।

বস্তুত ১৯২৯-এর পর থেকেই সুভাষচন্দ্র সশস্ত্র উপায়ে দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের কথা চিন্তা করতে থাকেন এবং নরমপন্থী থেকে চরমপন্থার এই নিজস্ব নির্বাচনে তিনি স্বীয় দেশবাসীর সক্রিয় সহানুভূতি কামনা করেছেন। সবকিছুই গান্ধীপন্থী কংগ্রেসীদের সুবিদিত ছিল এবং এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, সুভাষের সঙ্গে বিপ্লবীদের এই গোপন সংসর্গ এবং তাঁদের শৌর্য ও ত্যাগের প্রতি সুভাষের অনুরাগকে সর্বভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ভাল মনে গ্রহণ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভারতের মধ্যে এবং বাইরে থাকার সময় তিনি দেশের তাবৎ বিপ্লবীদের

নৈতিক সমর্থন এবং অনুগামিত্ব লাভ করেছিলেন। অব্যাহতভাবে বলতে গেলে মীরাট-ষড়যন্ত্র, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও বিনয়, বাদল দীনেশের অসমসাহসিক লড়াইয়ের পিছনে তার নৈতিক সমর্থন ছিল একথা দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিও জানত এবং সেই কারণে তাঁকে তারা অ্যানার্কিস্ট, বিপ্লবী বলশেভিক প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায় প্রায়শই ভূষিত করেছে। একথা আজকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন অস্থির এবং অশান্ত বিপ্লবী যিনি অহিংসাকে গ্রহণ করেছিলেন, সংগঠনের প্রতি আনুগত্য হেতু এবং নিতান্ত একটি সাময়িক কৌশল হিসাবে, উপলব্ধ নীতি হিসাবে কখনই নয়। বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার মূল কারণ হল যে দেশের বিপ্লবীরা জাতীয় সংগ্রামের একটা বিপ্লবী ধারার সূত্রপাত করেন। তিনি সার্থক বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন বলেই জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই ধারার ঐতিহাসিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেন। বঙ্গবিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ মোটেই তাৎক্ষণিক ছিল না। এই সংযোগকে নিছক সুবিধাবাদী বলেও ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা তিনি ছিলেন এমন একজন বিপ্লবী—যার মধ্যে সমাজ-রূপান্তরের আকুতি যেমন ছিল, তেমনি ছিল এক কঠিন বাস্তববাদ।

মতবাদগত দিক থেকে সুভাষচন্দ্র এ'কটি সর্বভারতীয় সংস্থার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত, সর্বভারতীয় বিদ্রোহ সংগঠিত করার কথা ভাবতেন। ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক প্রয়াসে বা নিছক ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদে অকারণ শক্তি ক্ষয় হবে বলেই তিনি মনে করতেন। একটি সর্বভারতীয় সংস্থাকে গড়ে তোলায় এবং বাস্তব ও মানসিক দিক থেকে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করায়, তিনি বরং বিশ্বাসী ছিলেন। নিজে কোন নির্দিষ্ট বিপ্লবী দলে যুক্ত না থাকলেও অনুশীলন দলের নরেন্দ্রনাথ সেন, রবি সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলি প্রমুখ এবং 'যুগান্তর' দলের যাদুগোপাল মুখার্জি, সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও ভূপতি মজুমদার প্রভৃতির সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র হয়েছিলেন উভয় গোষ্ঠীর মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি। এই একটি সর্বভারতীয় বিপ্লব সাধনের জন্য ১৯১৪-১৭-র অভিজ্ঞতা থেকে প্রকৃষ্ট শিক্ষা নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি দেশীয় সৈন্যদলে বিদ্রোহ ঘটাতে চেয়েছিলেন। বিদেশী সাহায্য লাভের সংকল্প

তাঁর অনেককালের। বলা বাহুল্য এই বিশেষ কর্মপন্থা ভারতের বিশেষ অবস্থার বিচারে সুভাষচন্দ্রের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। তাঁরাও সুভাষের নেতৃত্ব মেনে নিলেন। অবশ্য উভয় বিপ্লবী দলের কর্মীদের বিপ্লব নিষ্ঠা ও কর্মশক্তির উপর সুভাষচন্দ্রের সমান আস্থা ছিল, যদিও কর্মপন্থার দিক থেকে অনুশীলন দলের নীতির ও কর্মসূচীর সঙ্গে তিনি অনেকটা সহমত ছিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে কর্মপন্থাগত বিরোধ থাকলেও যুগান্তর ও অনুশীলন দলের মূল বিরোধ ছিল কংগ্রেস আন্দোলনের প্রকৃতি ও পন্থা সম্পর্কে। প্রকাশ্য সর্বভারতীয় সংস্থা কংগ্রেসের নায়ক হিসাবে বিপ্লবী দলের গুপ্ত কর্মনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া সুভাষের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। বিপ্লবী দলের গোপন কাজে সাময়িকভাবে সাহায্য করলেও এবং খণ্ড বিক্ষিপ্ত এবং ব্যক্তিগত প্রয়াসের প্রতি সশ্রদ্ধ চিত্ত থাকলেও তিনি বিপ্লবী দলগুলির গুপ্ত কর্মনীতির প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কখনও গ্রহণ করেননি। মূলত কংগ্রেসের কাজকর্মের প্রয়োজনে বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে বিশেষ ইস্যুতে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র এঁদের অভূতপূর্ব সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের দ্বারা নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং অনুরূপভাবে এঁরাও তাঁর ভাবমূর্তিতে আকৃষ্ট ছিলেন। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে বিশ-তিরিশের দশকের বাংলার বহু বিপ্লবী কংগ্রেসের মাধ্যমে গণ-সংযোগ করাই সহজসাধ্য বলে মনে করতেন। এবং কালক্রমে কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে একটি সংগ্রামশীল মনোবৃত্তি সঞ্চার করা সম্ভবপর বলেও বিশ্বাস করতেন। মূলত এই জাতীয় চিন্তার বশবর্তী হয়ে এবং চিত্তরঞ্জনের মধ্যস্থতায় ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত গোষ্ঠীগতভাবে কংগ্রেস কর্মসূচী রূপায়ণে অথবা শ্রমিক ও যুব আন্দোলনে এরা আত্মনিয়োগ করেন। সাময়িকভাবে এবং অংশত বিপ্লবী গোষ্ঠী বা কংগ্রেসে ও গান্ধীনীতির সঙ্গে যোগ-সূত্র রক্ষা করলেও তাঁদের সংস্থাগত স্বাতন্ত্র্যের চেতনা ছিল অব্যাহত। বৈপ্লবিক আদর্শ এবং উদ্দেশ্যও অক্ষুণ্ণ ছিল। কংগ্রেসের নির্বাচন ক্ষেত্রে বিপ্লবী সংস্থাগুলির ভূমিকা সে সময়ে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রথম কারণ এই যে সাধারণভাবে পল্লী অঞ্চলে বিপ্লবী কর্মীরা কংগ্রেস কর্মীদের চেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন। তাছাড়া তাদের বহু বিস্তৃত জনবলের উৎস ছিল সংস্থাগত সংহতি এবং অসংখ্য বিপ্লবনিষ্ঠ কর্মী। প্রকৃতপক্ষে এ সবকিছুই সুভাষচন্দ্রের সুপরি-

জ্ঞাত ছিল। তিনি কেবল সচেষ্ট ছিলেন এই খণ্ড, বিক্ষিপ্ত দলগুলিকে কংগ্রেস-মঞ্চে সমাবিষ্ট করার বিষয়ে। জাতীয় কংগ্রেসকে এই বিপ্লবীদের সহায়তার অধিকতর সংগ্রামশীল অগ্রগতিশীল এবং আপোস-বিরোধী মঞ্চে একত্রিত করা ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য।

তিনি নিশ্চিত জানতেন যে মূলত বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে ঐক্য না থাকায় এবং প্রকাশ্য আন্দোলনে নেতৃত্বের অভ্যাস না থাকায় তারা কংগ্রেস শিবিরে আপোসবিরোধী সংগ্রামশীল এবং তরুণতর বামপন্থী কোনো নেতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যোগ্য নেতৃত্বের সন্ধান করতেন। বস্তুত বৈপ্লবিক নেতা হতে গেলে যে জাতীয় প্রস্তুতি থাকা দরকার তা সর্বতোভাবে সুভাষচন্দ্রের ছিল। কংগ্রেসকে সংগ্রামমুখী করার জন্য বিকল্প নেতৃত্ব দান করে একটি সর্বভারতীয় বিপ্লবের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্রের ছিল।

প্রায় ১৯১৪-১৫ সাল অর্থাৎ ছাত্রাবস্থা থেকেই সুভাষচন্দ্র এবং অন্নদা-প্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ তাঁর কতিপয় সতীর্থ 'যুগান্তর' দলের প্রথম সারির কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র ক্রমশ যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন, যুগান্তর মহল থেকে এরকম দাবি করা হয়েছিল। স্বভাবতই এই কর্মভিত্তিক আত্যান্তিকতাবাদী বৈপ্লবিক দলটির সঙ্গে তাঁর মতো কংগ্রেস নেতার রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যূষে যোগাযোগের ধরন ছিল প্রচ্ছন্ন, পরোক্ষ। সমস্ত যোগাযোগ রক্ষিত হত নেপথ্যে। পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলন এবং স্বরাজ্যবাদী আন্দোলনের পর্যায়ে এই প্রাথমিক রাজনৈতিক সংযোগ ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। বিশেষ করে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন দত্ত, সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন, গুপ্ত এবং ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি যুগান্তর নায়কদের মাধ্যমে।

একজন বিশেষজ্ঞের মতে ১৯০৮ সালে কলকাতার যুগান্তর গোষ্ঠীর তরফ থেকে দেবব্রত বসু ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উড়িষ্যার বালেশ্বর, কটক এবং পুরী জেলায় বেশ কয়েকটি স্থানে কিছু সংখ্যক আখড়া তৈরি করেন এদের মধ্যে কটকের আখড়াটি ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং অনুমান করা যায় যে সম্ভবত যুগান্তরের এই আখড়াটি তরুণ সুভাষচন্দ্র এবং পুরীর শঙ্করাচার্যকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে। সুভাষ চন্দ্র অবশ্য জীবনের প্রথম দিকে বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী আদর্শে তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না, এবং

তাঁর ভাষায়—"আমি…বিশ্বাস করিতাম যে জাতীয় পুনর্গঠনের কার্যপ্রণালীর মধ্য দিয়া আমাদের দেশবাসীর চরম মুক্তি আসিবে।" (ভারত পথিক) পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মূল আন্দোলন অহিংস অসহযোগে যোগদান করার অভিজ্ঞতা থেকে এবং দেশের ভিতরের ও বাইরের অব্যবহিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার তথা শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়নের তীব্রতা লক্ষ করে, তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে একটি সংঘবদ্ধ, সশস্ত্র, সর্বাত্মক জাতীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়েই দেশের পরাধীনতা মোচন এবং সামাজিক অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব। 'তরুনের স্বপ্ন' গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও বন্ধনের অবসান ঘটাবার আহ্বান জানিয়েছেন এবং অমরাবতী ভাষণে সম্পূর্ণ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দিয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে যাদুগোপাল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং তাঁকে অবিলম্বে দেশের তরুণ বিপ্লববাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। যুগান্তর নেতৃবৃন্দ বৈপ্লবিক চরিত্র সংবলিত সুভাষচন্দ্রকে একদিকে যেমন দেশবন্ধুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন, অপরদিকে তেমনি সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তাঁকে সে সময়ের অবস্থার বিচারে অগ্রস্থিতিপরায়ণ এবং রাজনৈতিক অর্থে যথেষ্ট-গতিবেগসম্পন্ন বলেও মনে করতেন। মুখ্যত দেশবন্ধুর অনুরোধেই এই বৈপ্লবিক সংস্থাটি এক বৎসরের জন্য অসহযোগের স্বার্থে কাজ করতে স্বীকৃত হয় এবং ১৯২০-র কলকাতা কংগ্রেসে স্বরাজের প্রস্তাব সমর্থন করেন। আসলে প্রকাশ্য অহিংস কর্মসূচী গ্রহণের আড়ালে যুগান্তর কর্মীরা সাময়িকভাবে নিজেদের শক্তি সংহত করে গোপন সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। এই কৌশলগত কারণেই বোধহয় তাঁরা দেশবন্ধুর council entry কর্মসূচীকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এইসব বিপ্লবী যেমন একদিকে কংগ্রেসের মঞ্চ দখল করে দেশে বিপ্লববাদের পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন, অপরদিকে তেমনি সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশবন্ধু ঘনিষ্ঠ অনুগামিরা কংগ্রেসকে ক্রমশ বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে জাতীয় আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গ-বিপ্লবীদের মেলাতে চেয়েছিলেন। পরিণামে অবশ্য গান্ধীপন্থার বিরোধী সুভাষচন্দ্র তাঁর এই বৈপ্লবিক সংসর্গের জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও ইংরেজ শাসকশক্তি উভয়েরই বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বস্তুত অনুশীলন ও যুগান্তর দলের মধ্যে

যথাক্রমে Russian ও Irish পদ্ধতিতে ভারতে বিপ্লব সাধনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিশ-ত্রিশ দশকে একটি মৌল দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল। যেহেতু যুগান্তর দলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র প্রথম দিকটায় খানিকটা যুক্ত ছিলেন, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি তাঁকে আইরিশ মনোভাবাপন্ন বলে চিহ্নিত করতেন। এমন কি তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু চিত্তরঞ্জনকে আইরিশ নেতা পার্নেলের সঙ্গে এবং দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের স্বরাজ্য পার্টিকে সিনফিন দলের সঙ্গে তুলনা করা হত। এই সঙ্গে অনুশীলন দলও তারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে নিজেদের মধ্যে পেতে সমভাবে অগ্রহী ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে এই প্রতিযোগিতাকে তখনকার বিপ্লবী মহলে পরিহাসচ্ছলে বলা হত 'Capturism'।

যুগান্তরের সহায়তায় দেশবন্ধু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠনে উদ্যোগী হলে সুভাষচন্দ্র তাঁর এবং যুগান্তর দলের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। একরকম তাঁর মধ্যস্থতায় যুগান্তর দল দেশবন্ধুকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক সহায়তাদানে স্বীকৃত হয়, কেননা সে সময়ে বাংলা দেশে বিপ্লবীদের বাদ দিয়ে কিছু করা সম্ভব ছিল না। যুগান্তর দল প্রকৃত পক্ষে গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে সক্রিয় প্রতিরোধে রূপান্তরিত করতে আগ্রহী ছিলেন, এবং সে কারণে আন্দোলনের স্বার্থে দেশবন্ধুকে সহায়তা দান করেন। ১৯২৩-এর গয়া কংগ্রেসের পর সত্যেন মিত্র, প্রতাপ গুহরায়, অনিলবরণ রায়, হেমপ্রভা মজুমদার এবং গোপিকাবিলাস সেন প্রমুখ বিশিষ্ট যুগান্তর কর্মী দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগ দেন। যুগান্তর দলের ওপর দেশবন্ধুর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার এই বিষয়টি এই সময়কার সরকারের গোপন রাজনৈতিক দলিলে সমধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। ১৯২৩-এর দিল্লী-কংগ্রেসের বিশেষ সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর পক্ষে যুগান্তর দলের সমর্থন সংগ্রহের জন্য একটি সভাও আহ্বান করেন এবং যুগান্তর দল তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন জানান। এছাড়া যুগান্তরের সাপ্তাহিক 'সারথি' এবং এবং দেশবন্ধুর সৃষ্ট 'আত্মশক্তি', 'বাংলার কথা' ও 'Forward' কাগজগুলির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র সমেত যুগান্তর গোষ্ঠীর ভূপতি মজুমদার প্রমুখ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

বাংলার বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সে সময়ে বৈপ্লবিক যুগান্তর কর্মীরা সুভাষচন্দ্রের কলকাতা কর্পোরেশনে Chief Executive Officer হিসাবে

নিয়োগের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। ১৯২৪-এর বিখ্যাত তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে সুভাষচন্দ্রের মত যুগান্তর দলীয় সুরেন ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, পাঁচুগোপাল ব্যানার্জি ইত্যাদি দেশবন্ধুর নেতৃত্ব স্বীকার করেন, অপরদিকে প্রধানত অগ্রবর্তী বাস্তবধর্মী সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ম সমিতিতে যুগান্তর কর্মীরাও সবিশেষ প্রাধান্য পান। মূলত বৈপ্লবিক আদর্শে বিশ্বাসী যুগান্তর সংস্থার সঙ্গে নিকট সম্পর্কের জন্যই অক্টোবর মাসে ১৯২৪ তিনি সুরেন ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন মিত্র এবং আরো কয়েকজন যুগান্তর নেতার সঙ্গে Criminal Law Ordinance অনুযায়ী কারারুদ্ধ হন দীর্ঘ দিনের জন্য।

বলতে গেলে ১৯২০-৩০ এর দশক দুটিতে ভারতীয় জনগণের পক্ষে মোটামুটি যে দুইটি বিপ্লবের মডেল প্রাপ্তব্য ছিল, তা হচ্ছে গণভিত্তিক রাশিয়ান ও সন্ত্রাসবাদী আইরিশ মডেল। বাংলা তথা ভারতে বিপ্লবী গোষ্ঠিগুলির মধ্যে 'অনুশীলন' এবং 'যুগান্তর' দল ভারতে বিপ্লবসাধনের ও মৌল দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে যথাক্রমে রাশিয়ান ও আইরিশ মডেলে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের মধ্যেকার বিরোধ সুভাষ-সেনগুপ্তর বিরোধ নয়, বরং কংগ্রেসের আদর্শ নিয়ে গোষ্ঠিগত বিরোধ। অনুশীলন এমন দেশব্যাপী প্রকাশ্য গণ আন্দোলন সৃষ্টিতে প্রয়াসী ছিলেন এবং অধিকতর প্রস্তুতির পক্ষপাতি ছিলেন, অপরপক্ষে যুগান্তর গোষ্ঠী কিন্তু গুপ্ত ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ও পুরানো কায়দায় খণ্ড বিক্ষুব্ধ অভ্যুত্থানে আগ্রহী ছিলেন। গুপ্তপন্থী যুগান্তর ছিল অনুশীলন ত্যাগী প্রধানতঃ শিথিল আঞ্চলিক ও বিকেন্দ্রীকৃত একটি সংস্থা, অপরপক্ষে কিছুটা যুক্তরাষ্ট্রিক ধাঁচের ধীরপন্থী অনুশীলন দল ছিল মূলতঃ কেন্দ্রীকৃত সর্বভারতীয় একটি সংস্থা। অনুশীলন সর্বভারতীয় ও যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বসী সংগঠন এবং এর দুটি স্তর ছিল একটি বহিরঙ্গ ও একটি অন্তরঙ্গ। অনুশীলনের গণভিত্তিক আন্দোলনে ও ব্যাপক সমাজবাদে অঙ্গীকার সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। এসব কারণে রাজনৈতিক অ্যাডভেঞ্চার বিরোধী অনুশীলনের প্রতি সুভাষচন্দ্রর মতবাদগত সাদৃশ্য ছিল অধিকতর প্রকট। কেননা নীতিগতভাবে সুভাষচন্দ্রে একদিকে যেমন গান্ধীবাদ বিরোধী, অপরদিকে তেমনি গুপ্তসন্ত্রাসবাদেও বিরোধী ছিলেন।

কোনও নির্দ্দিষ্ট বিপ্লবীদলে যুক্ত না থাকলেও প্রধানত তাঁরই আগ্রহে ও উদ্যোগে মেদিনীপুর জেলে বাংলার অনুশীলন দলের নরেন্দ্রনাথ সেন,

রবি সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলি প্রমুখ এবং যুগান্তর দলের যাদুগোপাল মুখার্জি, সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও ভূপতি মজুমদার প্রমুখ মিলিতভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মান্দালয়ে কারাবাসকালে যুগান্তর রাজবন্দীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতর হয়। মান্দালয় থেকে ভারত সচিবের কাছে সরকারি গোয়েন্দাদের সম্পর্কে যে প্রতিবেদনটি যুগান্তর নেতা ভূপেন দত্ত ও জীবনলাল চ্যাটার্জি প্রেরণ করেন, তা সুভাষচন্দ্র লিখে দেন। প্রতিবেদনটির একটি অনুলিপি দেশবন্ধুর কাছেও পাঠানো হয়। তাছাড়া তৃতীয় আন্তর্জাতিক-এর দ্বিতীয় সম্মেলনে যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে যাদুগোপাল মুখার্জি লেনিনের কাছে যে বৈপ্লবিক ভাষ্যটি পাঠান সুভাষচন্দ্র সেটিকে জেল থেকেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কাছেও পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

১৯২৮ সালে যুগান্তর কর্মীদের উদ্যোগে এবং আগ্রহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে বৃত হন। মূলত যুগান্তর দলের অনুরোধে ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে সরকারি প্রস্তাবের একটা সংশোধনী দেন। প্রস্তাবটি পরাজিত হলেও পরিণামে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর নৈতিক জয় এক বৈপ্লবিক নেতৃত্বের সাফল্য সূচিত হয়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, কংগ্রেসে GOC পদের জন্য সুভাষচন্দ্র ছিলেন অনুশীলন এবং যুগান্তর উভয় দলের Compromise Candidate। এই উপলক্ষে তাঁকে কেন্দ্র করে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কর্মীরা সাময়িকভাবে একই মঞ্চে মিলিত হন। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য কম নয়, বিশেষ করে সেই সময়ের রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদের পটভূমির বিচারে।

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে শেষ মুহূর্তে বিপ্লবী দুটি গোষ্ঠী, অনুশীলন ও যুগান্তরের সমর্থন পুষ্ট হয়ে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তোলেন গান্ধী উত্থাপিত সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। শুধু এই নয়, এই সময় কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রূপে সুভাষচন্দ্র এই বিপ্লবীদের সংস্রবে উজ্জীবিত হয়ে পণ্ডিচেরী ও সাবরমতী আদর্শের তীব্র সমালোচনা করে নিজের অগ্রগতিবাদের (?) স্বাক্ষর রাখেন।

সুভাষচন্দ্র যতীন্দ্রমোহন কলহে (যা নাকি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও

পরিপূর্ণ স্বাধীনতা কর্মীদের লড়াই বলে অভিহিত হয়) যুগান্তর দল সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানায় কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর গতিশীল ও প্রতিবাদী বিকল্প নেতৃত্বের জন্যে। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর সচিব কৃষ্ণদাস এই মন্তব্য করেন যে "সুভাষবাবু থাকেন যুগান্তরের সঙ্গে, যতীন্দ্রমোহন থাকেন অনুশীলনের সঙ্গে।" ১৯৩১-৩২ সরকারি নথিপত্রেও এই ধারনার সমর্থন মেলে (4/2/32 Home (Pol.) Note Prepared By the Govt. of Bengal on the alliance of Congress with Terrorists in Bengal.)

সুভাষচন্দ্রকে নিজ নিজ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার ব্যাপারে তখনকার বাংলা দেশে দুটি প্রধান বিপ্লবীদলের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল, তার আভাষ দিয়ে শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিপ্লবের সন্ধানে' গ্রন্থে (পৃঃ ৮১) লিখেছেন—"১৯২৩ সালের মাঝামাঝি উপেনদা তাঁর উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেন এবং দাদাদের মতিগতি দেখে সুভাষবাবুকে করায়ত্ত করে গোপনে অনুশীলন পার্টিকে নিয়ে কাজ করেন। অনুশীলন পার্টি চাইছিলেন জনপ্রিয় সুভাষচন্দ্রকে যুগান্তর দল থেকে ছিনিয়ে নিতে এবং তার জন্য একচ্ছত্র নেতৃত্ব মেনে নিতে, যাতে কংগ্রেস এবং পাবলিক ফিল্ডে তাঁদের কাজের সুবিধা হয়।

চট্টগ্রাম যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং চট্টগ্রাম রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি এই সম্মেলনে বলেন যে রাজনৈতিক বন্ধনমোচন ও সামাজিক উৎপীড়ন নিবারণের আন্দোলন ভারতবর্ষে যুগপৎ হওয়া উচিত। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের পরিকল্পনার পিছনে তাঁর যে নৈতিক সমর্থন ছিল, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায়ে সংশ্লিষ্ট বিচারপতি তার উল্লেখও করেছেন। এই বিচারপতির মতে সুভাষচন্দ্র তাঁর চট্টগ্রাম ভাষণে গান্ধী প্রদর্শিত অহিংস পথে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব নয় বলে মন্তব্যও করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি থাকবার সময়েও আলিপুর ও দমদম জেলে তিনি যুগান্তর গোষ্ঠীর বেশ কিছু বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চট্টগ্রামের সূর্য সেন কংগ্রেস সংগঠনে বঙ্গ বিপ্লবীদের মধ্যে সুভাষের ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন এবং তাঁর বৈপ্লবিক নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করেন।

১৯৩৮ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর একটি ঘোষণা মারফত যুগান্তর দল

আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নীতিগত কারণে ত্রিপুরীর পরে এই দলটির বিচ্ছেদ ঘটে। পক্ষান্তরে, এই সময় তিনি গণভিত্তিক বিপ্লবের প্রবক্তা অনুশীলন দলের সমর্থন লাভ করলেন। প্রধানত হিংসা অহিংসা ও জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে যুগান্তরের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে।

যুগান্তর দল কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কার্যক্রমকে অবাস্তব, অসময়োচিত এবং জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বলে মনে করেন। সুভাষচন্দ্রের সে সময়কার কর্মনীতিতে যারা অবিচল আস্থা দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানত অনুশীলনের ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এবং প্রতুল গাঙ্গুলি ছিলেন অগ্রগণ্য। ডঃ ভূপেন দত্ত প্রমুখ যুগান্তরপন্থী অবশ্য সুভাষচন্দ্রকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন যেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আদর্শগত বিরোধিতাকে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে না যান।

পূর্ব এশিয়ায় ভারতে মুক্তি আনয়নের সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বহু আঞ্চলিক প্রাক্তন যুগান্তর বিপ্লবীদের সক্রিয় সহায়তা লাভ করেন।

তাঁর স্থির ধারণা ছিল যে বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক ঘটনায় বাঙালির মন শিহরিত হলেও ত্যাগের পরকাষ্ঠা দেখালেও অব্যাহত আন্দোলনের স্বার্থে সংগ্রামে ভিন্নতর কার্যকরী পন্থা আবশ্যক। 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে ইংরাজ সরকারকে তিনি বারংবার বিপ্লবীদের প্রকৃষ্ট মানসিকতা অনুধাবনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, এমনকি সম্পূর্ণ পথে ধাবমান এই বিপ্লবীদের সঙ্গে অর্থবহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন (p-303, The Indian struggle—S Bose)। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম গ্রন্থে তিনি একাধিকবার বলেছেন যে বিপ্লবীদের আন্দোলন নৈরাজ্যবাদী নয়, নিছক সন্ত্রাসবাদী বা বিক্ষোভমূলকও নয় বরং বিপ্লবের মাধ্যমে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সমন্বিত। সরকারি প্রতিহিংসা ও দমননীতি যে স্বাভাবিকভাবে এই বিপ্লববাদী প্রয়াসের জন্ম দিয়েছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু গুপ্ত সন্ত্রাসের উপযোগিতা সম্পর্কে সংশয়াকুল হয়ে ১৯৩৭ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে সুভাষ ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশে আর গুপ্ত বিপ্লবের পন্থা অনুসৃত হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। অবশ্য এও সত্য যে দেশব্যাপী গণ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিপূরক হিসাবে বিক্ষুব্ধ গোপন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের প্রান্তিক উপযোগিতার কথাও তিনি

স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নিয়মতান্ত্রিক ও ধীরপন্থী কংগ্রেস দলের সঙ্গে তাঁর দলগত ও সাংগাঠনিক সংস্রব থাকায় অহিংসাকে প্রধানত কৌশল রূপে জ্ঞান করলেও মতবাদগত দিক থেকে তিনি রাজনৈতিক জীবনে সাময়িকভাবে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধান করতে বাধ্য হয়েছিলেন দলীয় আনুগত্যের কারণে। কিন্তু সবকিছু বিবেচনা করলে মনে হয় অনুশীলনের সুনির্দিষ্ট মতবাদ ও পারম্পর্যবিশিষ্ট ধারাবাহিক কর্মপন্থাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রয়োজন বিচারে প্রেয় ও শ্রেয় মনে হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র নিজে বলেছিলেন যে, হিংসাত্মক অথবা অহিংসাত্মক সকল প্রকার গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, এই সন্দেহে বার বার সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। পুলিশের গুপ্ত নথিপত্র ও সরকারি দলিলে তাঁর সঙ্গে গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলা হয়েছে। লোথার ফ্রাঙ্ক অথবা হিউ টয়ও বলেছেন যে, এই সংস্থাগুলির গঠন ও প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকা ছিল। তাঁর 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থের সমালোচক মিঃ ক্লিয়ারির মতে তিনি ছিলেন বাংলার বৈপ্লবিক আত্যন্তিকতাবাদী শক্তি সমূহের প্রকৃত অধিনায়ক।

বস্তুতপক্ষে কংগ্রেস ও ভারত সরকারের মধ্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্যই তিনি নাকি সন্ত্রাসবাদীদের মদত জুগিয়েছিলেন—এমনকি তিনি, বাংলায় বিপ্লবীদের প্রকৃত প্রতিনিধি স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলে এই জাতীয় ধারণার প্রচার দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি তাঁর প্রীতি ছিল সীমাবদ্ধ। যোগাযোগও ছিল প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ। এক জায়গায় তিনি বলেছেন ঃ "দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, আত্মসংযম হারিয়ে ইতিহাসের চিরাচরিত পন্থা—সশস্ত্র বিদ্রোহের পন্থা—অবলম্বন করেছিল।" সুভাষচন্দ্র অবশ্য গুপ্ত বিপ্লব পন্থাকে 'বিভীষিকা পন্থা' বলতে চাননি। সুভাষ ছিলেন বিপ্লবী ও বিদ্রোহী, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী নন। বরং রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যুষে বিপ্লবী সঙ্ঘের পরিবেশের মধ্যে তাঁর দেশসেবার ভাবাদর্শ স্ফূর্তি পায়। তাছাড়া তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যুবমানসের বিশেষ ভাবমূর্তি, সংগ্রামী অর্থাৎ সংস্কার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক গতিশীলতা এবং যথার্থ বৈপ্লবিক চরিত্র প্রভৃতির কারণে, অনুশীলন যুগান্তরের বিপ্লবীবৃন্দ সুভাষের নেতৃত্বে

ঐক্যবদ্ধভাবে (পুলিন দাস ও অনুশীলন-পন্থী রবি সেন, যুগান্তরের সত্য গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে এক যোগে) কাজ করতে অনুপ্রেরিত বোধ করেন।

সাধারণভাবে অবশ্য উভয় বিপ্লবীদলের কর্মীদের বিপ্লবী নিষ্ঠা ও কর্ম-শক্তির উপর সুভাষচন্দ্রের সমান আস্থা ছিল, যদিও কর্মপন্থার দিক থেকে অনুশীলন দলের নীতির ও কর্মসূচীর সঙ্গে তিনি অনেকটা সহমত ছিলেন। এখানে লক্ষণীয়, বিপ্লবী দলগুলির নেতৃমহলে প্রাধান্য প্রতিযোগিতার কারণে Revolting group-এর সর্বকল্প নব্য নেতৃত্বের জন্য (রংপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে এবং বি ভি সহযোগে) প্রয়াস এবং ভারতব্যাপী বিপ্লব সাধনের জন্য রাসবিহারী বোস প্রমুখের প্রয়াস সমভাবে তাঁর কাছে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অবস্থা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা বলে মনে হয়েছিল। যুগান্তর দল সম্পর্কে তাঁর একটা সংশয়ের কারণ হয়ত এই হতে পারে যে বহুধাবিভক্ত, যুগান্তর আঞ্চলিক গোষ্ঠী একটি সুসংহত সংঘবদ্ধ এককেন্দ্রিক দল হিসাবে কাজ করত না, অপর পক্ষে অনুশীলন একটি সর্বভারতীয় সংস্থা হিসাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে কর্মপন্থাগত বিরোধ থাকলেও, যুগান্তর ও অনুশীলন দলের মূল বিরোধ ছিল কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে।

প্রকৃতপক্ষে, জীবনের প্রথমদিকে সুভাষ বিপ্লবী কিংবা সন্ত্রাসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, তার কারণ, তাঁর ভাষায় "————আমি ————বিশ্বাস করিতাম যে, জাতীয় জনগঠনের কার্যপ্রণালীর মধ্য দিয়া আমাদের দেশবাসীর চরম মুক্তি আসিবে (ভারত পথিক)।" পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মূল আন্দোলন অহিংস অসহযোগে অংশগ্রহণ করলেও, মন থেকে তিনি জানিতেন যে, সংঘবদ্ধভাবে হিংসার পথেই দেশের পরাধীনতা মোচনে অগ্রসর হতে হবে। বিদেশে প্রবাসকালে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন, অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসও গভীরভাবে পাঠ করেন। সংস্কারে বা সংসদীয় পন্থায় তাঁর আস্থা দীর্ঘকাল শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। ১৯২৯ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রখ্যাত অমরাবতী ভাষণে তিনি বলেন, এখানে সেখানে এক আধটু সংস্কার দ্বারা কাজ হইবে না। বাহ্যিক প্রলেপ কার্যকরী হইবে না। সম্পূর্ণ নূতন জীবন পরিগ্রহণই আমাদের

বর্তমান প্রয়োজন। ইহাকে ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ বিপ্লব আখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমাগত প্রচারনার মাধ্যমে দেশের গণশক্তিকে সংগঠিত করার কথাও বলেন তিনি ঃ 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও বন্ধনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন তিনি।

কাম্বে বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "বিপ্লবের পথে অস্ত্র ধারণ করে সমস্ত বাধা ধ্বংস করতে হয় এবং সেই জন্যেই রক্তপাত বিপ্লবের একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের বিপ্লব হবে জনগণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক এবং বিশ্ববিপ্লবের অঙ্গীভূত বিপ্লব" এই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। সেই কারণেই তিনি একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করেছিলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক গণজাগরণের অপেক্ষায় ছিলেন। ব্যক্তিগত এবং খণ্ডবিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা যে কখনও কখনও এই ধরনের জাগরণের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে, তাও তিনি বলেছিলেন। হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্টভাষায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে কয়েকটি বোমা ও পিস্তল সাময়িকভাবে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করলেও বিপ্লব সাধনে সহায়ক হবে না। (Fortnightly Press Reports First Half of October, 1929) হলিডে পার্কের জনসভায় তিনি বললেন যে, অতর্কিত হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, সুসংগঠিত শাসকশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য যথাযোগ্য এবং দীর্ঘ বাস্তব ও মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, অমরাবতী সম্মেলন ১৯২৯ থেকেই তিনি এ কথা বলে এসেছেন। ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেস সম্মেলনে নিজেকে 'Extremist' এই আখ্যা দিয়ে সুভাষচন্দ্র একটি Parallel Govt. গঠনের ডাক দেন।

নিজের কেন্দ্রীয় সংস্থা, গণভিত্তিক সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ ও মার্কসবাদের প্রতি পক্ষপাতের প্রতিফলন তিনি লক্ষ্য করেন অনুশীলনের মতবাদ ও সংগঠনের মধ্যে; এছাড়া নিছক জাতীয়তাবাদী যুগান্তরের চেয়ে অনুশীলন দলের মধ্যে তিনি রাজনৈতিক যুক্তিবাদী হিসাবে সত্যকার পরিণত ও ব্যাপক রাজনৈতিক মানসিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন এই কারণে যে, স্বাধীনতা উত্তর ভারত রাষ্ট্রের স্পষ্টতর ভাবনা ও রূপরেখা অনুশীলনের কর্মসূচীর মধ্যেই ছিল। অনুশীলন কল্পিত (১৯২৪ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত সভায়) ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি ছিল সাধারণতন্ত্রী,সমাজতন্ত্রী গণতান্ত্রিক এক রাষ্ট্র। এটা অবশ্য ঠিক যে ইংরাজ রাজের অত্যাচার, বৃটিশদের ব্যক্তিগত আচরণ,

মহাযুদ্ধ এবং গান্ধীজীর গণ আন্দোলন (১৯২২—২৩) প্রত্যাহারে উত্তপ্ত হয়ে সে সময়ের অগ্রস্থিতিশীল তরুণনেতা সুভাষচন্দ্র বাংলা কংগ্রেসে সংখ্যায় প্রবল যুগান্তরের গোপন সশস্ত্র এবং অব্যবহিত কর্মভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে (যা আইরিশ ও ইটালিয় কর্মপন্থা প্রভাবিত ছিল) আকৃষ্ট হয়েছিলেন সাময়িকভাবে। অবশ্য প্রকাশ্যভাবে জাতীয় নেতা ও তারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্রকে তাঁরাও পুরোভাগে রাখতে চেয়েছিলেন সুবিধাগত কারণে। এবং এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে দুটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পরিবর্তে সুনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ্য জাতীয় সংগ্রামের কথাই বিশ-এর দশকের শেষ থেকে তিনি বেশি করে ভেবেছেন। অনুশীলন সমিতি মূলত একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে স্ফূর্তি লাভ করে। প্রথমে মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী পর্যায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত নূতন শক্তিগুলি ভারতবর্ষে একই সঙ্গে গণভিত্তিক আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক উদ্যোগের প্রকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। বলতে গেলে গান্ধী পরিচালিত গণ-আন্দোলন এবং বিশ্বজনীন সাম্যবাদী আন্দোলন উভয়ই সমভাবে সুভাষচন্দ্র এবং বৈপ্লবিক উদ্যোগের প্রকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। গান্ধী পরিচালিত গণআন্দোলন এবং বিশ্ব-জনীন সাম্যবাদী আন্দোলন উভয়ই সমভাবে সুভাষচন্দ্র এবং অনুশীলনের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। অনুশীলন সমিতির মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখার্জি এবং নলিনী দাশগুপ্ত, সকলেই সাম্যবাদী হিসাবে সুভাষচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অনুশীলনের গোপেন চক্রবর্তি এবং নরেন্দ্রমোহন সেন পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মঘটে সহযোগিতা করেন। যুগান্তর কর্মীদের মত অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্মিরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ১৯২৪ সালে গেপ্তার হন। যদিও অনুশীলনের প্রবীণ নেতৃবন্দ সন্ত্রাস-বাদী কাজকর্মকে অ্যাডভেনচারিষ্ট আখ্যা দেন এবং ভারতে সেটি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতিবন্ধকতা করবে এরকম আশঙ্কা করতেন। তথাপি সম্মিলিত-ভাবে অনুশীলন এবং যুগান্তরের তরুণ কর্মীবৃন্দ আশু বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কর্মের জন্য ১৯২৮-২৯ সালে সুভাষের নেতৃত্ব কামনা করেন। এই তরুণ ভারতীয় বিপ্লবীগণ সুভাষের মতন সাময়িকভাবে আইরিশ বিপ্লবী মডেলের দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯২৮-৩০ শের পর্বে প্রত্যক্ষ কর্মের রোমাণ্টিকতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রতি একটা তাত্ত্বিক আকর্ষণ এই মুক্তমন অনুশীলনের

কর্মীবৃন্দ যে অনুভব করতেন তা অন্যভাবে তাদের সুভাষের সমীপবর্তী করে তোলে। সে সময় সরকারি মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় সুভাষচন্দ্র এবং অনুশীলন কর্মীরা সন্তুষ্ট ছিলেন না; দেশের বাস্তব অবস্থাও সাম্যবাদ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল বলে উভয়েই মনে করতেন। উভয়েরই ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পটভূমির প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল যদিও মার্কসবাদী অর্থনীতিক কর্মসূচী বিষয় এঁরা সহমত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র এঁদের মত গোঁড়া মাকর্সবাদী ছিলেন না, যদিও পরে অনুশীলন উদ্ভূত আর. এস. পি. এবং সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক মাকর্সবাদী দল হিসাবে পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করে। সুভাষ এবং জাতীয় বিপ্লবী অনুশীলন কর্মীরা অবশ্য ১৯৩০-৩৮ পর্যায় গণভিত্তিক আন্দোলন বিবর্জিত ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর সন্ত্রাসকে ক্ষতিকারক বলে জ্ঞান করতে থাকেন। অনুশীলনের কিছু কর্মী এই পর্যায়ে Communist Consolidation এবং সাম্যবাদী দলে যোগ দিলেও কিছু কিছু কর্মী উপনিবেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আশুআন্দোলন এবং চূড়ান্ত বিশ্ববিপ্লবের ক্ষেত্রে কমিণ্টার্নের ভূমিকা সম্পর্কে সংশয়াকুল ছিলেন।

এই সময় সুভাষ প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী উপাদান এবং অনুশীলন কর্মীরা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রকৃষ্ট প্রয়োগ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করতেন। এই ক্ষেত্রে C. P. I. এর সঙ্গে তাদের মত পার্থক্য ঘটলেও সুভাষচন্দ্র এবং অনুশীলন বিপ্লবীগণ সোভিয়েত রাশিয়ার জাগরণ মূলক ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণভাবে সশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁরা এবং সুভাষচন্দ্র উভয়ই একদিকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের এবং অপরদিকে C. P. I. এর ভূমিকা সম্পর্কে খানিকটা সন্দিহান ছিলেন, যদিও জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে এরা উভয়েই সাম্যবাদীদের সঙ্গে issue-ভিত্তিক সমঝোতা থেকে বাম সংহতি সংস্থায় পর্যন্ত সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯৩৬ সালের অনুশীলন মার্কসবাদীদের খসড়া দলিল এবং ১৯৪০ এর ফরওয়ার্ড ব্লকের দলীয় কর্মসূচী পরস্পরের যথেষ্ট নিকটবর্তী ছিল। অনুশীলন কর্মীরাও একটা পৃথক বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক সংস্থা হিসাবে নিজেদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে চেষ্টা করেছিলেন এবং অনুশীলন মার্কসবাদীরা কংগ্রেসে Socialist Party'র সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে যুদ্ধের সুযোগে তীব্রতর করার প্রয়াসী ছিলেন'। ত্রিপুরীতে অবশ্য সুভাষচন্দ্রকে এবং

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের চরিত্র এবং সংস্থাগত ঐক্যের বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস Socialist Party'র সঙ্গে এদের মতান্তর ঘটে। এটা স্পষ্ট যে, সঠিক যুদ্ধনীতি এবং জাতীয় সংগ্রামের সূচনা করা নিয়ে ঐক্য-পন্থী কংগ্রেস, C. S. P. এবং রায় পন্থীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত মৌলিক পার্থক্য প্রকট হতে থাকে। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সুভাষের চরমপত্র দেওয়া এবং বিকল্প নেতৃত্বের শ্লোগান কংগ্রেসের ঐক্য-পন্থীদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়, যদিও অনুশীলন এবং সুভাষপন্থীদের কাছে বিরোধীদের যুদ্ধের সময় এই নিষ্ক্রিয়তা বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার নামান্তর বলেই মনে হয়েছিল। অনুশীলন মার্কসপন্থীরা সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিরোধে সমন্বিত হন এবং সুভাষকে দেশের সাচ্চা সংগ্রামপ্রবণ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির প্রধান মুখপাত্র রূপে গ্রহণ করেন। দেশব্যাপী সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থে, তথাকথিত বাম-পন্থীদের পরিবর্তে সুভাষকেই এরা যথার্থ আশু এবং বাস্তব অর্থে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বামসংহতির হাতিয়ার হিসেবে জ্ঞান করেছিলেন। সমস্ত ক্ষমতা জনগণের এই আওয়াজ তুললেও, অনুশীলনপন্থীরা মনে করতেন যে, শ্রেণীহীন সমাজ আনবার চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে এঁদের ফরওয়ার্ড ব্লকে মিশে যাওয়া ছিল অপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া এঁরা মনে করতেন যে, ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে এত বিচিত্র অ-মার্কসপন্থী উপাদান আছে যে তাদের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক দলে থেকে নিজেদের কর্মসূচী রূপায়ন সম্ভব নয়। ১৯৪০ সালে রামগড়ে অনুষ্ঠিত আপোসবিরোধী সম্মেলনে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইংরাজের সঙ্গে আপোস কোনমতেই সম্ভব নয় বলে ফরওয়ার্ড ব্লক, লেবার পার্টি, কৃষাণ সভা এবং C. S. P'র অন্তর্ভুক্ত অনুশীলন গোষ্ঠীবিবেচনা করেন এবং আপোসবিরোধী সংগ্রামের জন্য ভারতীয় জনগণকে সর্বপ্রকারে সংহত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ঊনিশশো কুড়ির প্রথম দিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর গৃহে গান্ধীজির সঙ্গে অনুশীলন বিপ্লবীদের একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের সাময়িকভাবে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে বলা এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে অনুরোধ করা। বলা বাহুল্য উদ্দেশ্যটি কার্যত সিদ্ধ হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, চিত্তরঞ্জন স্বয়ং অনুশীলন-পন্থী ছিলেন। তাঁর ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র বোধ করি এই

সাক্ষাতের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এবং এটাও ঠিক যে সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক গোষ্ঠী হিসেবে অনুশীলন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এই দল মূলত একটি গণভিত্তিক সংগঠিত এবং প্রকাশ্য প্রতিরোধ-আন্দোলনে বিশ্বাস করত। তাছাড়া দলটি ছিল মোটামুটি কেন্দ্রীকৃত একটি সংস্থা। নীতিগতভাবে সুভাষচন্দ্র একদিকে ছিলেন যেমন গান্ধীবাদবিরোধী অপরদিকে তেমনি গুপ্ত সন্ত্রাসবাদেরও বিরোধী। এই কারণে অনুশীলন-গোষ্ঠীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একটা মতবাদগত সাযুজ্য ছিল। এই সাযুজ্য ত্রিশের শেষের দিক থেকে ভিন্ন পরিস্থিতিতে আরও স্পষ্ট হয়। এখানে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, আনুষ্ঠানিকভাবে সুভাষচন্দ্র দেশের কোনও বিপ্লবী দলের সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। একই সঙ্গে বলতে হয় যে, দেশের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির কাছে 'তরুণ জঙ্গী' অগ্রস্থিতিবাদী একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল; একটা আপেক্ষিক গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। (Netaji A Crusader's Tributé : Nripen Banerji Nation, 23 January 1950) এই গ্রহণযোগ্যতার পিছনে যে কারণগুলি ছিল, তা হল প্রথমত জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি; দ্বিতীয়ত একটি প্রত্যক্ষ আপোসবিরোধী তথা সংগ্রামী মেজাজ; তৃতীয়ত হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে তাঁর মুক্ত-মনস্কতা। বলাবাহুল্য যে স্বাধীনতার লক্ষ্য এবং জাতীয় সংগ্রামের পদ্ধতির দিক থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁদের অনেকটা কাছের মানুষ ছিল।

বস্তুত অনুশীলন কর্মীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সংযোগ ঘটে উনিশশো একুশ সালের পর থেকে। 'বাংলায় বিপ্লববাদ' (পৃঃ ৬২) গ্রন্থে বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন যে, অনুশীলনপন্থী অবনী মুখোপাধ্যায় আশ্রয়ের সন্ধানে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যান এবং সুভাষচন্দ্রকেও আশ্রয়ের কথা বলেন। উপেনবাবু ও সুভাষচন্দ্র উভয়ই প্রতুল গাঙ্গুলিকে সংবাদ পাঠান। তার ফলে অনুশীলন সমিতি অবনী মুখার্জিকে ঢাকাতে একটি নিরাপদ স্থানে রাখার সিদ্ধান্ত করে। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে নলিনী গুপ্তের জন্যও সমিতি উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমেই সুভাষচন্দ্র পরিচিত হয়েছিলেন অনুশীলনের শচীন সান্যাল ও অবনী মুখার্জির সঙ্গে। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে বিপ্লবীদের একটি গোপন আড্ডায় এই সাক্ষাৎকার হয়, এই কথা

জানিয়েছেন তাঁর সহপাঠী বন্ধু হেমন্ত সরকার—'সুভাষের সঙ্গে বারো বছর' (পৃষ্ঠা ৬৯)। প্রকৃতপক্ষে উনিশশো একুশ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'বিজলী'র কার্যালয়ে অনুশীলন বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ সুভাষের সঙ্গে হিংসা বিপ্লব ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করেন—এই মর্মে সংবাদ পাই 'মাসিক বসুমতী' (তেরোশ' বাহান্ন সালের মাঘ সংখ্যায়) উপেন্দ্রনাথ লিখিত একটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে উপেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন যে অহিংসার প্রশ্নে সুভাষের স্পষ্টত তখনই একটি দ্বিধা ছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভাল যে উপেন্দ্রনাথ উনিশশো বাইশ সালে 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন এবং ঐ সূত্রে সুভাষের সঙ্গে তার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের বিষয় নিয়মিত মত-বিনিময় ঘটত। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাষ্য অনুযায়ী —"এই সময় সুভাষবাবু উপেনদার আড্ডায় খুব যাতায়াত করতেন" (পৃষ্ঠা ৫১০—'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি')। অধিকন্তু অনুশীলনে অবনী মুখোপাধ্যায় ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উপেন্দ্রনাথের অনুরোধে সুভাষচন্দ্র অবনীকে আশ্রয় দানের ব্যাপারে সচেষ্ট হন বলে, অবনী মুখোপাধ্যায়ের জীবনীকার জানাচ্ছেন (ABANI MUKHERJEE—GAUTAM CHATTERJEE—Page-27) এখানে বলতে হয় যে, মুন্সিগঞ্জ কংগ্রেস সম্মেলনের পর উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুশীলনের প্রতুল গাঙ্গুলিকে খবর দিয়ে সুভাষের সঙ্গে মিলিত করেন বিপ্লব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শলা-পরামর্শের জন্যে (পৃষ্ঠা ৮১—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বিপ্লবের সন্ধানে')। অনুশীলনের অগ্রগণ্য কর্মী নারায়ণবাবু জানাচ্ছেন যে, জনপ্রিয় সুভাষচন্দ্রের উপর উপেনবাবু বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং 'যুগান্তর' থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অনুশীলনের কাজে সংশ্লিষ্ট করতেও চেয়েছিলেন। বস্তুত চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলের মধ্যে 'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন' উভয় গোষ্ঠীরই কর্মীরা ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতিতে যে সব 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' কর্মী ছিলেন তাঁরাও সুভাষের নেতৃত্ব একরকম মেনে নেন বলে, উনিশশো চব্বিশ সালের একটি পুলিশ প্রতিবেদনের উল্লেখ পাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সহযোগিতা না করে সেই সময় কোনো নেতাই নেতৃত্ব করতে পারতেন না, এ জাতীয় মন্তব্য করেছেন অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় সতীশ পাকড়াশি, তাঁর 'অগ্নিদিনের কথা' (পৃঃ ১৬২) শীর্ষক গ্রন্থে।

তাছাড়া মনেপ্রাণে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভিন্ন লক্ষ্য ও পদ্ধতির অনুসারী সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের কাছে বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিই ছিল স্বাভাবিক এবং অবস্থানুগ মিত্র। এই বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি কখনও মিলিতভাবে ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হয়েছে। কখনও আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন, এমন কি পরস্পরের প্রতিযোগী হিসাবে কাজ করেছে (১৯৩১) হয় সুভাষচন্দ্র নয় যতীন্দ্রমোহনকে সামনে রেখে। তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিফলিত হয়েছে কলকাতা পুরসভা, বিধান পরিষদ, এবং বঃ প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির মধ্যেকার রাজনৈতিক শিবিরকরণে। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রচ্ছন্ন বৈরীভাব বজায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না 'যুগান্তর' গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস-সংগঠনে মিশে যায়। এও ঠিক যে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যেই আবার নবীন ও প্রবীণের মতপার্থক্য সূচিত হয় বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে। আঞ্চলিক 'যুগান্তর' কর্মীরা (যেমন চট্টগ্রামে) এবং অনুশীলন কর্মীরা (যেমন ঢাকায়) দুই গোষ্ঠীর শাখাগুলি একটু স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতেন। তবে, বিশের দশকের শুরু থেকেই 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' কখনও সমান্তরালভাবে ক্রিয়াশীল, কখনও সহযোগী বা পরিপূরক, কখনও বা পরস্পরের প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে যুগান্তর বিপ্লবীরা ১৯২০ থেকে ১৯২৬, আবার ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রদেশ কংগ্রেসের একটা ক্ষমতাশালী নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে সুভাষকে সমর্থন জোগান। কিন্তু মধ্য ত্রিশ থেকেই এরা সুভাষবিরোধী শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন অবশেষে ১৯৩৮ সালে 'যুগান্তর' গোষ্ঠী সরাসরি কংগ্রেসে মিশে যায়। আবার এই সময় থেকেই অনুশীলনপন্থীদের সুভাষের যে মতবাদগত এবং কর্মসূচীগত আন্তঃক্রিয়া শুরু হয়, তা আজাদ-হিন্দ পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এ বিষয়ে ভুল নেই যে, বিশ ত্রিশের দশকে স্বভাব-বিপ্লবী সুভাষের সঙ্গে দুটি বৈপ্লবিক গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল, কিন্তু এই যোগাযোগের প্রকৃতি পর্যায়ক্রমে পালটেছে গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক দলগত বা সাংবিধানিক অবস্থান, গান্ধী-কংগ্রেসের নীতি এবং সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা-চরিত্রর বিবর্তন অনুযায়ী। তবে কয়েকটি বোমা বা পিস্তল সাময়িকভাবে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করলেও যে বিপ্লব-সাধনে তা সহায়ক হবে না, এই অভিমত তিনি সুস্পষ্টভাবে বহুবার ব্যক্ত করেছিলেন। অহিংসা তাঁর কাছে ছিল একটা

কৌশল মাত্র। সুভাষের চেষ্টা ছিল ১৯২৯ সাল থেকেই কংগ্রেস সংগঠনকে একটা বৈপ্লবিক মঞ্চে পরিণত করা এবং দেশের তাবৎ বিপ্লবী শক্তিগুলিকে কংগ্রেসের মধ্যে সমন্বিত করা। ১৯৩১ সালের তরা নভেম্বর এই মর্মে দেশের বিপ্লবীদের কাছে একটি আবেদনও প্রচার করেন। বাংলা তথা ভারতের বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী আপোসহীন সংগ্রামের স্বার্থে এবং লোকায়ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য, তিনি একাধিকবার সর্বপ্রকার মতপার্থক্য ভুলে এই গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে বলেন। বিশের সমস্ত সময় জুড়ে এবং ত্রিশের প্রথমভাগে এই বৈপ্লবিক সংস্থাগুলি প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে নির্ণয় করবার জন্য প্রভাব-গোষ্ঠীর যে ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং যার সঙ্গে তিনি নিজেও রাজনৈতিক জমি রক্ষা করবার জন্য পর্যায়ক্রমে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন, তার থেকে বৃহত্তর একটি ভূমিকায় তাঁরা অঙ্গীকৃত হন এবং বিপ্লবীদের ঐক্যকে চিরস্থায়ীকরণ, সুভাষচন্দ্র সেটাই এই কালপর্বে চেয়েছিলেন। ইংরাজ সরকারকে চরমপত্র দান, ভারতের নিজস্ব গণ-পরিষদগঠন; তথাকথিত যুক্তরাষ্ট্র-কে বর্জন, আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ, ভারতে সমান্তরাল সরকার, সংগ্রামমুখী মানসিকতার স্বার্থে কংগ্রেসে বিকল্প নেতৃত্ব ও বিকল্প কর্মসূচীগ্রহণ, সমাজ তন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষ আদর্শগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে সমর্থনে সুভাষ জমি সংগ্রহ করতে থাকেন বস্তুতঃ ১৯২৯-এর পর থেকেই। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে থেকেই দেশের বামপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব করে তিনি দাবি তোলেন যে জনগণের হাতেই প্রকৃত এবং চূড়ান্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দিতে হবে নতুবা জনগণ যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখল করবে। তাঁর, এই সব দাবির সঙ্গে বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির একটি অর্থাৎ অনুশীলন ক্রমশ একাত্ম হয়ে যায়, অপরপক্ষে 'যুগান্তর' বিপ্লবীরা ক্রমেই এগুলির সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করতে থাকেন। এই অনীহার কারণ হল কংগ্রেস-সংগঠনের পূর্ণ মূল্যায়ণের চেষ্টা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ও যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্নতর ব্যাখ্যা, সংগ্রামের লক্ষ্য, ভিত্তি এবং পদ্ধতি সবকিছু। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ঐক্য এবং দেশের ঐক্যকে এঁরা একত্রিত করে ফেলেছিলেন। সমাজতন্ত্রবাদে বামপন্থীদের অঙ্গীকার এঁদের আদৌ মনঃপূত ছিল না। সংগ্রাম চিন্তা 'যুগান্তর' গোষ্ঠীকে প্রায় পরিত্যাগ করেছিল।

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে বিপ্লবী দুটি গোষ্ঠী একত্রিতভাবে কাজ

করতে অঙ্গীকার করেন এবং এদের চাপে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তোলেন সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, এই সময় কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র এই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে পণ্ডিচেরী এবং সবরমতির আদর্শের তীব্র সমালোচনা করে নিজের সংগ্রামী মানসিকতার স্বাক্ষর রাখলেন। জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে তিনি বঙ্গ বিপ্লবীদের মেলাতে চেয়েছিলেন সংগ্রামের স্বার্থে। কংগ্রেসকে সংগ্রামমুখী করার জন্য একটা বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধান সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পেলেন বি. ভি., অনুশীলন এবং যুগান্তরের কর্মীরা (যাঁদের ঐক্যের প্রতীক ছিলেন সুভাষচন্দ্র)।

১৯২৯ সালে অনুশীলন কর্মী যতীন দাস এবং ভগৎ সিং সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র সহমর্মিতায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। ভগৎ সিংকে তিনি নবজাগরণের প্রতীক বলে মনে করেন। কেননা গণভিত্তিক সশস্ত্র আন্দোলনের আদর্শ ও মার্কসবাদের প্রতি পক্ষপাতের একটা প্রতিফলন তিনি লক্ষ্য করেন অনুশীলনের প্রাগ্রসর তরুণ এবং জঙ্গীদের মধ্যে। যতীন দাসকে যেমন তিনি দধীচি হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন তেমনি বলেছিলেন যে দেশে সহস্র ভগৎ সিং সৃষ্টি করতে হবে।

অনুশীলন গোষ্ঠীর সঙ্গে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ক্ষীণতর হতে থাকে এর কারণ যুগান্তর গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর সাময়িক পক্ষপাত, যে পক্ষপাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন মূলত সত্যরঞ্জন বক্সী ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। সুভাষের এই যুগান্তর প্রীতির জন্য অনুশীলন গোষ্ঠী অগত্যা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে তাঁদের নেতা এবং মুখপাত্র বলে মেনে নিলেন এবং সুভাষ-বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে গান্ধীবাদীরা সেনগুপ্তকে স্বীকৃতি জানালেন সুভাষকে কোণঠাসা করতে। বস্তুত সুভাষচন্দ্র দলীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হওয়ার পর থেকে অনুশীলন গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়ে যায়। (ভোলা চট্টোপাধ্যায়-এর Aspects of Bengal Politics in the early Nineteen Thirties—Page—2)। ১৯৩০ সালে গান্ধীজির সচিব সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন-এর এই ক্ষমতার লড়াইয়ের পিছনে মতবাদগত ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা সহজেই আবিষ্কার করেন। তখন গান্ধীজির সচিব কৃষ্ণদাস রহস্য করে বলেন যে,

"সুভাষ থাকেন যুগান্তর-এর সঙ্গে আর যতীন্দ্রমোহন থাকেন ঢাকা অনুশীলনের সংগে।" (১৯৩০ সালে কৃষ্ণদাস গান্ধীজীকে এই মর্মে চিঠি লেখেন এবং চিঠিটি পুলিশের হস্তগত হয় একথা জানা যায় যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি গ্রন্থে পৃঃ ৫০২)। যুগান্তর অনুশীলনের সাময়িক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হলেও অনুশীলন গোষ্ঠীর নবীন প্রজন্ম ক্রমেই মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এবং ব্যাপক 'গণসংগ্রামে'র দিকে ঝুঁকে পড়ছিল (Freedom Struggle and Anushilan Samiti—Vol-1 Page—241 Ed by Tarapada Chakrabarty)। অনুশীলন সমিতির মধ্যেকার এই নতুন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সতীশ পাকড়াশি এবং নিরঞ্জন সেন প্রমুখ বিপ্লবী। দু'টি প্রধান গোষ্ঠীর সংঘর্ষ সেনগুপ্ত এবং সুভাষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল এটা স্পষ্ট। একদিক দিয়ে তাঁদের এই সংঘর্ষ দেশের বিপ্লবীদের মধ্যেকার নবীন ও প্রবীণ বিপ্লবীদের ধ্যান-ধারণাগত সংঘর্ষ বলেও চিহ্নিত করা যায়।

ত্রিশের দশকের শেষের দিকে বাংলায় অনুশীলন সমিতির নেতৃত্ব স্থির করেন যে চূড়ান্ত দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের স্বার্থে কংগ্রেস ও গান্ধী নীতির সঙ্গে সাময়িকভাবে যোগসূত্র রক্ষা করা হবে যাতে ইতিমধ্যে অনুশীলন নিজের বিপ্লবী শক্তিকে সংহত করতে পারে অহিংস গান্ধী কংগ্রেসের আড়ালে থেকে। স্পষ্টত অনুশীলন নেতৃত্ব মনে করত যে গান্ধীজির ব্যর্থতা একসময় প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং সাময়িকভাবে গণভিত্তিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকাই সমীচিন। অনুশীলনপন্থীরা অবশ্য মনে করতেন যে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত চলে যাবে বিপ্লবীদের হাতে এবং আন্দোলনের সময় জনগণ আর অহিংস থাকবে না (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—পৃঃ ৩৮, ক্ষীরোদ দত্ত)। বলাই বাহুল্য যে অনুশীলনপন্থীরা গান্ধীজির মতবাদ কখনই গ্রহণ করেননি, গ্রহণ করেছিলেন তাঁর টেকনিক।

১৯৪০-এর সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ভারতব্যাপী সন্ত্রাস-বাদের পুনরাবির্ভাব ইংরাজ শাসকদের মতে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। এটা ঠিকই যুদ্ধের সুযোগে অনুশীলন সমিতি নাকি একটা সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছিল (পৃঃ—৩৬৯ 'বিপ্লবীর জীবন দর্শন'—প্রতুল গাঙ্গুলী)।

সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদ প্রার্থী হবার সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংযুক্ত বিপ্লবীরা তাঁর গৃহে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য মিলিত হন। এই সভায় স্থির হয় যে সুভাষচন্দ্রকে এই নির্বাচনে জয়ী করার প্রয়োজন ঘটেছে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের সঙ্গে ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীর গোপন আলাপে দেশকে বিকিয়ে দেওয়া বন্ধ করার জন্য। তখন সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় অনুশীলন বিপ্লবীরা সক্রিয় ছিলেন এবং প্রধানত তাদের অনুরোধে আচার্য নরেন্দ্রদেব সুভাষের প্রার্থীপদের সমর্থনে একটি আবেদন প্রচার করেন (পৃঃ ৪১৪, স্বাধীনতার সন্ধানে, যোগেশ চ্যাটার্জী)। অধিকন্তু বাংলার অনুশীলন কর্মীরা তাঁর পক্ষে সমর্থক প্রচারে শামিল হয়েছিলেন। এমনকি আশরফ উদ্দীন আমেদ চৌধুরী এবং ত্রৈলোক্য মহারাজ চট্টগ্রামে সুভাষের কর্মসূচীর সমর্থনে ব্যাপক প্রচার চালান। প্রকৃতপক্ষে অনুশীলন দলের প্রতাপ রক্ষিত, শ্রীপতি নন্দী, শ্যামাপদ বিশবাস প্রভৃতি তাঁর দলে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে অনুশীলন কর্মীরা আইন অমান্য করে সভাসমিতি করেছিলেন এমনকি কারাবরণ পর্যন্ত করেছিলেন। বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রকে প্রাক্তন অনুশীলন কর্মীবৃন্দ তথা বর্তমানে আর. এস. পি. অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস স্বৈরতন্ত্রী মনোভাব দেখালে অনুশীলন সমিতির সভ্যরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। সারা ভারতে আবার নূতন করে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য বি ভি ও অনুশীলন কর্মীরা সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারত পরিক্রমা করেছিলেন (পৃঃ ৪, মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র, ক্ষিরোদ দত্ত)। তবে ১৯৪০-এর পর আলিপুর জেলে বসে সুভাষচন্দ্র ও প্রতুল গাঙ্গুলী উভয়েই স্থির করেন যে বিপ্লবী কর্মীদের অধিকাংশই জেলে থাকার দরুণ ভারতের অভ্যন্তর থেকেই বিপ্লব করা তখন আর সম্ভবপর নয়। দুজনেই স্থির করেন যে একই পথে ওঁরা পরপর ভারত ত্যাগ করবেন এবং প্রতুল গাঙ্গুলী রাশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবেন। সুভাষচন্দ্রের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এর আগে বীর সাভারকার ও রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্বয়ং আকবর শাহ এবং ভাই পরমানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন; এমনকি কারাগারের মধ্য থেকে অনুশীলন কর্মীদের বিপ্লব সংগঠনের জন্য

প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিতে থাকেন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী 'অনুশীলন সমিতি সুভাষবাবুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন' (পৃঃ ২২৬, জেলে ত্রিশ বৎসর ও প্রাক্ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী)। আসলে সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে বুঝতে পেরেছিলেন যে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং ভারতের ভিতরে বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে প্রকৃষ্টরূপে ব্যবহার করা তথা বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সংহত করা সবিশেষ প্রয়োজন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বলেছিলেন যে নেতাজী ভারতের যুবকদের আদর্শ এবং তাঁর গতিশীল ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের টানে দেশের বিপ্লবীরা একত্রিত হবার জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলেন (১৯. ৭. ৭০ নেতাজী ভবনে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর বাণী)। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুভাষের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের ফলে দেশের তাবৎ বিপ্লবী শক্তি উজ্জীবিত বোধ করে। আরও বিশেষ এই কারণে যে "তরুণদের কাছে সুভাষের ভাবমূর্তি দেবপ্রতিম হইয়া উঠিয়াছিল" (পৃঃ ৪১৪, স্বাধীনতার সন্ধানে, যোগেশ চ্যাটার্জী)। সুভাষের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে অনুশীলন বিপ্লবীরা তাদের নেতাকে খুঁজে পেলেন। রাসবিহারী বসু ১৯৩৯-৪০ এর সময়ে নাকি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন যাতে ভারতের ভিতরে ও বাইরে একটা বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করা যায় (পৃঃ ৭, মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র ক্ষিরোদকুমার দত্ত)। এই প্রয়াসে অনুশীলন-খ্যাত স্বামী সত্যানন্দ রাসবিহারীকে প্রভূত সহায়তা করেন (অনুশীলন সমিতির ৭৫তম বার্ষিকীর স্মারক সংখ্যা পৃঃ ৬৯)। রামগড়ে অনুষ্ঠিত আপসবিরোধী সম্মেলন যে বহুলাংশে সফল হয় এবং দেশে স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলন সৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী হিসাবে অনুশীলন সমিতির অবদানও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এর কারণ অনুশীলন কর্মীরা ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষিত হয়েছেন এবং একটি সর্বভারতীয় বামপন্থী সাম্রাজ্য-বিরোধী মঞ্চ গঠন করতে চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং সমধর্মী বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির সহযোগে। (জীবন স্মৃতি, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী পৃঃ ৬৩)। অনুশীলনের ত্রিদিব চৌধুরী সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সরেজমিনে ঘুরে আসেন পার্বত্য উপজাতিদের সহায়তালাভ এবং সুভাষের নির্গমনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। দিল্লি কেল্লা থেকে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অনুশীলনের

সুনীল ভট্টাচার্য সক্রিয় হন একই সময়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে বাংলার বিপ্লবীরা প্রধানত অনুশীলন কর্মীরা কংগ্রেসকে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে চরম শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে বারংবার আহ্বান জানাচ্ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি সম্মেলনে এদের মুখপত্র রূপে কংগ্রেসের নায়ক সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশকে চরমপত্র দেবার দাবি ঘোষণা করলেন। এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং অবশেষে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের এই সংকটকালে এবং নতুন সংগ্রামী অভিযানে তাঁকে অকুণ্ঠ সহায়তা জানালেন সংঘ শক্তি সম্পন্ন এবং গণ আন্দোলনে বিশ্বাসী অনুশীলন দল। যুগান্তর দল কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কার্যক্রমকে অবাস্তব, অসময়োচিত এবং জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বলে মনে করেন। সুভাষচন্দ্রের সে সময়কার কর্মনীতিতে যারা অবিচল আস্থা দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানত অনুশীলনের ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী এবং প্রতুল গাঙ্গুলী ছিলেন অগ্রগণ্য।

একালের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমকে আন্তরিক স্বীকৃতি জানিয়েও তাঁকে 'Political adventurist' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর শ্লেষাত্মক ভাষায় "His deep associatian with the Anusilan group of revolutionaries made him anti-British to such an extent that he made little or no idelogical distinction between Imperialism and Fascism" (Indian Middle Class, B. B. Misra p. 479)। আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপনের কিছুকাল পরে সুভাষচন্দ্র ভারতের বিপ্লবী বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ডঃ পবিত্র রায়, অমৃত সিং, মহেন্দ্র সিং ও তুহিন মুখার্জিকে ভারতে পাঠান। এর মধ্যে পবিত্র রায় ছিলেন ঢাকা অনুশীলনের অনুরাগী এবং মালয়ে দীর্ঘসময় তিনি অতিবাহিত করেন। নেতাজির নির্দেশ মত তিনি প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন। এমন কি মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা পেয়েও আলিপুর জেলে প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম গোপনে যে পত্র লেখেন তার অনুলিপি ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর 'জেলে তিরিশ বৎসর' গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। ভারতের

মুক্তি অভিযানে পরিচিত বিপ্লবী সুহৃদদের সক্রিয় সাহায্য থেকে যে নেতাজী কখনও বঞ্চিত হননি, তা পবিত্র রায় তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করার কাজে একদা অনুশীলন কর্মী স্বামী সত্যানন্দ পুরীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথাও তাঁর চিঠিতে আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যথার্থ বিপ্লবীর সন্ধানী দৃষ্টি থাকায় কলকাতায় অনুশীলন বিপ্লবী রবি সেনের কাছে যে পত্রবাহক কাশীর বীরেন ভট্টাচার্যের চিঠি নিয়ে আসেন, তাঁর সম্বন্ধে সুভাষ রবিবাবুকে যথা সময়ে সতর্ক করে দেন। প্রসঙ্গত এই রবি সেন ১৯৪০ সালের প্রথম ভাগে আলিপুরের শিখ সৈন্যদের মধ্যে সারা ভারতে সেনা বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য সুভাষবাবুর সঙ্গে সৈন্যদলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির যোগাযোগ করিয়ে দেন। কিন্তু সরকার অচিরেই এটি জেনে ফেলে এবং এই ধূমায়িত বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমিত হয়। জেলে অনশনের আগে অর্থাৎ ১৯৪০-এর জুলাই-এর আগে সুভাষচন্দ্র তাঁর বিদেশে যাবার ব্যাপারে আভাষ দেন প্রতুল গাঙ্গুলীকে। রবি সেনকেও তিনি কলকাতার জাপানি কনসাল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ জানান।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করলে অনুশীলন সমিতির যে সব সভ্য, মালয় ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে আগে থাকতেই ছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বয়ং-নিযুক্ত হন। স্বামী সত্যানন্দ, প্রীতম সিং প্রভৃতি অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবং এঁরা আগে থাকতেই নেতাজীর ক্ষেত্র অনেকটা প্রস্তুত করে রাখেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের মাধ্যমে। রাসবিহারী বসু এই প্রাক্তন অনুশীলন পন্থীদের প্রধান ছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন। নেতাজী নিজেও ডক্টর পবিত্র রায় প্রমুখ অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন সদস্যদের গোপনে ভারতবর্ষে পাঠান এখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করার জন্য। অনুশীলন বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জি বলেছেন যে আজাদী বাহিনী যে মুহূর্তে ভারতে প্রবেশ করবে; সেই মুহূর্তেই আমরা ভারতের ভিতরে বিপ্লব ঘটিয়ে দেব (In search of freedom pg. 557)। নেতাজীর গোপন দূত হিসাবে প্রফুল্ল দত্ত, পবিত্র রায় প্রমুখ বিপ্লবী নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন (অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস, ব্রজেন্দ্রনাথ দাস পৃঃ, ৪০)। প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির সুদীপ খাস্তগীর ও সুধাংশু কাঞ্জিলাল নেতাজীর দেহরক্ষীর কাজও করেন। (পৃঃ ১১৮ চট্টগ্রাম ঃ বিপ্লবের বহ্নিশিখা, শচীন্দ্রমোহন দত্ত সম্পাদিত)।

সরকারি নথিপত্রে সুভাষচন্দ্র

অমিয়কুমার সামন্ত

রাজনৈতিক জীবনের প্রায় শুরু থেকেই ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। তিনি গান্ধীজির অহিংস পদ্ধতিতে আস্থাশীল ছিলেন বলে দাবি করতেন না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বিভিন্নভাবে। তাছাড়া 'বলশেভিকদের' সঙ্গে যোগাযোগের কিছু ঘটনাও সরকারের জানা ছিল। সুতরাং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সরকারের যে ধারণা গড়ে উঠেছিল তার সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য না থাকলেও এই ধারণার পরিবর্তন কখনও হয়নি। ফলে সুভাষচন্দ্রকে সরকারের হাতে অন্যান্য জাতীয় নেতাদের তুলনায় অনেক বেশি নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের প্রথম কারাবরণ ১৯২১-২২ সালে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়, ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের প্রতিবাদে কংগ্রেস 'হরতালের' ডাক দেয়। কলকাতা তথা বাংলাতে সেই হরতাল সংগঠনে সুভাষচন্দ্রের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। ফলে চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্রকে ১০ই ডিসেম্বর (১৯২১) গ্রেপ্তার করে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সুভাষচন্দ্র মুক্তি পান ১৯২২ সালের ৪ঠা আগস্ট। মুক্তি পাওয়ার দু'দিনের মধ্যে তিনি নিখিল বঙ্গ যুব সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা, নেতৃত্বদানের স্বাভাবিক প্রবণতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদির সম্যক পরিচয় পাওয়া গেল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই, যখন উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় প্রলয়ংকর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে ত্রাণের ও উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন। এ ব্যাপারে সরকার কোনও সাহায্য করেনি। নিজের উদ্যোগ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ও দেশপ্রেমী মানুষের আর্থিক সাহায্যে তিনি এই উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে সফল হয়েছিলেন। এই বিষয়টি সরকারের নজর এড়িয়ে যায়নি। পুলিন দাসের ঢাকা অনুশীলন সমিতিও অনুরূপ স্বেচ্ছাসেবায় অগ্রণী ছিল; কিন্তু ১৯০৮ সালের পর তাদের গোপন কার্যকলাপ সরকারের নজরে আসে। ততদিনে তাদের প্রভাব বেশ বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। বাংলার দেশপ্রেমী যুবকদের নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রও সরকারের নিকট চিহ্নিত হয়ে গেলেন।

১৯১৭ সালের পর বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু এইরূপ আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য রাউলাট কমিটির সুপারিশ ক্রমে The Revolutionary and Anarchical Crimes Act 1919 বা রাউলাট আইন লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে পাশ হওয়ার পরে গণ-বিক্ষোভের আশঙ্কায় প্রয়োগ করা হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই Defence of India Act এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের শুরু থেকে Regulation III of 1818 ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু The Revolutionary and Anarchical Crimes Act, 1919, প্রয়োগ করা গেল না বলে শাসক মহলে হতাশা ছিল গভীর। কারণ তাদের ধারণায়, "It is impossible to secure a fair trial by the Procedure of the Evidence Act and the Criminal Procedure code, which is appropriate only to normal conditions of crime. The Procedure to deal with rovolutionary crime has to be practicable in the sense of living appropriate to its special conditions, so as to secure as fair a trial as is feasible under an exceptional situation."'

১৯২১-২২ সালের গণ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়াতে অহিংস আন্দোলনের সংগঠনকারীদের মনোবল বেশ ভেঙে গিয়েছিল; এবং সরকারও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দমন-পীড়ন শুরু করেছিল। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের (১৯২১) ফলে Indian Press Act এবং আরও কয়েকটি পীড়নমূলক আইন রদ করা হল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উপর এই সমস্ত ঘটনার প্রভাব সম্পর্কে বাংলাদেশের ইণ্টেলিজেন্স বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার লিখছেন, "The terrorists now freed from restraints, were content to watch developments while utilising every opportunity (such as the volunteer movement) of drawing their followers together and extending their influence. Endeavours were made to organise Ashrams on lines similar to those which played so important a part in former movements. The leading members of the two main organisations (i. e. Anushilan and Jugantar) were active in every form of

propaganda, particularly amongst the student class. Every cause of unrest was exploited and every centre of agitation utilised for dissemination of terrorism and capture of new recruits. Many of their leaders obtained responsible positions in district Congress Committees and used their positions to consolidate their followers. The penetration of the Congress machine had very important consequences, for it helped them internally in the matter of recriutment and organisation, and externally in the matter of public sympathy."[২]

এই সময়ে (মার্চ, ১৯২২) Indian Press Act উঠে যাওয়ার পরে, ইন্টেলিজেন্স বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে "mushroom Vernacular journals like Atmashakti, Sarathi, Muktikam, Bijali and others began to publish articles having a direct or indirect tendency to incite violent hostility against government and the British. The commonest type of propaganda was to denounce the economic oppression of the British in India, to extol in mystical, sometime in poetic language, freedom and self-sacrifice, and to publish appreciative articles in praise of the revolutionaries."[৩] এইরূপ কয়েকটি কাগজের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে 'আত্মশক্তি'র অনেকগুলি রচনার লেখক সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হেমন্ত-কুমার সরকার। স্বাভাবিকভাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এইরূপ প্রচারের সম্পর্ক কল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল।

এই সময় আরও একটি বিষয়ে সরকার সন্ত্রস্ত বোধ করছিল—সেটি হল কংগ্রেস ও স্বরাজ পার্টির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগ এবং কংগ্রেস দলে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশের জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিতেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাধান্য ছিল বলে একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য গোয়েন্দা দপ্তর বা সরকারের নিকট কিছুই ছিল না। ১৯৩১ সালে লণ্ডনে Royal Empire Society-তে এক বক্তৃতায় Charles

Tegart বলেছিলেন, "In 1930, When the third phase of the terrorist movement was launched, there were few districts in the province where terrorists were not represented on the local Congress Commitees."[১৪] এই সম্পর্কে ১৯২৫ সালের একটি ইণ্টেলিজেন্স রিপোর্টের অংশবিশেষ এইরূপ: From secret reports of a meeting of the Bengal Provincial Congress Committee at the Albert Hall, Calcutta, on the 5th November, 1924, it was plain that the revolutionaries strongly resented Mr. C. R. Das's action stating to a press representative that a strong revolutionary Party existed. This resentment was obviously due to the conviction that Mr. Das's submission to the press had strengthened the Government's case for the promulgation of the Ordinance. When Mr. Das attempted to justify his action at the meeting, the revolutionaries literally shouted him down. They were anxious to take control of the congress machine and to get possession of the congress funds controlled by the Swarajya Party in Order to utilise them in the interest at the revolutionary organisation. The breach was however, temporary, as a few days later representatives of the revolutionaries including Suresh Das, Jiten Lahiri, Jnanendra Mazumdar, Sudhendu Mazumdar, Atul Sen and others saw Mr. Das and arrived at an agreement on the following terms :

(i) The revolutionaries would follow Mr. Das in the Congress work and policy.

(ii) No violence should be committed directly under the garb of the Congress and any person wishing to resort to violence must first severe his connection with the Congress.

(iii) To deceive the Police all Congress members should give an undertaking that they neither believe in nor countenance violence.

(iv) That a copy of this undertaking should remain with Mr. Das and another should be kept in the office of the Bengal Provincial Congress Committee. According to the list of office bearers of the Congress Committce published in the Servant of the 28th November, 1924, 28 members out of 69 were either ex-detenues or ex-political convicts. Again out of 25 non-Muslim members selected from Bengal for the All India Congress Committee 21 were either revolutionaries or sympathisers, while of 18 Mohammedan members, 4 were either members of the revolutionary Parties or sympathisers."[৫]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে একটি বিষয় ইতিহাসের গবেষকদের নিকট পরিষ্কার হবে যে সব তথ্যের ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ ও অবস্থার মূল্যায়ন করা হয়েছে সেই তথ্যগুলি অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। এটি স্বাভাবিক ; কারণ কোনও রাজনৈতিক ইণ্টেলিজেন্স সংস্থার পক্ষেই সমস্ত খবরাখবর তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, একটি পূর্বনির্ধারিত সন্দেহ ও আশঙ্কাকে বেশি গুরুত্ব ও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এই সন্দেহ ও আশঙ্কার বাতাবরণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেও করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ সালের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই আশঙ্কাকে তুলে ধরা হয়েছিল। তা না হলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা কংগ্রেসের সংগঠনে অনুপ্রবেশ করেছিল কংগ্রেসের টাকাকড়ি নিয়ে বিপ্লবী কাজ-কর্ম সংগঠিত করার জন্য—এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় না। এইরূপ অবাস্তব ধারণার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রচলিত আইন যথেষ্ট নয়, সেই অজুহাতে সন্ত্রাসবাদী ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ দমনের জন্য কঠোর আইনের সমর্থনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে Ordinance I জারী করা হয়। বস্তুতপক্ষে Defence of India Act এর পরিবর্তেই এটি জারী

করা হয়, কারণ রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে Defence of India Act ব্যবহৃত হয়েছিল বলে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির প্রতিবাদের জন্য ঐ আইন প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এইরূপ চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত আমলা ও ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের সহজতম লক্ষ্য। তাঁর তারুণ্য, তাঁর উচ্ছ্বাসময় এবং কিঞ্চিত আগ্রাসী স্বদেশপ্রেম তাঁকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী তরুণদের মানসিকতার খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল এবং একথা অনস্বীকার্য যে তাঁদের সঙ্গে অল্পবিস্তর যোগসূত্রও স্থাপিত হয়েছিল। গান্ধীজির মত ও পথের তিনি সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন না ; কিন্তু তাঁর নির্দেশিত পথই মেনে নিয়েছিলেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরার ঘটনার পর যখন অহিংস পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে বলে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে ব্রিটিশ সরকারকে এক কঠিন সমস্যা থেকে মুক্ত করলেন, তখন অন্য অনেকের মতো সুভাষচন্দ্রের গভীর ক্ষোভ অপ্রকাশিত থাকেনি। ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে গোপীনাথ সাহা নামে এক যুবক প্রায় একই রকম দেখতে আর্নেস্ট ডে নামক ইংরেজকে ভুলক্রমে হত্যা করে। ১৯২৩ সালের প্রথম দিক থেকেই অবশ্য কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ডে-এর হত্যার পর সরকারি মহলে প্রবল হৈ-চৈ শুরু হয়। এই ব্যাপারে চার্লস টেগার্টের একটি ভূমিকা ছিল ; তাই টেগার্ট সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের কথা বলতে গেলেই টেগার্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

চার্লস অগাস্টাস টেগার্ট (১৮৮১—১৯৪৬) ১৯০১ সালে ইন্ডিয়ান পুলিশের (IP) সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে চাকুরিতে যোগ দেন। কয়েকবছর বিভিন্ন পদে কাজ করার পর ১৯১১ সালে কলকাতায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রথম ডেপুটি কমিশনার হন। ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডি. আই. জি. পদে কাজ করেন। এই সময় তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন দমনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং নিরলস কর্মক্ষমতার জন্য তিনি এই কাজে সাফল্য অর্জন করে সরকারের অতীব আস্থাভাজন হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি কিছুদিন ফ্রান্সে, পরে ইংল্যান্ডেই বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন। ১৯২৩ সালের প্রথমদিকে তিনি ভারতে ফিরলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার নিযুক্ত হন এবং

অনতিবিলম্বেই বিপ্লবীদের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। অন্তত তিনবার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ১৯৩১ সালে তিনি অবসর নিয়ে লণ্ডনে Secretary of States' Council-এর সদস্য হন। ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ডে এক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।[৬]

টেগার্ট বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক ঘটনার উপর বিস্তৃত নোট ও রিপোর্ট রেখে গেছেন।[৭] সেগুলির ঐতিহাসিক উপাদান যথেষ্ট, যদিও সব রিপোর্ট সর্বাংশে সঠিক বলে মেনে নেওয়া নিরাপদ হবে না। টেগার্ট শুধু সরকারের আস্থাভাজনই ছিলেন না, তিনি ভারতে ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে একটি অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাউলাট কমিটির সদস্য না হয়েও রাউলাট কমিটির সিদ্ধান্ত-গুলির উপর টেগার্টের অবিসংবাদিত প্রভাব ছিল; তেমনি সরকারি নীতি নির্ধারণেও টেগার্টের অবদান ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে Secretary of States' Council-এর সদস্য হিসেবে তিনি বিপ্লবীদের বিষয়টি নিয়েই পরামর্শ দিতেন।

আর্নেস্ট ডে-এর হত্যার জন্য গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হওয়ার পর বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গোপীনাথের দেশভক্তির প্রশংসা করে কিন্তু তাকে বিপথগামী বলে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধীজি এতে অসন্তুষ্ট হয়ে চিত্তরঞ্জন দাশকে এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানিয়েছিলেন। সুভষচন্দ্র তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টিতে বিপ্লবীদের প্রভাব বেশি; সুতরাং সুভাষচন্দ্রেরও প্রভাব বেশি। তাই সুভাষচন্দ্রের এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের ইচ্ছাক্রমেই ঐ প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল—এই ধারণা কেবল তৎকালীন জনশ্রুতি ছিল না। আমলা এবং ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাসের সমর্থনে রিপোর্টও তৈরি হয়েছে। সুভাষচন্দ্র টেগার্টকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, তিনি স্বরাজ্য পার্টির কাউন্সিলে যোগদানকে আদৌ গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁকে সমর্থন করে বিপ্লবীরাও এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাই সুভাষচন্দ্র বোমা দিয়ে কাউন্সিল চেম্বার উড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করবেন—এ সম্ভাবনাকে আমলা ও ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা তাদের রিপোর্টে তথ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। মিহির বসু বাংলা সরকারের ভারত সরকারের নিকট পাঠানো একটি রিপোর্টের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন।[৮] তাতে সুভাষচন্দ্রকে টেগার্ট হত্যার ষড়যন্ত্র ও কাউন্সিল চেম্বার উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা—এই দুইটির জন্য দায়ী করা হয়েছিল। ভারত

সরকারের ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরোর এক অফিসার H. W. Hale সরকারী নথিপত্র ভিত্তি করে, সন্ত্রাসবাদের উপর একটি বই প্রকাশ করেছিলেন।[৯] বইটি সরকারী কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যই লেখা হ'য়েছিল। Hale এর বইতে Council Chamber উড়িয়ে দেওয়ার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি বটে; কিন্তু টেগার্ট হত্যার ষড়যন্ত্র বিষয়ে লেখা হয়েছে, "Several of the important leaders including Subhas Chandra Bose, the Chief Executive officer of the Corporation, who was believed to have been behind the plot to assassinate Sir Charles Tegart, and who had given employment to a large number of Jugantar revolutionaries and ex-detenus under the Calcutta Corporation, were incarcerated under Regulation III of 1818.[১০]

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বাংলার প্রাদেশিক ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে সুভাষচন্দ্রের যুগান্তর দল ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী ও বলশেভিকদের যোগাযোগ সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই দুটি পরিকল্পনায় বা ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে কোনও কথারই উল্লেখ নেই। তাই সন্দেহ হয় যে এই কল্পিত ষড়যন্ত্রের কাহিনী টেগার্ট এবং তার সহযোগী উচ্চতর আমলা মহলেই বানানো হয়েছিল। টেগার্টের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা স্মরণ রাখলে এই সম্ভাবনা স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য বলেই মনে হয়। তাছাড়া এই রূপ ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনা যদি পুলিশ বা ইণ্টেলিজেন্সের নিচুতলা থেকে রিপোর্ট করা হত তবে সরকার থেকে চাপ আসত যে যথাযথ মামলা করে ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার করে বিচার করা হোক, কিন্তু সে রকম কিছু হয়নি বা তৎসংক্রান্ত নথিপত্রও নেই। টেগার্ট কলকাতার কমিশনার হিসাবে সোজাসুজি সরকারে মৌখিক বা লিখিত রিপোর্ট করেছেন বলে ইণ্টেলিজেন্স বিভাগে বা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চেও এ সম্পর্কে কোনও নথি পাওয়া যায়নি। অফিসারদের হত্যার চক্রান্ত সম্পর্কে বাংলার ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একটি রিপোর্ট এই রূপঃ "Information has been received constantly during the period of plots and talk of plots to carry out assassination of officials, whose removal the revolutionaries considered necessary. But there has been far more talk than actual plotting, and in the main the intention to put

into action such plots as have come to notice, has been apparently a half-hearted kind. Still the reports show that the idea and the desire to take these reprisals remain undiminished. It is confidence and power of organisation that are lacking. Another powerful restraining factor is the certainty that any such provocative overt act would entail further drastic action against the revolutionary organisations—actions which in their present condition would be, they feel, fatal to their continued existence."[১১] ১৯২৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই রিপোর্টে। ষড়যন্ত্রে সুভাষচন্দ্রের অংশগ্রহণের উল্লেখ নেই। প্রসঙ্গত বলা যায় সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের এই বিশ্লেষণ বাস্তব-সম্মত ও তথ্যভিত্তিক।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সরকারের আর একটি অভিযোগ ছিল যে তিনি ১৯২৪ সালের প্রথমদিকে কর্পোরেশনের Chief Executive Officer হওয়ার পর স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা নির্যাতীত হয়েছিলেন তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের উপযুক্ত ব্যক্তিকে চাকুরি দিয়েছিলেন। সরকার এ-সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করে এটিকে সরকার বিরোধী কাজ এবং সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহদান বলে অভিহিত করেছে। টেগার্ট এ সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করেছেন। সুভাষচন্দ্র এই অভিযোগ অস্বীকার করেননি।

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর ভোররাতে সুভাষচন্দ্রকে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই-দিনেই মোট ৮৯ জনের একটি তালিকা নিয়ে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে ৮২ জনকে পাওয়া যায়, বাকি ৭ জনকে পাওয়া যায়নি। ৮৯ জনের মধ্যে ৬৯ জন ছিল ১৯২৪ সালের ১নং অর্ডিন্যান্সের এবং ২০ জন রেগুলেশন তিন-এর আসামী। সুভাষচন্দ্র রেগুলেশন তিন-এ ধৃত, তাঁকে কোনও দিন কোনও আদালতে হাজির করা হয়নি; তাঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তাও জানানো হয়নি। অর্ডিন্যান্সের আসামীদেরও কোনও আদালতে হাজির করা হয়নি। এ সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের রিপোর্ট এই রকম:

Simultaneonsly with these arrests and searches, searches were conducted under the Indian penal code at numerous

other places in Bengal, where it was believed that incriminating articles connected with the revolutionary propaganda would be found. Althuogh the raid yielded nothing in the way of arms, ammunition and explosives, yet a scrutiny of the results reveals the facts that out of a total of 104 houses, revolutionary literature of different kinds was found in 33.[১২]

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের বিনাবিচারে বন্দী করার বিরুদ্ধে এবং ১নং অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সারা দেশ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল, অনেক জায়গায় প্রতিবাদ মিটিং এবং ১লা নভেম্বর, ১৯২৪ হরতাল হল। সমস্ত মিটিংয়েই without exception the speakers condemned the action of the Government as repressive and proclaimed that the real object of the Government was to stifle and repress legitimate political agitation."[১৩]

সরকারের আমলা, পুলিশ ও ইনটেলিজেন্স বিভাগ আশা করেছিল যে এই গ্রেপ্তার ও সার্চের ফলে তারা কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। তাদের এই ধারণার ভিত্তি ছিল প্রধানত দুটি ঘটনা। ১৯২৪ সালের ১৫ই মার্চ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতার মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র Chief Executive Officer হওয়ার কিছুদিন পরেই) মানিকতলার একটি বাড়িতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সার্চ করে এবং ছটি তাজা বোমা সহ কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার করে। ২২শে আগস্ট মির্জাপুর স্ট্রিটের একটি দোকানের উপর পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে বোমা নিয়ে আক্রমণ করা হয়।[১৪] এই ঘটনাগুলিকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ বিরাট প্রস্তুতির সূত্র হিসাবে মনে করে জোর অনুসন্ধান ও খবর সংগ্রহ শুরু করে। মির্জাপুরে বোমা ছোড়ার অপরাধে শান্তি চক্রবর্তী ও বসন্ত ঢেঁকি নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রধানত শান্তি চক্রববর্তী পুলিশের নিকট শুধু সহযোগীদের নামই করেনি; কাল্পনিক গল্প তৈরি করে পুলিশ ও ইনটেলিজেন্সের অফিসারদের সন্দেহকে সমর্থন করে। শান্তি চক্রবর্তী বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের নাম জড়িয়ে তাঁর কাহিনী তৈরি করেছিল। যেহেতু শান্তি স্বীকারোক্তি করেছিল তাই পুলিশ তাকে কেস থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু ৩রা অক্টোবর শান্তি চক্রবর্তী গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়।[১৫] এর পর সরকার ও ইনটেলিজেন্স সহজেই শান্তির দেওয়া সমস্ত খবরই সত্য বলে বিশ্বাস করে।

যখন সার্চের পর কোনও অস্ত্র বা বিস্ফোরক পাওয়া গেল না তখনও কিন্তু ইনটেলিজেন্স তাদের খবরের অসারতা স্বীকার না করে নিজেদের ধারণার সমর্থনে যুক্তি খাড়া করতে তৎপর হল।

"Much stress has been laid by interested parties on the absence of arms, ammunitions and the explosives from the fruit of the raid and it has been sought to gull the public into the belief that this failure to make striking discoveries of arms, ammunitions and explosives, at least with some of the persons arrested is complete proof of the utter falsity of the Government's alleged grounds for the action taken against them. On the other hand it must be emphasised that the authorities did not expect to make such sensational finds, nor were such finds the objectives in view. The objective was to place under restraints certain persons known to be actively dangerous."[১৬]

এই ব্যাখ্যা দুর্বল ও পরস্পরবিরোধী। যদি কর্তৃপক্ষ কোনও কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করে থাকেন, তবে ১০৪টি বাড়ি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলেন কেন? আর actively dangerous লোক কারা? তাঁদের নিকট বোমা-পিস্তল পাওয়া গেলে তবেই তো তাঁরা নিঃসন্দেহে বিপ্লববাদী এবং 'সক্রিয়ভাবে বিপজ্জনক'। অন্যথায় তাঁরা অন্তত তৎক্ষণাৎ ও সক্রিয়ভাবে বিপজ্জনক নয়। রিপোর্টে অতঃপর বলা হচ্ছে :—The immediate object of the raid was undoubtedly fulfilled; the revolutionary organisations and campaigns were for the time being thoroughly dislocated and disorganised. While the secret organisations were attempting to reorganise and recover from the effects of the blow, all Indian political parties, organisations and news papers began a systematic and organised campaign of villifi-tion and disapproval against the new weapon which the Government had brought into use.[১৭]

এই দুর্বল যুক্তিগুলিকে সরকার অবশ্যই গ্রহণ করেছিল; কারণ সরকার

তরফ থেকে কোনও প্রশ্নই তোলা হয়নি। শুধু তাই নয়, এরপরেও বন্দীদের সম্পর্কে কোনও সুবিচার করা হয়নি। সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত হন। ১৯২৮ সালের ২৮শে মে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ মিথ্যা সন্দেহে ৩½ বছরের বেশি কারাবাস করেন। আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করতে না পারলেও পরবর্তীকালে আরও কয়েক-জনের জবানবন্দীতে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মজুদ করা হয়েছে বলে বলা হ'য়েছে। যারা এই ধরনের জবানবন্দী দিয়েছিলেন তারা হলেন (১) অনন্ত সিংহ, (২) নলিনী গুপ্ত। এ ছাড়া আর একজনের আটক করা চিঠিপত্রের মধ্য থেকেও কিছু সন্দেহজনক তথ্য পাওয়া যায়; তিনি হলেন অবনী মুখার্জি। মস্কো থেকে কলকাতায় লেখা তাঁর কিছু চিঠিপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ইণ্টিলেজেন্স ব্যুরো আটক করেছিল।

এই জবানবন্দীগুলি ও অবনী মুখার্জির চিঠিপত্র ১৯২৫ সালে পাওয়া গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে, এগুলিকে ১৯২৪ সালের ১ নম্বর অর্ডিন্যান্সের এবং এই অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতা বলে রাজনৈতিক নেতাদের বিনা বিচারে আটক রাখার সাফাই হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই নথিগুলিতে দু'একটি জায়গায় সুভাষচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখ থাকলেও তাঁর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী বা বলশেভিকদের যোগাযোগের কিংবা রাজনৈতিক আদান-প্রদানের কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। তাছাড়া জবানবন্দীগুলিও অতিরঞ্জিত এবং ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ।

অনন্ত সিং-এর (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০) খ্যাত) জবানবন্দীর কথাই ধরা যাক্। অনন্ত সিং চট্টগ্রামের একটি স্বদেশী ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের সেসন জজ তাঁকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন ও তিনি মুক্তি পান। কিন্তু ২৫শে অক্টোবর তাঁকে ১৯২৪ সালের ১ নম্বর অর্ডিন্যান্স বলে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্ধমান জেলে বিনা বিচারে বন্দী থাকার সময় ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে দু'দফায় দীর্ঘ স্বাক্ষরিত জবানবন্দী দেন। জবানবন্দীতে তিনি অনেকের কথা বলেছেন কিন্তু সুভাষ বসুর সঙ্গে পরিচিতি বা যোগাযোগের কোনও উল্লেখ নেই। বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তিনি যে সংবাদ দিয়েছিলেন তা উদ্ধৃতির প্রয়োজন। অনন্ত সিং বলছেন ঃ

"I give you certain informations about collection of arms. I found one machine gun which was a new one, in

the barrack where Jasoda was arrested. Jhuluda (Nagendra Nath Sen) showed the weapon to me. I cannot say how this was procured. I believe it was procured from foreign country. I found one dynamite there. I personally saw abont 100 revolvers and pistols of different patterns, such as Colt, automatic of varions Kinds, Mauser 450, six chambered Weblay. 320 revolvers etc. My information is that there are about 500 pistols and revolvers etc. I heard from Jhuluda that there were two more machine guns, besides the one I had seen. The five persons whom I described above by their nicknames were also armed with two weapons. I heard from these persons that 10,000 bomb-shells were prepared. I personally fitted strikers to more than 520 bombs at Calcutta and Chittagong."[১৮]

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হাতে তিনটি মেশিনগান, ৫০০টি রিভলবার / পিস্তল এবং ১০,০০০ বোমা! ১৯২৪ সালে এরকম গোপন অস্ত্রাগার সম্ভব ছিল না। আর যদি সম্ভব হত, তবে এই আন্দোলন দমন করতে সৈন্য বাহিনীর সাহায্য লাগত। এই জবানবন্দী পাওয়ার পর ইনটেলিজেন্সের পদস্থ অফিসারদের বোধহয় সন্দেহ দেখা দিয়েছিল বিশেষত মেশিনগানের সম্পর্কে। তাই অনন্ত সিংকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলা হল। ২০ দিন পরে আর এক জবানবন্দীতে অনন্ত সিং বললেন ঃ—"The machine gun which I saw in the ward Institute was, as I already told you, in a packing case. I cannot give full description of it, nor can I draw a diagram, as I had not seen it out of the packing case. There was a stand, probably triangular, and it was told to me either by Jasoda or by Jhuluda that it can be fixed to any dirction. It appcared to me there was one barrel within a bigger one. There is I think a tape contaning cartridges. There is also a wheel. Cartridges appeared to be little bigger than 10" short magazine rifles. The inner

barrel could be cooled by pouring water in the outer barrel."[১৯]

প্যাকিং কেসে আছে বলে যে বস্তুটি তিনি চোখে দেখেননি তার inner barrel এবং outer barrel সম্পর্কে বেশ নিখুঁত বর্ণনা দিলেন এবং কার্তুজের বেল্টটিকেও উল্লেখ করতে ভুললেন না। এই বক্তব্য, অস্ত্র ও বিস্ফোরক সম্পর্কে তথ্য মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ এই অস্ত্রগুলি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি এবং পুলিশের পক্ষেও এর এক ভগ্নাংশমাত্রও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অনন্ত সিং এই মিথ্যা বিবরণ দিলেন কেন? পুলিশ ও ইনটেলিজেন্সের অফিসাররা জোর করে লিখিয়ে নিয়েছিলেন? আরও অনেক বিপ্লবী বন্দী তখন বিভিন্ন জেলে ছিলেন। স্বাভাবিক কারণে তাঁদের বেশির ভাগই প্ররোচনায় বা প্রলোভনে এইরূপ অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা কথা লিখে দেবেন না। অনন্ত সিং স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করেছিলেন সম্ভবত নিজের প্রয়োজনে। তাই তাঁর জবানবন্দীতে এই ভুল তথ্য সংযোজন করা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বলশেভিক ভীতি সুবিদিত। ভারতবর্ষে বলশেভিক চক্রান্ত কী রূপ নেবে এ সম্পর্কে খুব নির্দিষ্ট ধারণা না থাকলেও, তারা যে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়ে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করবে একথা বৃটিশ প্রশাসন বিশ্বাস করতেন। ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্যুরো রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকে ভারতে বলশেভিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিল। লণ্ডন থেকেও মাঝে মাঝেই ভারতীয় প্রশাসনকে বলশেভিক বিপদ সম্পর্কে সজাগ করে দিত। এইরূপ একটি গোপনীয় নোটে বলা হয়েছিল;

"Realistically viewed, communism is an international criminal conspiracy and it is as such, rather than as a political movement that the security authority of every country must treat it. Moreover, it is a conspiracy in regard to which Great Britain, with its euormons responsibilities both as a key point of stability in a sadly shaken Europe and the guardian of the destinies of many races and many millions of souls, would seem to have a special duty."[২০]

এই আন্তর্জাতিক চক্রান্তকে প্রতিরোধ করার জন্য বৃটেনের এবং ভারতের আইন বড়ই দুর্বল ; সুতরাং, "In the absence of legal instruments by which the movement can be effectively sterilised, the alternative would seem to be the exercise of ceaseless vigilance over its every branch and phase."[২১]

ইনটেলিজেন্স বিভাগ তাই এই বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর হয়েছিল ; এবং সেই তৎপরতার প্রথম প্রমাণ ১৯২৪ সালে 'কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা'। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য বলশেভিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ নলিনীভূষণ গুপ্ত, মহম্মদ শওকত্ ওসমানি, মুজঃফর আহমেদ ও শ্রীপাদ অমৃত ডঙ্গেকে অভিযুক্ত করা হয়। নলিনী গুপ্ত ছিলেন একজন রাজনৈতিক অ্যাডভেঞ্চারার। তিনি কোনও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে বা অন্য কোনও রাজনৈতিক সংস্থায় যুক্ত ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে হীনবল করার উদ্দেশ্যে ভারতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলগুলিকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করতে প্রস্তুত এইরূপ একটি ধারণা বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এই ধারণা খুব ভুল ছিল না। তাই, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জার্মান দূতাবাসগুলির মাধ্যমে জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে অর্থ অস্ত্র লাভের জন্য বেশ কয়েকটি বিপ্লবী সংস্থা চেষ্টা চালিয়ে ছিল। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছেন। নলিনী গুপ্ত, অবনী মুখার্জি প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁরা কোনও বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বার্লিনে থাকার সময় তিনি ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য অর্থ সাহায্যের চেষ্টা করেছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়াও বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলনগুলিকে সাহায্য করতে পারে এই আশায় তিনি মস্কোতে এসে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এইখানেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। রায়ের নির্দেশে তিনি ১৯২১ সালে এবং ১৯২৩-২৪ সালে ভারতে আসেন বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। ১৯২৪ কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। আদালত থেকে তাঁকে ও তাঁর তিন সহযোগীকে ৪ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

নলিনী গুপ্ত ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বন্দী অবস্থাতেই পুলিশের নিকট এক দীর্ঘ জবানবন্দী দেন। সেই জবানবন্দীতে তিনি বলছেন, "I saw Prafulla Ghosh non-co-operator and also Subhas

Basu at his house at Elgin Street. I first saw Dilip Roy at his maternal uncle's place at Theatre *R*oad. I enquired after him at Pratap Mazumdar's house at Cornwallis street. Dilip tolp me that I made a mistake in coming at that time and that I would be arrested. I communicated my mission to Subhas Basu and Profulla Ghosh and offered to help the Congress Party, but they refused my assistance and said that the mass-movement was not suited to this country. Subhas Basu probably did believe me at first, as during my visit to India in 1921, I circulated that Narendra Nath Bhattacharjee alias M. N. Roy was not an honest man and that he was misappropriating money he was receiving from the Russian Government. Subhas Basu asked me to come next day. I went to him accordingly and found Upendra Nath Banerjee was sitting there. Upen Banerjee asked me about Abani Mukherjee. I did not say anything bad about Abani to him. Upen told me that he could not help him as he was busy with the Special Congress. Upen Babu asked me to see him after about a fortnight or so. Subhas Basu was present when I talked to Upendra Banerjee."[২২]

নলিনী গুপ্তের বক্তব্যের এই অংশটি পরে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করেছেন। নলিনীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই সাক্ষাৎটুকুই একমাত্র যোগাযোগ। প্রসঙ্গত মুজঃফর আহমেদ একবার সুভাষচন্দ্রকে লেখা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি চিঠি নিয়ে তাঁকে দিতে এসেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তা নেননি। তার জন্য মুজঃফর আমেদ তাঁর আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বক্রোক্তি করেছেন। যাই হোক এই যোগাযোগকে বলশেভিকদের সঙ্গে যোগাযোগ বলে মনে করা কোনও ক্রমেই সম্ভব নয়। এরপর নলিনী ঢাকায় একবার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তা সফল হয়নি। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইনসপেক্টর যে নোট দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য ঃ

"Nalini went to see Prafulla Ghosh and Subhas Basu on his own accord, with a view to getting some help from the Congress Committee, of which Prafulla and Subhas were influential members. They were not known to Nalini before, nor did he carry any introductory letter to them from anybody."[২৩]

নলিনী বিপ্লবী দলের কিছু ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, এবং তাঁরা তাঁকে কলকাতায়, ঢাকায় এবং অন্যত্র তাঁদের নিজেদের আশ্রয়ে রেখেছিলেন। নলিনী তাঁর জবানবন্দীতে সমস্ত আশ্রয়স্থলগুলি, সেগুলির অনেকগুলিই গুপ্ত আশ্রয়স্থল ছিল, নিখুঁতভাবে, কখনও কখনও ছবি এঁকে ইনটেলিজেন্স অফিসারের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছিলেন বোমা তৈরিতে তাঁর দক্ষতা, এবং কীভাবে তিনি বিপ্লবীদের বোমা তৈরিতে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের বোমার মধ্যে তিনি রকেট বোমা ও land mine তৈরি করাও নাকি শিখিয়েছিলেন। তাছাড়া শিখিয়েছিলেন রিভলবার-পিস্তল সারানোর বিদ্যাও। বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির বিষয়ে তিনি বলছেন, "I have heard from Dange that a number of arms have been received from the Bolsheviks and now they are at Nasik. A quantity of arms which M. N. Roy managed to smuggle into India is now at the disposal of R CL Sharma."[২৪]

নলিনীর অনেক সংবাদই পরে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর খবরের উপর ভিত্তি করে পুলিশ অনুসন্ধান করে অনেক বিষয়ই সঠিক বলে প্রমাণ পেয়েছে। কিন্তু যেভাবে বোমা তৈরির ফরমুলা তিনি বিভিন্ন যুবকদের শিখিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন, সেই দাবিতে অতিরঞ্জন ছিল। মুজঃফর আহমেদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, নলিনী অস্ত্র কারখানার (ফ্রান্সে) কর্মী কখনও ছিলেন না। যাই হোক পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা খুব ব্যাপকহারে বোমার ব্যবহার করেননি। মনে হয় নলিনী অনেক অতিরঞ্জিত করেছেন।

অনন্ত সিংহ ও নলিনীকে ইনটেলিজেন্স বিভাগের অফিসাররাই জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। দুইজনে দুটি আলাদা জেলে থাকলেও, একই মাসে দুই জনের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছিল। ১০ হাজার বোমার খোলকে জীবন্ত বোমায়

পরিণত করতে হলে বেশ কিছু দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন। অনন্ত সিংহ ও নলিনী গুপ্তের জবানবন্দী মিলিয়ে দেখলে দশ হাজার বোমা তৈরি হ'য়ে যায়, এবং বিনাবিচারে আটক রাখার জন্য ১৯২৪ সালের ১ নম্বর অর্ডিন্যান্সটিকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে প্রবল যুক্তি খাড়া করা যায়। অবনী মুখার্জি নামে এক ব্যক্তি মস্কোতে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিদেশে যাওয়ার আগে দেশের কোনও রাজনৈতিক দল বা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। রাউলাট কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহের জন্য অবনী মুখার্জিকে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি দূরপ্রাচ্যে পাঠিয়েছিলেন ; কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জি মস্কোতে দেখা হওয়ার আগে কেউ কাউকে চিনতেন না বলে দু'জনেই স্বীকার করেছেন। যতীন্দ্রনাথের সহযোগীদের নিকট থেকেও অবনী মুখার্জির কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই ব্যক্তি রাশিয়াতে একজন রাশিয়ান মহিলাকে বিবাহ করেন এবং ১৯২০ সালে তাসখন্দে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৯২৪ সালে তিনি মস্কোয় ফিরে যান। এখানে অনেক বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। মস্কো থেকে তাদের নিকট লেখা চিঠিপত্র ইনটেলিজেন্স ব্যুরো আটক করেছিল। এই চিঠি থেকে অনেক খবরাখবর পেয়েছিল গোয়েন্দা দপ্তর। সেখানেও সুভাষচন্দ্রের কিন্তু কোনও উল্লেখই ছিল না।

সুতরাং ১৯২৪/২৫ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের বলশেভিক যোগাযোগ কিছুই ছিল না। আগে উল্লেখ করেছি বলশেভিক সম্পর্কে সরকার অতি সচেতন ছিল এবং তাদের ইনটেলিজেন্স অতি সতর্ক ছিল। এ বিষয়ে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স কর্তার একটি রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য।

An institution which the Anushilan Samiti is using for the purpose of terrorist organisation is Dr. Rabindranath Tagore's well known educational institution at Bolpur in the district of Birbhum. Two active members of the party are known to be there, one of whom, Manmohan Ghosh, has been selected as one of the two delegates of the party to be

sent to Bandar Abbas to get in touch with the Bolsheviks. This man was sent in May to Lucknow with Rash Behari Bose's Japanse address for Jiten Sanyal, brother of Sachin Sanyal. During the Japanese tour in 1924 Dr. Rabindranath Tagore met Rashbehari Bose and it is significant that in 1924, after Government had refused a passport to India to Keshoram Sabarwall, a revolutionary of Peshawar, who was at one time Rashbehari Bose's private secretary and was cognisant of the German plots in the Far East, interceded although unsuccessfully, on his behalf before the Government of Bengal, suggesting that Sabarwall would be provided with a post in Bolpur. In June 1925, Narendra Sen wrote that Mr. Bose of Japan had been trying to introduce an agent into the Biswa Bharati (Dr. Tagore's University at Bolpur), but had not been successful. In that letter he also wrote that it was necessary to place 3 more members of the party in Bolpur. I. B. Sen, who is known to be connected with M. N. Roy tried in May to secure an appointment in the Biswa Bharati for an ex-detenue named Lal Mohan Dey, who is still an active member of the Anushilan Samiti. A reliable agent states that Mr. Lin Ngo Chang, professor of Chinese is the link between revolutionaries of India and China. As far as it is known Dr. Tagore is not cognisant of the use of his university" [২৫] তথ্য সংগ্রহের পরিধি খুবই বিস্তৃত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স সঠিক হদিস পায়নি।

সরকারের গোপন নথিপত্র থেকে এমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা পাওয়া যাচ্ছে না যাতে মনে হতে পারে যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ১৯২৪/২৫ সালের আগে সন্ত্রাসবাদী ও বলশেভিকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। অথচ এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সরকার তাঁকে বার বার নির্যাতন করেছে কিংবা নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

কখনও আদালতের নিকট সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে সাজা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

১৯৩৭ সালে তাঁকে বোম্বাই-এ গ্রেপ্তার করা হয়। তখন সারাদেশে প্রতিবাদ সোচ্চার হ'য়ে উঠেছিল। ইংল্যাণ্ডে কয়েকজন লেবার পার্টির সদস্য পার্লামেণ্টে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সরকার একই অজুহাত দিয়েছিল—সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ। যদিও ১৯৩৩ সাল থেকে সুভাষ ছিলেন বিদেশে; এবং ১৯৩৭ সালে স্বদেশেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সরকারের গভীর উৎকণ্ঠা ছিল, কারণ তাঁকে বিশেষভাবে বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সুতরাং তার উপর সরকারি নজরদারি কখনই বিশেষ শিথিল হয়নি। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ইউরোপে ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের নেতা থেকে ভারতের নেতা হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত হন। গান্ধীজি ও নেহরু ইউরোপে আগেই পরিচিত হয়েছিলেন ভারতীয় নেতা হিসাবে। তাঁদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নামও যুক্ত হল। এই সময় সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী ইউরোপীয় নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট তুলে ধরেছেন; বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে কথাবার্তা বলেছেন; হিটলার, মুসোলিনী থেকে ডি ভ্যালেরা পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্র নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছেন।

স্বাভাবিকভাবে এই অধ্যায়টি সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সুভাষচন্দ্রের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর ব্রিটিশ সরকারের সজাগ দৃষ্টি ছিল। সুতরাং এ সময়ের অনেক তথ্য বৃটিশ সরকারের অভিলেখাগারে পাওয়া সম্ভব। অবশ্য অনেক গোপন রিপোর্ট, বিশেষ করে ইনটেলিজেন্সের গোপন রিপোর্ট প্রকাশ করার বিষয়ে অনেক বাধা-নিষেধ থাকে। সেগুলিকে অতিক্রম করে সেই রিপোর্টগুলিকে ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সরকারি গোপন নথিপত্র ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের নিয়ম-কানুন আছে; তবে সাধারণভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম সবদেশেই মান্য করা হয়। সরকারি গোপন নথিপত্র অর্থাৎ যাকে পরিভাষায় বলা হয় Classified document, কতদিন গোপন রাখা হবে তার নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। সাধারণত তিনটি জিনিস গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। প্রথমত গোপন

নথিপত্র প্রকাশ পেলে যদি কোনও জীবিত ব্যক্তির মান-সম্মান বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সে ক্ষেত্রে নথিপত্র প্রকাশ করা হবে না। দ্বিতীয়ত, গোপন নথিপত্র প্রকাশিত হলে যদি কোনও মিত্র দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রেও নথিপত্র প্রকাশ করা হবে না। তৃতীয়ত যদি নথিপত্র প্রকাশিত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় কিংবা বহিঃশত্রু সুযোগ গ্রহণ করে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার সম্ভাবনা থাকে তবে সেই নথিপত্র প্রকাশ করা হবে না।

এছাড়াও বিভিন্নদেশে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে ; কিন্তু সমস্ত নিয়মই এই তিনটি মূল সূত্রকেই মেনে চলে। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কিংবা সামরিক কার্যকলাপের রিপোর্ট কিংবা তৎসংক্রান্ত নথিপত্রে আজ আর কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া বা সম্মানহানির সম্ভাবনা নেই। দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তাছাড়া তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্যই ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে— সুতরাং সরকারি নথিপত্রে অন্য তথ্য থাকলেও সত্যকে সহজে বিকৃত করা সম্ভব হবে না। যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত তথ্যকে বিচার করলে সত্য নির্ধারণ করা সহজ হবে। অন্যদেশের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটিও অবান্তর হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ এখন ব্রিটিশ ভারত নয়, জার্মানিও নয় নাৎসী জার্মানি, জাপানও নয় তোজোর জাপান। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর কোনও রূপ চাপ পড়ার সম্ভাবনা নেই। তাই যুক্তি সঙ্গতভাবে বিচার করে দেখতে গেলে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত কোনও গোপন তথ্য প্রকাশে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। বস্তুত পক্ষে ভুল তথ্য ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে প্ররোচিত হয়ে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে যে বিষোদ্গার করা হয়েছে, তার জন্য যদি সুভাষচন্দ্রের মর্যাদাহানি না হয়ে থাকে তবে সরকারি দপ্তরে এমন কোনও নথি নেই যে তথ্য সুভাষচরিত্রে কালিমা লেপন করতে পারবে।

এখানে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশে ইনটেলিজেন্স বিভাগে নথিপত্র, কিংবা **security classification** বা নিরাপত্তা বিভাজন করা নথিপত্র ব্যবহার করতে দিতে একটা অনীহা আছে। 'গোপনীয়' এই কথাটির উল্লেখ মাত্রই আমলা থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই বিষয়টি এড়িয়ে চলতে চান। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে নথিটির গুরুত্ব বিচার করে সিদ্ধান্ত নিলে অনেক ক্ষেত্রেই গোপনীয়তার ছাপকে বর্তমানে অবান্তর বলে মনে হবে। বস্তুতপক্ষে গোপনীয়তার ছাপ যখন দেওয়া তখন সেই সময়ের কথা ভেবে এবং কিছু ব্যক্তি বা শ্রেণীর কথা ভেবে

নথিটিকে গোপনীয় করা হয়। এটি সর্বকালের জন্য গোপনীয় নয় এবং সব-মানুষের কাছ থেকে গোপনীয় রাখাও উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সরকারও যেন গোপন নথি প্রকাশ সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য সরকার দুটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। প্রথমটি ১৯৫৬ সালে শাহনওয়াজ কমিশন, দ্বিতীয়টি ১৯৭৪ সালে একব্যক্তির একটি কমিশন। শাহনওয়াজ কমিশন মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বলে পরিচিত কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। সরকারি দপ্তরের কোনও নথি দেখতে চাননি বা দেখতে পাননি। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে ব্রিটিশ দপ্তরে, ভারত সরকারের দপ্তরে, জাপানের সৈন্যবিভাগের দপ্তরে কাগজপত্র থাকার সম্ভাবনা। এগুলি কমিশনের বিবেচনার মধ্যে আসেনি। ভারত সরকার চেষ্টা করলে এগুলি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারতেন—কিন্তু সে চেষ্টা হয়নি। দ্বিতীয় কমিশনটিরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা।

শুধু মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নয়, সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যকলাপের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য ভারত, ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার সরকারি দপ্তর ও অভিলেখাগার গুলির সাহায্যের প্রয়োজন। এই সাহায্য পাওয়া যাবে তখনই যখন ভারত সরকার এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়ে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেবে। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত পক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটি এইরূপ উদ্যোগ নিয়ে একদল গবেষককে মস্কোতে পাঠিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সম্পর্কিত কিছু নথিপত্র সংগ্রহ করা। তারা যা সংগ্রহ করেছেন তা তাঁরাই সাধারণের নিকট পেশ করবেন। কিন্তু তাঁরা কে, জি, বি কিংবা সরকারি দপ্তরের নথিপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে পদে পদে কঠিন বাধার সম্মুখীন হ'য়েছেন, সে কথা তাদের কাছেই শুনেছি। রাশিয়ার বর্তমান সরকারি কর্তারা আগের মতই সতর্ক। এই সমস্ত বাধা দূর করতে সরকারেরই এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে ইতিহাসের গবেষকরা মনে করেন।

নেতাজী সম্পর্কে অনেক তথ্য যে এখনও বিভিন্ন দেশের সরকারি দপ্তরে পাওয়া যাবে সেই বিষয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। Hugh Toye নামে একজন প্রাক্তন ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসার নেতাজী সম্পর্কে একটি বই লেখেন ১৯৫৭ সালে, নাম Subhash Chandra Bose (The Springing Tiger)।

এই বইটিতে এমন কিছু তথ্য আছে যার সমর্থনে Toye কোনও তথ্যসূত্রের উল্লেখ করেননি। প্রশ্ন উঠতে পারে Toye এই তথ্য পেলেন কোথায়? আমরা জানি ইণ্টেলিজেন্স অফিসার হিসাবে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে Toye এর বিশেষ দায়িত্ব ছিল। এইরূপ নানা তথ্য ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরে পাওয়া যেতে পারে বলে আমাদের ধারণা। Hugh Toye এখনও জীবিত আছেন বলে শুনেছি, এবং এও শুনেছি যে তিনি বইটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করার চেষ্টা করবেন। তিনি ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্সের তথ্য সূত্র কিছু হলেও দিতে পারবেন। এ ছাড়া জাপান ও জার্মানি বিদেশ দপ্তরেও কিছু নথিপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মিত্রশক্তি এমনভাবে এই দপ্তরগুলি লুণ্ঠন করেছিল যে সেখানে কিছু পাওয়া মুশকিল। বরং সেইখানে নথিপত্র ব্রিটিশ বা রাশিয়ান দপ্তরগুলিতে পাওয়া যেতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। U. L. Kuznets নামে এক ব্যক্তি কাবুলে প্রাভদার সংবাদদাতা ছিলেন। ১৯৯২ সালে তিনি একটি ছোট বই লিখেছেন। তার এক জায়গায় তিনি লিখছেন, জার্মানির আত্মসমর্পণের পর ১৯৪৫ এর ৯ই মে ওদের কাবুল দূতাবাসের ৯টি বাক্সে ৩৪৪টি ফাইল, ৬১,৭৯৪ ডলার ৩২২২ পাউণ্ড স্টারলিং, ১০,৯৯৯ টাকা, এবং ২৫,১১৩০ আফগান টাকা সোভিয়েট দূতাবাস দখল নেয়। এগুলি এবং দূতাবাসের জার্মানি কর্মচারীদের মস্কো পাঠিয়ে দেয়। স্মরণ করা দরকার, কাবুল থেকেই সুভাষচন্দ্র মস্কো হয়ে বার্লিন গিয়েছিলেন, ইতালিয়ান ও জার্মানি দূতাবাসের সাহায্যে।

বিভিন্ন দেশের সরকারি দপ্তরের নথিপত্র ভারত সরকারের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া সংগ্রহ করা অসম্ভব। এবং সেই সমস্ত নথিপত্র পাওয়া গেলে আমাদেরও দরকার একজন Trevor-Roper এর মত ব্যক্তি যিনি ইনটেলিজেন্সের কার্যধারা এবং ইতিহাসের গবেষণা—এই দুয়ের সংগেই পরিচিত। তবেই প্রাপ্ত নথিপত্র ও তথ্যাদির সম্যক বিশ্লেষণ সম্ভব হবে।

সোভিয়েট রাশিয়া ভেঙে যাওয়ার পর ভারতের মতো রাশিয়াতেও একটি জনশ্রুতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে সুভাষচন্দ্র তাইহোকু প্লেন দুর্ঘটনায় মারা যাননি; তিনি সাইবেরিয়ার এক বন্দী শিবিরে শেষ জীবন কাটিয়েছেন। এই জনশ্রুতির পরিপেক্ষিতে ১৯৯২ সালে ঐ দেশে নেতাজি সম্পর্কে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। সেই লেখাগুলি সবই রাশিয়ান ভাষায়। ভাষান্তর করে আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছেন শ্রীঅরুণ সোম এবং অধ্যাপিকা পূরবী রায়। এই রচনাগুলি একটু বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে।

U. L. Kuznets নামক এক ব্যক্তি ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত কাবুলে প্রাভদার সংবাদদাতা ছিলেন। তিনি ১৯৯২ সালে MARAUDERS APPEAR FROM THE GAME, নামে একটি ছোট বই প্রকাশ করে Gorbachev Foundation-এর আর্থিক সহায়তায়। মোট ১৩টি অধ্যায়ে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫-এর কিছু ঘটনার কথা বলা হয়েছে। বইটি ভারতের উপর নয় ; কিন্তু নেতাজি সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয় টোকিওতে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতকে লেখা নেতাজীর একটি চিঠি রাশিয়ান ভাষাতেই ছাপিয়ে দিয়েছেন। ক্যুজনেৎস দাবি করেছেন এই চিঠিটি তিনি KCB-এর দপ্তর থেকে পেয়েছেন। রুশ থেকে চিঠিটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ডঃ পুরবী রায়। চিঠিটি এইরূপ ঃ

ARZI HUKUMATE AZAD HIND

IMPERIAL HOTEL. TOKYO
Monday, 20th November 1944

His Excellency, The Soviet Ambassador, Tokyo

Your Excellency

At present I am in Tokyo. I would like to use this oppertune moment to pay a visit to your excellency. I am seeking help of the Soviet Government through you to fulfill the task of our freedom struggle to free India.

2. I cannot deny the fact that at the moment we are closely, associated with the Axis power for a common struggle against the Anglo-American bloc. I am glad to inform you that the Axis power is now having a clear idea about the main problems of India and they have accorded rocognition to the AZAD HIND STATE (FREE INDIA) for which we are thankful to them. Besides, Japan's relations with the Soviet Union is strictly neutral, even the German Government can understand fully well and evaluate the fact that we Indians are only fighting against UK and USA.

The German Government has also understood and appreciated the fact that we are not intersted to go against the Soviet Russia. Certainly, the activities of my organisation in Europe have generated an exclusive impression that we are only against the Anglo-Americans bloc and not against the Soviet Russia. This was the understanding of cooperation between the Axis power and our organisation in Europe. In this connection we have a clear policy and approval from the German Government, as well as the fascist Italian Government.

3. I know that now there is an alliance between the Soviet Union and UK. and USA. But I feel that I have clear perception about prevailing international situation that if the Soviet Union extends its help to our freedom struggle, it will certainly not stand in your way. I am very much thankful to your Government and I do remember the help which was extended by the Soviet Government after I had left India in 1941. I conveyed my thanks to His Excellency, Minister for External Affairs Molotov in my letter I wrote from Berlin. I trust His Excellency had certainly received it.

4. I have always been encouraged by the fact that Lenin in his lifetime always from the core of his heart extended support to the countries which were struggling against the colonial rule. So far I understand that the Soviet attitude towards the problems of the oppressed nations like India has not been changed after his death.

5. As to my party—Forward Bloc, I can say that when the Soviet foreign policy had been condemned by almost all the political parties of India in 1939-1940, ours

was the only party which had openly supported the Soviet foreign policy in relation to Germany and Finland. Besides, we are forming the left wing movement in India with a proggessive programme to solve our socio-economic problems. Further, our party is the only party in India which has been relentlesaly strugglіug in alliance with a few other revolutionary groups against the British Imperialism.

My earnest desire is to pay a visit to your Excellency and the way through which your Government can help us for success of our struggle for freedom. The nature of help which the Soviet Government can extend to us depends on the decision of the Soviet Government in relation to the current situation of war. I would also like to emphasise that the Indian Government, after India's liberation would have to recognise the AZAD HIND GOVERNMENT without any string.

I assure your Excellency, with my esteemed regards to you, that our relationship will remain for ever. I now await an early reply from you.

Subhas Chandra Bose.

ক্র্যুজনেৎসের দাবি মেনে নিলে, স্বাভাবিকভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন উঠবে। এ পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল নেতাজী জাপান থেকে বা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। Hugh Toye এ সম্পর্কে লিখেছেন, "Before he left Tokyo, Bose asked to be allowed to approch Soviet Russia.***The Japanese declined." মিহির বোস লিখছেন, "One night, returning to his hotal from yet auother meeting with the Japanese he quickly wrote a note for the Russian ambassador and asked one of his assistants to take it to him. A few hours later, the assistaut returned dejected ; the ambassador had not even

bothered to receive him, and his secretary had returned the letter unopened." এ ছাড়া Leonard A. Gordonও মিহির বোসকেই উদ্ধৃত করেছেন।

এই অবস্থায় ক্যুজনেৎসের দাবি যে এই চিঠিটি তিনি K. G. B-এর দপ্তর থেকে পেয়েছেন কতটা গ্রহণযোগ্য। চিঠিটি অবশ্য তিনি রাশিয়ান ভাষায় পেয়েছেন এবং সেইভাবেই প্রকাশ করেছেন। যদি K. G. B. অভিলেখাগারের কোনও অফিসার এটি প্রত্যয়িত (attested) করে দিতেন তবে এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকত না। কিন্তু এই ধরনের সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতি কুজনেৎস অনুসরণ করেননি বা করতে পারেননি বলে চিঠিটিকে অগ্রাহ্য করাও উচিত হবে না।

প্রথমত চিঠির ভাষাটি, ডঃ পূরবী রায়ের ইংরেজি অনুবাদে, বেশ সরল ও স্বচ্ছ। বক্তব্য সোজাসুজি বলা হয়েছে। এটিকে নেতাজির লেখা বলে মেনে নিতে কোনও অসুবিধা হয় না।

নেতাজীর চিঠিটি মস্কো পৌঁছেছিল এ সম্ভাবনা মেনে নিলে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই চিঠিটি কে. জি. বি. কিংবা বিদেশ দপ্তরে একটি বিচ্ছিন্ন ও পারম্পর্যহীন নথি হিসাবে পৌঁছায়নি। সেখানে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে ফাইলের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অন্তত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে কুজনেৎসের দাবি ও চিঠিটি সম্পর্কে রাশিয়ার বিদেশদপ্তরে ও কে. জি. বি দপ্তরে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

কুজনেৎসের লেখাটি ছাড়াও ১৯৯২-৯৩ সালে রাশিয়ায় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল ঃ

Life and Death of Netaji Bose, by. A Vinogradov. এটি Echo of the Planets নামক পত্রিকায় মে-জুন, ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক কিছুদিন ভারতবর্ষে তাসের সংবাদদাতা ছিলেন। প্রবন্ধটিতে নেতাজী সম্পর্কে সুপরিচিত তথ্যের ও ছবির সমাবেশ ঘটেছে। প্রবন্ধের শেষে লেখক বলেছেন যে কে. জি. বি-র সদর দপ্তর ছাড়াও রাশিয়ার আঞ্চলিক অভিলেখাগারগুলিতে নেতাজী সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।[২৬] Asia and Africa To day নামক একটি সাময়িক পত্রের ১৯৯৩ সালের ৮ নম্বর সংখ্যায় A. Raikov নামক এক ব্যক্তির, Secrets of Subhas Chandra Bose's death নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। Raikov-এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে a Ph. D in History বলে। লেখক কোনও নতুন তথ্য

দেননি বা নথিও উদ্ধৃত করেননি। কিন্তু তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কে. জি. বি দপ্তরে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এরপর Asia and Africa To day এর ১৯৯৩ সালে ৯নং ও ১০নং সংখ্যায় B. Turadzev নামে এক ব্যাক্তি Against whom Subhas Bose fought during the Second World War নামে দুই কিস্তিতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। লেখকের মতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে দুটি কাহিনী বহুল প্রচলিত। সুভাষচন্দ্র শেষ জীবন সাইবেরিয়ার বন্দীশিবিরে কাটিয়েছেন এবং তাইহোকু বিমান বন্দরে সুভাষচন্দ্রের বিমানটি ধ্বংস হওয়ার পিছনে সোভিয়েত গুপ্তচর চক্রের হাত ছিল। লেখকের মতে এই দুটি জনশ্রুতির সমর্থনে সরকারি দপ্তরে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্ধান মেলেনি। সঙ্গে সঙ্গে Turadzev লিখেছেন যে K. G. B দপ্তরে এমন কিছু তথ্য আছে যা সবাইকে চমৎকৃত করবে ; এবং তিনি নিজেই কিছু interesting নথি সংগ্রহ করেছেন।

লেখক তার দুই কিস্তির প্রবন্ধে দুটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। চিঠি দুটির ভাষা ইংরেজি এবং একই ব্যাক্তি চিঠি দুটি লিখেছেন। একই ব্যাক্তিকে দুটি চিঠিই পাঠানো হয়েছে। চিঠির বক্তব্য অবশ্য আলাদা। দেখে মনে হয় মূল চিঠির ফটোকপি ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটির ৯ নম্বর সংখ্যায় যে চিঠিটি ছাপা হয়েছে তা এইরূপ।

MOST SECRET.

FROM : Colonel G. A. Hill, D. S. O.

TO : Colonel Ossipov.

Moscow, 11th, December, 1945.

Dear Colonal Ossipov,

Re : Bhagat Ram.

As you are aware, the Government of India has granted a safe-conduct to both Rasmuss and Witzel of the German Legation in Kabul, who have been recalled to Germany by their Government.

While their travelling arrangements will be subject to considerable delay, the disappearance of these to from the Kabul scene has entirely altered the situation. The

Government of India are by no means confident that Pilger will be able to handle Bhagat Ram without risk to the latter's own safety.

The Government of India therefore advise against sending Bhagat Ram back at present. Subject to the approval of your Departments concerned, India proposes to send an interim report by messenger which will reply to questions asked by Subhas Chandra Bose. The report will also include observation which are necessary to correct any impression which may have been created in Berlin by the joint efforts of Witzel and Bhagat Ram, to the effect that the Central Committee is prepared to bring about a general revolt in India in the near futuJe.

I further beg to inform you that the Departments concerned in India have despatched a very long report dealing with various aspects of the Bhagat Ram matter. It is hoped that this report will reach Moscow about the 26th/30th of December, when it will be transmitted to you immediately on radio.

Yours Sincerely,
G. A. Hill

পত্রিকাটির দশ নম্বর সংখ্যায় ছাপা চিঠিটিও নিচে উদ্ধৃত করা হল।

MOST SECRET.

FROM : Colonel G. A. Hill, D. S.

TO : Colonel Ossipov.

Moscow, 11th, December, 1943.

Dear Colonel Ossipov,

With reference to my letter of november 18th 1943 concerning the possible visit to Moscow of the Director of

Intelligence (India) Delhi explain the deley in their reply by the fact that the Director was in transit.

Delhi has now been able to consult him, and his views are as follow :

1. He considers it desirable that discussions should take place on general matters of common interest but for agenda purposes he puts forward the following in headings :

2. (a) The future handling to the Bhagat Ram case, with a view to the elimination in future of the delays which have occurred in the past.

(b) The improvement of liaison between your organization and the British organigation in India on the subject of Asiatic intelligence matters.

I reiterate what I have said and written to you—that in my opinion and in view of the decisions reached at the Moscow and Tehran Conferences, such a visit is most desirable for the furthering of British-Soviet aims..

চিঠি দুটি সম্পর্কে লেখক দাবি করেছেন যে মস্কোস্থিত ব্রিটিশ বিদেশ গোয়েন্দা দপ্তর M1-6 এর জনৈক কর্নেল জি. এ. হিল K. G. B-এর অফিসার কর্নেল অসিপভকে দুই ভিন্ন বিষয়ে চিঠি দুটি লিখেছিলেন। কিন্তু চিঠি দুটি মনযোগ দিয়ে দেখলে গভীর সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রথমত দুটি একই ধাঁচে (format) লেখা। যাকে চিঠি দুটি লেখা তাঁর নাম ও পদমর্যাদা এমনভাবে লেখা হয়েছে যা ব্রিটিশ কিংবা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় কোনও টেলিফোন বা রেডিও বার্তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চিঠি দুটির বাকি অংশ কিন্তু ডেমি-অফিসিয়াল ধাঁচে লেখা। ডেমি-অফিসিয়াল ধাঁচে চিঠি যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয় তাঁর নাম ও পদমর্যাদা চিঠির নিচে বাঁ দিকে লেখা থাকে। এখানে তা করা হয়নি তাই এটি কোন ব্রিটিশ অফিস থেকে কোনও ব্রিটিশ অফিসারের লেখা চিঠি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় কোনও ইনটেলিজেন্স অফিসার অপর দেশের

ইনটেলিজেন্স অফিসারের সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ কদাচিৎ করে থাকেন। যেহেতু চিঠি দুটি মস্কো থেকে লেখা তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে কর্নেল হিল মস্কোতে বৃটিশ দূতাবাসে MI-6 এর অফিসার হিসাবে নয় দূতাবাসের অফিসারের পরিচয় নিয়েই কাজ করতেন। তাঁর চিঠি লেখার প্রয়োজন হলে তিনি সেই পরিচয়েই চিঠি লিখবেন। যেহেতু এই সুপরিচিত প্রথার অন্যথা হয়েছে তাই চিঠি দুটি সন্দেহ জনক।

তৃতীয়ত চিঠি দুটিকে security classification করা হয়েছে 'Most Secret' এইভাবে। ব্রিটিশ প্রশাসন কিংবা ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স এ 'Most Secret' বলে কোনও security classification নেই। প্রায় সব ক্ষেত্রেই Top secret, Secret, ও Confidential এই তিন রকমের security classification চালু আছে। এই চিঠি দুটির Most Secret classificahon তাই সন্দেহজনক। চতুর্থত, এই চিঠি দুটির সম্পর্কে সন্দেহের বড় কারণ এদের ভাষা। যে ইংরেজি ভাষা এই চিঠি দুটিতে ব্যবহার করা হয়েছে তা কর্নেল পদমর্যাদার একজন ইংরেজের পক্ষে লেখা খুবই মুশকিল। একবার পড়লেই মনে হবে, এ রচনা তারই ইংরেজি যার মাতৃভাষা নয়। পঞ্চমত, ভগতরাম তলোয়ার, যিনি নেতাজীকে পেশোয়ার থেকে কাবুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, একটি চিঠির বিষয়বস্তু। তাঁর সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের কাছে যা রিপোর্ট আছে তা সম্পূর্ণভাবে কে. জি. বি-র নিকট পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। ভগতরাম অবশ্য double agent-এর কাজ করত বলে তাঁর আত্মচরিত্র পড়লেই বোঝা যায়। তবুও তার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট কে. জি. বি-র দপ্তরে পাঠিয়ে দেবে এরকম সুসম্পর্ক দুই দেশের মধ্যে কখনও ছিল না। ষষ্ঠত দ্বিতীয় চিঠিটি থেকে মনে হয় কর্নেল হিল ভারতের রাজনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থার সম্পূর্ণ নামটি জানতেন না। তাই তিনি Director of Intelligence Delhi, India লিখেছেন। এতটা অজ্ঞতা কোনও MI-6 এর অফিসারের কাছে প্রত্যাশিত নয়।

এই সমস্ত কারণে চিঠি দুটির সম্পর্কে গভীর সন্দেহ থেকে যায়। তাছাড়া প্রবন্ধ লেখক দাবি করেছেন যে তিনি চিঠি দুটি কে. জি. বি. থেকে পেয়েছেন; কিন্তু কীভাবে পেয়েছেন তা জানাননি। যে সংস্থার নথি সেই সংস্থা প্রত্যায়িত না করলে তার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। লেখক চিঠি দুটিকে অনেকটা আকস্মিকভাবে উদ্ধৃত করেরেছেন। লেখকের বক্তব্য ও চিঠির

বক্তব্যের মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কিনা সে বিষয়ে লেখক বিশেষ চিন্তা করেননি।

এই চিঠি দুটির যথার্থতা মেনে নিতে না পারলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রাক্তন সোভিয়েত বিদেশ মন্ত্রক, কে. জি. বি-র দপ্তর ও রাশিয়ার বিভিন্ন অভিলেখাগারে ভারতবর্ষ ও নেতাজী সম্পর্কিত নথিপত্র থাকার সম্ভাবনা প্রবল। এ সম্পর্কে ভারত সরকারের সাহায্যে আশু অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. Report of the Sedition Committee, India, 1918. p 34.

২. Terrorism in India 1917—1936. Compiled in the Intelligence Baureua, Govt. of India, 1937. Pp 14-15

৩. Ibid. p 17.

৪. Terrorism in Bengal. A compilation of documents, Vol III, Govt of W.Bengal 1995. p. XLvi.

৫. Ibid vol, I. Pp. 362—363.

৬. Ibid vol III. Pp. X to XVI. টেগার্ট এর সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকাতে পাওয়া যাবে। Royal Empire Society তে বাংলায় সন্ত্রাসবাদের উপর টেগার্টের বক্তৃতাটিও এই খন্ডে সংযোজিত করা হয়েছে।

৭. Terrorism in Bengal ছয়খণ্ডে বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স বিভাগের রিপোর্ট ইত্যাদির সংকলন। টেগার্টের অনেকগুলি রিপোর্ট এই সংকলনে পাওয়া যাবে।

৮. Mihir Bose, The Lost Hero. Quartet Books, London 1982. Pp 45—46.

৯. Terrorism in India : 1917—1936. এই বইটিই তৎকালীন Intelligence Bureau-এর পদস্থ অফিসার H. W. Hale সরকারি ও গোয়েন্দাদের নথিপত্র থেকে সংকলন করেছিলেন। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিবরণ সরকারি নথি থেকে সংকলন করেছিলেন J. C. Kerr নামে Bureau এর আর

একজন অফিসার। Kerr এর বইটির নাম ছিল Political Troubles in India 1907—1917.

১০. Terrorism in India 1917—1936. p. 17.

১১. Terrorism in Bengal. vol I p. 450.

১২. Ibid. p. 360.

১৩. Ibid. p. 361.

১৪. Ibid. p. 378.

১৫. Ibid. p. 379. শান্তি চক্রবর্তী ও বসন্ত ঢেঁকি পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করার ফলে অনেক বিপ্লবী ধরা পড়ে এবং কিছুকিছু অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। শান্তি চক্রবর্তীকে বিশ্বাসঘাতক বলে বিপ্লবীরাই হত্যা করেছিল।

১৬. Ibid. p. 356.

১৭. Ibid. p. 359.

১৮. Ibid. p. 430—443.

১৯. ,,

২০. A Note on communist conspiracy. Circulated by the Home Government. Quoted by Sir David Petrie, Director Intelligence Bureau in his India and Communism. A confidential publication by the Government of India. Simla, 1935. P2 & Appendix I

২১. Ibid. Appendix I

২২. Terrorism in Bengal. Vol I. Pp 418—429.

২৩. Ibid. p. 429.

২৪. Ibid. p. 429.

২৫. Ibid. p. 456.

২৬. রাশিয়ান থেকে প্রবন্ধগুলি অনুবাদ করে শুনিয়েছেন শ্রীঅরুণ সোম। তিনি বিশেষ বিশেষ অংশগুলি খুব মনোযোগের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন এবং মর্মার্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র ও মুসলিম প্রশ্ন

সত্যব্রত দত্ত

আজ থেকে প্রায় নব্বই বৎসর আগে হিন্দু মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।"[১] দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক অসমকক্ষতাই এই বিপত্তির কারণ বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। নিজেই তিনি দেখেছেন কাছারিতে মুসলমানকে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে বসতে দেওয়া হয়, হুঁকোর জল ফেলে দিয়ে তবে তামাক খেতে দেওয়া হয়। সমকক্ষতার বিষয়টি সেজন্যই তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল—"সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।"[২] তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টিতে "শনি" অর্থাৎ বিদেশী শাসকদের ভূমিকা সম্বন্ধেও দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাম্প্রদায়িক সমস্যার শেকড় যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে নিহিত সুভাষচন্দ্রও তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। মুসলমানের অর্থনৈতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক সত্তার যথাযথ স্বীকৃতিই হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির নিশ্চয়তা দিতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। ঔপনিবেশিক শাসকরা কীভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে নিস্তেজ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সুভাষচন্দ্র সে বিষয়েও সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন! মুসলিম প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাযুজ্য লক্ষণীয়; ধর্মীয় আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে দুজনেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন হিন্দু মুসলমান ঐক্য ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। বাস্তবে মুসলমানরাও সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে তাঁদের কাছের লোক বলে মনে করতেন। একাধিক মুসলিম নেতা বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের তারিফ করেছেন, তাঁদের ওপর নির্ভর করেছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকাকালীন বিভিন্ন সময় সফরে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র হিন্দু গৃহে আতিথ্য গ্রহণ

না করে মুসলিম কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতেই রাত্রি যাপন করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের কাছে টানা, তাঁদের সমস্যা জানা। প্রতিষ্ঠিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছাড়া সাধারণ মুসলমান, এমন কি পির, মৌলানা, মৌলভিদের সঙ্গে বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ।[৩]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় মুসলিম প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব ও কর্মদ্যোগ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ও সফল আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে! কিছুটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লিওনার্ড গর্ডন, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীর লেখায়। তবে সুভাষচন্দ্র যে সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় (১৯২০-১৯৪৫) সেই পর্বে বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু উচ্চমানের গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি, ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় শীলা সেন, জে এইচ ব্রুমফিল্ড, পার্থ চ্যাটার্জি এবং জয়া চ্যাটার্জির[৪]! এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। বিশ্লেষণের স্তরও ভিন্ন তবে বৌদ্ধিক উপলব্ধি এবং তত্ত্ব ও তথ্যের পরিবেশনায় এঁদের প্রত্যেকের গবেষণা বিশিষ্টতা পেয়েছে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টিই বহু আলোচিত, দেশবিভাগ ও বঙ্গবিভাগের জন্য মুসলিম লীগকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু জয়া চ্যাটার্জি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে দেখিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে জাতীয়তাবাদ বাঙালি হিন্দু ভদ্রজনের আবেগ ও মানসিকতা প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল, ক্রমশ এবং বিশেষ করে তিরিশের দশক থেকে কীভাবে তা সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয় এবং বঙ্গবিভাগ অবধারিত করে তোলে ; জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ব বাংলার রাজনীতিতে প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। ব্যতিক্রম ছিলেন শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্র ও তাঁদের অনুগামী এবং বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হিন্দু মানুষ। এঁরা যথাযথভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বাংলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোই মুসলিম জনগণকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই অবহেলিত মুসলমান সমাজের প্রতি এঁদের সহানুভূতি ছিল।

সুভাষচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা ছিল স্বচ্ছ, যার ফলে খোলা মনে তাঁর পক্ষে ভারত ইতিহাসে মুসলমানের ভূমিকার মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পটভূমি আলোচনায় তিনি বলেন, "মুসলমানরা ভারতবর্ষকে স্বদেশ

বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং জনগণের সাধারণ সামাজিক জীবনে, তাদের সুখে-দুঃখে, তাঁরাও হয়ে উঠেছিলেন অংশীদার। পারস্পরিক সহযোগিতায় উদ্ভব হয় এক নতুন শিল্প ও সংস্কৃতির, যা ছিল পৃথক কিন্তু স্পষ্টতই হয়ে ওঠে ভারতীয়। এই দুই ধারার মিলনে স্থাপত্যে, চিত্রকলায় ও সংগীতে নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়।"[৫] ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধন ও অগ্রগতিতে মুঘল বাদশাহদের অবদানের স্বীকৃতি পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। "ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে, মুঘল সম্রাটদের শাসনকালে, ভারতবর্ষ আরও একবার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পেঁছয়। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আকবর। দেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠাই আকবরের প্রধান কীর্তি নয় পুরাতনের সঙ্গে নতুন ভাবধারার মিলন ঘটিয়ে এক নতুন সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনই তাঁর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক সহযোগিতাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল আকবরের সাম্রাজ্যশাসন কাঠামো।"[৬] সিরাজদ্দৌলার দেশপ্রেমের সপ্রংশস উল্লেখ আছে সুভাষচন্দ্রের লেখনীতে। "ইংরেজ যে কী সমূহ বিপদের কারণ হতে পারে—এই প্রদেশে একমাত্র তিনিই তা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।"[৭] এই ইতিহাসবোধ থেকেই সুভাষচন্দ্রের মনে হয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই; ঐক্যের সুরই প্রবল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্বটা সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে। সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির উৎস ও তাকে নির্মূল করতে নির্দিষ্ট কর্মসূচী তিনি ঘোষণা করেন মহারাষ্ট্রে প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে (মে ৩, ১৯২৮)। এই কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই আজাদ হিন্দ ফৌজের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র যে নির্দিষ্ট কর্মসূচী দেন তার প্রাসঙ্গিকতা আজও সমভাবে অনুভূত হয় বলে তা উল্লেখ করা হলঃ

এক. সুভাষচন্দ্র মনে করতেন অর্থনৈতিক সমস্বার্থের চেতনা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিলুপ্তিতে সক্ষম হবে। তাঁর মতে একজন মুসলমান চাষীর সঙ্গে একজন হিন্দু চাষীর নৈকট্য গড়ে উঠতে পারে সহজেই যা একজন মুসলমান জমিদারের সঙ্গে মুসলমান চাষীর হতে পারে না!

দুই. ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের আবশ্যিক শর্ত বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন। তাঁর মতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতীয় রাজনীতিতে খিলাফতের মত ধর্মীয় প্রশ্নকে স্থান দেওয়া 'দুর্ভাগ্যজনক' হয়েছিল। ধর্মাচরণ ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় নির্দেশকে প্রসারিত না করার পক্ষপাতী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ধর্মীয় সংকীর্ণতা কোন স্তরেই তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায়নি। আজাদ হিন্দ ফৌজের চরম অর্থসংকটের সময় সিঙ্গাপুরের চেট্টিয়ার সম্প্রদায় সাহায্য দিতে চাইলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ চেট্টিয়ারদের মন্দিরে অন্য ধর্মাবলম্বী, এমন কি হরিজনদের প্রবেশাধিকার ছিল না। শেষ পর্যন্ত চেট্টিয়াররা গোঁড়ামি ত্যাগ করলে নেতাজি আবিদ হাসান, শিখ ও খ্রিস্টান সেনানীদের নিয়ে মন্দিরে যান এবং আর্থিক দান গ্রহণ করেন।

তিন. মুসলিম ও হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয় এবং সামাজিক আদান-প্রদান দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে আরও কাছে আনতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এজন্য ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের ওপরও সুভাষচন্দ্র গুরুত্ব দেন। হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) প্রতিটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

চার. তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলার রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হিন্দুত্বের আবেগ যুক্ত করার যে প্রবণতা দেখা দেয় সুভাষচন্দ্র তার বিরোধী ছিলেন। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জাতীয়তাবাদের মূল ধারার সঙ্গে মুসলমানদের যুক্ত করার কাজে তিনি সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন।

পাঁচ. বিদেশী শাসকদের বিভেদনীতি বানচাল করার জন্য রাজশক্তির বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম পরিচালনার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন কারণ হিন্দু মুসলমানের মিলিত আন্দোলনের মধ্যেই ঐক্যের সূত্র দৃঢ় হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। আপস পন্থার তিনি বিরোধী ছিলেন।

(২)

মুসলিম প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের প্রাথমিক উদ্যোগ হল বেঙ্গল প্যাক্ট। বঙ্গীয়

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকরূপে সুভাষচন্দ্রের স্বাক্ষরে এই চুক্তি প্রকাশিত হয়। অবশ্য বেঙ্গলপ্যাক্টের পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপারণের কৃতিত্ব সুভাষের রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের। সুভাষের কাছে দেশবন্ধু ছিলেন 'স্বদেশ সেবা-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক।' বিশের দশকে বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে বাংলার সাম্প্রাদায়িক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা করেন। সাম্প্রদায়িকতা যে মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যারই অভিব্যক্তি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে চিত্তরঞ্জন যথার্থভাবেই তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। লোকসংখ্যা অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আইনসভা, জেলাবোর্ড ইত্যাদিতে প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ধারণ। সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ৫২ ও ৪৮ ভাগ বণ্টন ইত্যাদির ফলে বেঙ্গল প্যাক্ট ঐ সময় খুবই কার্যকর হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রয়াসের ফলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে বহুলাংশে কোণঠাসা করে দিতে সক্ষম হয় এই চুক্তি। সাংবিধানিক পদ্ধতিতে এইভাবে সরকারকে বিব্রত করা সম্ভব হত না যদি না বঙ্গীয় বিধানসভার অধিকাংশ মুসলমান সদস্যের সমর্থন স্বরাজীদের পক্ষে থাকত। ইংরেজ সরকারের হুমকি, আবদুর রহিম, গজনভি প্রমুখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্ররোচনা সত্ত্বেও বিরাট সংখ্যক মুসলমান স্বরাজীদের সঙ্গে একযোগে বিদেশী শক্তির বিরোধিতা করেন, ফলে ইংরেজদের তল্পিবাহক মুসলমান নেতারা সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়। বাংলা ও বাংলার বাইরের মুসলমানদের মধ্যে বেঙ্গল প্যাক্ট বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই চুক্তিকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করে আক্ষেপ করে বলেছেন, পরবর্তীকালে কংগ্রেস বেঙ্গল প্যাক্ট প্রত্যাখ্যান করার ফলেই হিন্দু মুসলমান সংঘাত বৃদ্ধি পায় এবং দেশ বিভাগ হয়।

দেশবন্ধু শিষ্য সুভাষচন্দ্রও বেঙ্গল প্যাক্টের সফল রূপায়ণের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা নেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা করপোরেশনের চিফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি নির্দেশ দেন, "নতুন কাউকে নিয়োগ করতে হলে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবি যেন প্রথমে বিবেচনা করা হয়।" ১৯৪০ সালে কলকাতা করপোরেশনে সুভাষ বসু ও মুসলিম লিগের যৌথ প্রয়াস হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ নেয়। এম. এ. ইস্পাহানি সহ একাধিক মুসলিম লিগ নেতা-মুসলমানদের সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চরম পর্বে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের দাবিতে সুভাষচন্দ্র যে আন্দোলন শুরু করেন বাংলার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে তা এক নতুন সম্ভাবনা এনে দেয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম কলঙ্কিত করে ইংরেজরা হলওয়েল মনুমেণ্ট স্থাপন করে কলকাতায়। এই মনুমেণ্ট ভাঙার দাবিতে সুভাষচন্দ্র ৩ জুলাই ১৯৪০ দেশব্যাপী 'সিরাজ স্মৃতি দিবস' পালনের আহ্বান জানান এবং অ্যালবার্ট হলে হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত জনসভায় ঘোষণা করেন তিনি নিজে হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙার সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দেবেন। প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন ফজলুল হক—মুসলিম লিগ সরকার হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙার ব্যাপারে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, কারণ, বিধানসভায় মন্ত্রিমণ্ডলী সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় দলের সদস্যদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ঐ দলের নেতা পি. জে. গ্রিফিথ ঘোষণা করেন হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙা হলে ইউরোপীয় গোষ্ঠী মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। ভারতরক্ষা আইনে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হলে হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে মিছিল, মিটিং ও সত্যাগ্রহ সংগঠিত করে। ইসলামিয়া কলেজের (মৌলানা আজাদ কলেজ) বহু ছাত্র ও অধ্যাপক জুবেরি সহ কয়েকজন শিক্ষক পুলিশি হামলায় আহত হন। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার ও সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে বিধানসভা উত্তাল হয়ে ওঠে। বিতর্কে অংশ নিয়ে একের পর এক মুসলমান সদস্য সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন স্বাধীনতার জন্য অতীতে হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে সংগ্রাম করেছে, আগামীদিনেও দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বিদেশী শক্তিকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। বিধানসভায় কমিউনিস্ট সদস্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যথাযথ গতি নির্দেশে সক্ষম হবে বলে তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকও সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক সরকারের কিছু করার নেই। শেষ পর্যন্ত সরকার থেকে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমানের মুখপাত্র হিসেবে সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন।

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে কৃষক প্রজা দলের অভ্যুদয় বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে এক গুণগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা এনে দেয়।

ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা দলের নৌশের আলি, হুমায়ুন কবীর, শামসুদ্দিন আহম্মদ, আশরফদ্দিন, অছিমুদ্দিন আহম্মদ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ নেতা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে মুসলিম জনগণকে সংগঠিত করতে প্রয়াসী হন। নির্বাচনের আগে মহম্মদ আলি জিন্না নিজে বাংলায় এসে কৃষকপ্রজা দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের চেষ্টা করেন। কৃষকপ্রজা নেতৃত্ব জিন্নার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন কারণ মুসলিম লিগের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জোট বাঁধা তাঁরা নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করেন। কৃষকপ্রজার নির্বাচনী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ। খাজনা ঋণ মকুব মহাজনী আইন প্রণয়ন ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবি। কৃষকপ্রজা দলের প্রচারের ফলে মুসলিম জনগণের কাছে নির্বাচনের প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থনৈতিক সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা নয়। নির্বাচনে কংগ্রেস হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। দ্বিতীয় স্থান পায় কৃষকপ্রজা। অনেকেই আশা করেছিলেন কৃষকপ্রজা—কংগ্রেস কোয়ালিশন, না হয় অন্তত কংগ্রেস-সমর্থনে কৃষকপ্রজা মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশ ছিল প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় যোগ না দেওয়া, এমনকি সমর্থনও না। তাছাড়া মন্ত্রিসভার কর্মসূচীর অগ্রাধিকারের প্রশ্নেও কংগ্রেস ও কৃষকপ্রজার মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। কংগ্রেস চাইছিল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে, অন্যদিকে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন, কৃষিঋণ মকুব, সালিশি বোর্ড গঠন ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রাধিকারের দাবি ছিল কৃষকপ্রজার। সুভাষচন্দ্র তখন অন্তরীণ, শরৎচন্দ্র বসুও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেস-কৃষকপ্রজা মৈত্রীর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় না এবং কৃষক প্রজার সঙ্গে মুসলিম লিগের কোয়ালিশন সরকার হয়। কংগ্রেস কৃষকপ্রজা মৈত্রী না হওয়ার জন্য 'হিন্দু নেতাদের অদূরদর্শিতাকেই' দায়ী করেন কৃষকপ্রজা নেতৃবৃন্দ।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভা কার্যত হয়ে ওঠে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা এবং ফজলুল হক হন মুসলিম লিগের প্রধান প্রবক্তা। এগারোজন মন্ত্রীর মধ্যে নয়জনই ছিলেন জমিদার এবং মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তেইশজন ইউরোপীয় সদস্যদের সমর্থন। স্বভাবতই ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থ ব্যাহত হতে পারে এমন কোন কাজই ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নৌশের আলি পদত্যাগ করেন, তমিজুদ্দিন খাঁ মন্ত্রিসভা বিরোধী এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গঠন করেন। আবু হোসেন সরকার, গিয়াসুদ্দিন

আহমদ, 'আবদুল ওয়াহেব', সৈয়দ আহমদ প্রমুখ নেতা ফজলুল হক এবং মন্ত্রিসভার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুক্ত, বেশ কয়েকজন মুসলমান বিধায়ক তাঁদের সমর্থন করেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মুসলমান বিধায়কের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল ঐ সময় কংগ্রেস যদি মুসলিম লিগ বিরোধী মুসলমান সদস্যদের নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা করতে পারে তবে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার রোধ করা যায়; হিন্দু-মুসলিম ঐক্যও অনেকটা সংহত হয়। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শও করেন। নীরদ সি চৌধুরী লিখিত 'দাই হ্যাণ্ড গ্রেট অ্যানাক'' গ্রন্থে সুভাষ-গান্ধী পত্রালাপ স্থান পেয়েছে।[৮] মনে হয় গান্ধীজি প্রথমে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং নলিনীরঞ্জন সরকারকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দিতেও রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, নলিনী রঞ্জন সরকার ও ঘনশ্যাম দাস বিড়লার সঙ্গে আলোচনার পর তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং এই সময় ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না বলে সুভাষচন্দ্রকে জানান। বিড়লাই ওয়ার্ধা থেকে 'সুভাষবাবু'কে লেখা গান্ধীর পত্র নিয়ে আসেন। স্বভাবতই সুভাষচন্দ্র ক্ষুব্ধ হন এবং এই ব্যাপারে মারওয়াড়ি পুঁজির রক্ষক ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মুখ্য ভূমিকা রয়েছে বলে তাঁর মনে হয়। সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব মত ঐ সময় হক মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত করা সঙ্গত হত কি না এ বিষয়ে মতভেদের নিশ্চয়ই অবকাশ আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত লোকও ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে অপসারণের বিরোধী ছিলেন। মুসলিম লিগ সংগঠিত মুসলিম জনরোষের কথাও মনে রাখতে হয়। তবে এটাও লক্ষণীয় বিধানসভার মুসলমান সদস্যদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ তখনো সাম্প্রদায়িক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন, কৃষক সভা ও অন্যান্য গণসংগঠনে এঁরা সক্রিয় ছিলেন। পোশাক, আচার-আচরণে মুসলমান সদস্যদের অনেকেই ছিলেন খাঁটি বাঙালি। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এঁরা বিধানসভায় আসতেন; হিন্দু-মুসলমান সাধারণ ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এঁদের বক্তৃতা দিতে দেখা যেত। এঁরা নিজেদের 'পল্লীবাসীর প্রতিনিধি', 'পাড়াগাঁয়ের কৃষক' বা 'কৃষকদের নিজের লোক' বলে আখ্যায়িত করতেন।[৯] সুতরাং সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত কোয়ালিশন সরকার ঐ সময় গঠিত হলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরূপণে যে ভূমিকা নিতে পারত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলা সহ এগারোটি প্রদেশে কংগ্রেসী

মন্ত্রিসভা বিদেশী সরকারকে নাজেহাল করতে সক্ষম হত। বস্তুত ফজলুল হক ও শরৎ বসুর উদ্যোগে বাংলায় প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় ১৯৪১ সালে এবং তা পনেরো মাস স্থায়ী হয়। কিন্তু ততদিনে মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক প্রচার তৃণমূল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ১৯৩৮-এ যে সম্ভাবনা ছিল ১৯৪২-এ স্বভাবতই তার আর প্রয়োজনীয়তা থাকল না।

(৩)

অস্বীকার করা যায় না সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও প্রচেষ্টার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি ছিল। মুসলিম লিগকে মুসলমানদের 'একমাত্র মুখপাত্র' বলে মনে করার তিনি বিরোধী ছিলেন অথচ ১৯৪০-এ কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচনে মুসলিম লিগের সঙ্গেই তিনি আঁতাত করেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা এতে খুবই ক্ষুব্ধ হন, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের সাময়িক বিচ্ছেদও ঘটে।

১৯২৮ সালে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেসের সাংবিধানিক খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির সদস্যরূপে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা বিতর্কমুক্ত ছিল না। নেহরু কমিটির রিপোর্টে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের সুপারিশ থাকলেও বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য আদৌ কোন সংরক্ষণের প্রস্তাব রাখা হয়নি। মহম্মদ আলি জিন্না ঐ দুই প্রদেশে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানান। তেজবাহাদুর শপ্রু, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জিন্নার দাবি মেনে নেওয়ার পক্ষে ছিলেন কিন্তু বিরোধিতা আসে হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি এম আর জয়াকর, লালা লাজপত রায়, ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে। সুভাষচন্দ্রও জিন্নার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তাঁর ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, এরপর থেকেই জিন্নার রাজনীতি ভিন্ন দিকে বাঁক নিতে শুরু করে এবং ক্রমশ তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা হয়ে ওঠেন।

মুসলিম প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আরও স্ব-বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের সময়। বেঙ্গল প্যাক্টের উল্লেখ আমরা করেছি। এর ইতিবাচক দিক নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বেঙ্গল প্যাক্টের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল, শিথিল ভিত্তির উপর এই চুক্তি রচিত হয়েছিল। এই চুক্তির যা যা শর্ত ছিল তাতে আপামর মুসলমান জনগণের উপকৃত হওয়ার মত কিছু ছিল

না। এতে লাভবান হয়েছিলেন শিক্ষিত বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত মুসলমান। এবং প্যাক্টের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ প্রায় যখন ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করে বিধানসভায় একটি বিল পেশ করেন ভূমিরাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রভাসচদ্র মিত্র। বিলের আলোচনার প্রতিটি স্তরে হিন্দু স্বরাজী সদস্য (যাঁরা ছিলেন বেঙ্গল প্যাক্টের প্রবক্তা) ও মুসলমান জমিদার এবং ইউরোপীয় সদস্যরা জমিদারদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সক্রিয় থাকেন। মুসলমান সদস্যরা বর্গাদার ও রায়তদের পক্ষ সমর্থন করেন। যে সব সদস্য জমিদারদের পক্ষে ও রায়তদের বিরুদ্ধে ভোট দেন তাদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। প্রজাস্বত্ব আইনকে কেন্দ্র করে বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আরো প্রশ্রয় পায়; মুসলিম জনগণ থেকে কংগ্রেস অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুসলমানরা ক্রমশ জাতীয়বাদের মূল ধারা থেকেও সরে আসতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্তে আসা যায় প্রজাস্বার্থের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে "বাংলার হিন্দু সেদিন সজ্ঞানে দেশভাগের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন," কারণ বাংলার জমিদারদের মধ্যে হিন্দুরাই ছিলেন সিংহভাগ, আর রায়ত ও খাতকের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। আবুল মনসুর আহমদ যথার্থভাবেই বলেছেন "বাংলার আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো এমনই ছিল যে, প্রজা-খাতক নামের চুল ধরিয়া টান দিলে মুসলমান নামের মাথাটি আসিয়া পড়িত। অপরপক্ষে, জমিদার-মহাজনের নামের টানে হিন্দুরাও কাতারবন্দি হইয়া যাইত।"[১০]

প্রজাস্বত্ব বিলে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার স্বপক্ষে বলা হয় আইনসভায় সুভাষচন্দ্র দুবার নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু পরিষদ-সর্বস্ব রাজনীতিতে তিনি আস্থাবান ছিলেন না। সময় সময় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ছাড়া বিতর্কে তাঁকে বিশেষ অংশ নিতে দেখা যায়নি। লিওনার্ড গর্ডন মনে করেন প্রজাস্বত্ব বিলে দলীয় নির্দেশে সুভাষচন্দ্র ভোট দিয়েছেন মাত্র, আলোচনায় কোন অংশ নেননি। দলীয় বৈঠকে তিনি হয়তো তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে থাকতে পারেন। তবে সচেতনভাবেই যে বসু ভ্রাতৃদ্বয় এই বিলে জমিদরদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন এটা অস্বীকার করা যায় না।

(৪)

মুসলিম প্রশ্নে সুভাষন্দ্রের মধ্যে নানা অসঙ্গতি ছিল, স্ব-বিরোধিতাও ছিল কিতু ঐকান্তিকতার অভাব ছিল না। আবুল মনসুর আহমদকে তিনি বলেছিলেন, "আমি মুসলমানদের সঙ্গে মিশতে চাই, তাদের একজন হতে চাই।" আজাদ

হিন্দু ফৌজে তাঁর বিশ্বস্ত সেনানীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মুসলমান—শাহ নওয়াজ, আবিদ হাসান, হবিবুর রহমান প্রমুখ। মান্দালয় জেল থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লীর শেষ সুলতান বাহাদুর শাহ জাফর-এর সমাধিস্থলে, তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন প্রচেষ্টা প্রভাবিত হয়েছিল তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান দ্বারা এবং এই অবস্থানই এনে দিয়েছিল নানা অসঙ্গতি। তবে অস্বীকার করা যায় না বাংলার সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চরম পর্বে সুভাষচন্দ্রই ছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উজ্জ্বল প্রতীক।

সূত্র নির্দেশ ঃ

1. রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৯০) পৃঃ ২৬৭
2. ঐ, পৃঃ ৬৫৯
৩. সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ স্মৃতি (কলিকাতা, ১৯৭০) পৃঃ ২১০—২১৪
—Nirad C. Chaudhuri, Thy Hand great Anarch (London 1989) p 468-469.
৪. Shila Sen, Muslim Politics in Bengal, 1937-1947 (New Delhi 1976)
—J. H. Broomfield, Elite Conflict in a plural Society Twentieth Century Bengal (Bombay 1968)
—Partha Chatterjee, Bengal 1920-'947. The Land Question (Calcutta 1984)
—Joya Chatterjee, Bengal divided, Hindu Communalism and Partition 1932-1947 (New Delhi 1995)
৫. সুভাষচন্দ্র বসু, সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকতা ১৯৮৩) পৃ ২
৬. ঐ পৃঃ ৪.
৭. ঐ পৃ ১০
৮. Nirad C. Chaudhuri pp 478—487
৯. সত্যব্রত দত্ত, বাংলার বিধানসভা ও সংসদীয় রাজনীতি ১৮৬২—১৯৫১ (কলিকাতা ১৯৯৫) পৃঃ ১০৯-১১০
১০. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা ১৯৭৩) পৃঃ ১৬৬

গান্ধী-সুভাষ বৈপরীত্য ও বিরোধের সন্ধানে

গৌতম নিয়োগী

আগামী বছর ১৯৯৭-তে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা-বিরোধি মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যলাভের যেমন পঞ্চাশবছর পূর্তি, তেমনি 'দেশনায়ক' নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুরও জন্মশতবার্ষিকী। এই দুই উপলক্ষকে কেন্দ্র করেই বর্তমান প্রবন্ধটির অবতারণা, যার লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান দুই ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের বৈপরীত্য ও বিরোধের সন্ধান। কোন ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়েও এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে—অর্থাৎ যা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ-পর্ব, সেই কালসীমায়—পূর্ণাঙ্গ, তথ্যঋদ্ধ এবং যুক্তি-গ্রাহ্য আলোচনা ঐতিহাসিকরা খুব বেশি করেননি, যদিও সাধারণ অনেক ইতিহাস বই, স্মৃতিকথা বা জীবনীতে বিষয়টি উল্লিখিত।

আধুনিকমনস্ক, নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ ইতিহাসচর্চায় একথা অধুনা স্বীকৃতি পেয়েছে যে, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য অর্থাৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ কোন একক দল, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা ব্যক্তির প্রচেষ্টার ফলে হয়নি, বরং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল নানা ধারা, উপধারা।[১] কম বা বেশি এই সব ধারার সামগ্রিক প্রয়াসের ফলেই বহু রক্ত ঘাম অশ্রু ঝরিয়ে শেষ পর্যন্ত পর্ব পর্বান্তরে চরম মুহূর্তে এসে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। তেমনি ভারতে জাতীয়তাবাদের রূপ, তার উদ্ভব ও প্রসারের ইতিহাস কোন স্বয়ম্ভু, একক বা একমাত্রিক 'মনোলিথিক' চরিত্রের বিষয়বস্তু নয়, তার মধ্যে একসঙ্গে বা সমান্তরালভাবে, বস্তুগত পটভূমিকায় বয়ে চলেছিল নানা স্রোত, যার প্রকৃতি কখনও নিখিল ভারতীয়, কখনও আঞ্চলিক। এই সব ধারা-উপধারার, ভারতীয় বা আঞ্চলিক উপজাতীয়তার, নানা পন্থা ও আদর্শে বিশ্বাসী নানান ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা শ্রেণীর মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। ফলে, সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি বা স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গণ-জাগরণের চাপে ও আন্দোলনের অভিঘাতে ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট, দেশ-ভাগের কলঙ্কচিহ্ন বুকে নিয়েও ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মহান আদর্শ, দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, বীরোচিত কর্মকাণ্ড এবং ঐতিহাসিক ভূমিকাকে আমরা চরম অবমাননা করব যদি

না প্রত্যেক ধারার প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি আমরা না দিই। অন্তত স্বাধীনতা-লাভের সুবর্ণজয়ন্তীর মুহূর্তে এই কাজ ভীষণ জরুরি। ঐতিহাসিকগণ একাজ না করলে ঢক্কানিনাদে আত্মপ্রচার বা অপপ্রচার কিংবা বিকৃতি চলতেই থাকবে সরকারি বা বেসরকারি প্রচেষ্টায়। ঘটা করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম করে বহু ব্যক্তিকে—যাঁদের অনেকেরই প্রকৃত দান আদৌ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়—তাদের পেনশন, অবৈতনিক রেল ভ্রমণ কিংবা তাম্রপত্র বিতরণের চেয়ে সঠিক মূল্যায়ন অনেক বেশি জরুরি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন কিংবা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা যে অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হয়েছে তার উদাহরণ কম নেই।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে মুক্তি সংগ্রামের উপর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন ডাইরক্টরেট অব অডিও ভিস্যুয়াল পাবলিসিটি; তাতে সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল। কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে এ খবর বেরিয়েছিল, আমরা চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী যে অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছিলেন তা যেমন অজ্ঞতা-প্রসূত, তেমনই হাস্যকর। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আলেখ্যগুলির মধ্যে গান্ধীর চিত্র ছিল ছ'টি, জওয়াহরলাল নেহরুর ষোলোটি এবং ইন্দিরা গান্ধীর ছাব্বিশটি। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এই ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে হয়েছিল জনমানসে, সকলে যে চুপ করে থাকার লোক নন, তার প্রমাণ পেলাম অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তকে, দু'বছরের মধ্যেই ১৯৮২-তে একটি চমৎকার বই প্রকাশ করতে দেখে।[২] সুবোধবাবু ইতিহাসবিদ নন। ইংরিজি সাহিত্যের প্রথিতযশা পণ্ডিত; ষাটের দশকের মাঝামাঝি যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন তিনি ইংরিজির বিভাগীয় প্রধান, ফলে প্রত্যক্ষ ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার মাস্টারমশাই। ডঃ সেনগুপ্ত শেকস্‌পীয়রের উপর বিশেষজ্ঞ, বাংলা ইংরিজি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা, লিখেছেন আত্মস্মৃতি। তাঁর সব মতের সঙ্গে সকলে একমত হবেন একথা ভাবার কোন কারণ নেই। তবে সকলেই মানবেন তিনি সাহসী মন্তব্য করতে পিছপা নন, জোরের সঙ্গে নিজের মত বা যা তাঁর কাছে সত্য তা প্রতিষ্ঠা করতে জানেন। আবার সুবোধবাবু জীবনে কোনদিন বামপন্থী রাজনীতি করেছেন বা বামপন্থী ছিলেন এমন কথাও শুনিনি। উপযুক্ত গ্রন্থটির তিনি নাম দিয়েছিলেন

India Wrests Freedom এবং ঐ গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে একদা কংগ্রেস সভাপতি, গান্ধীপন্থী ও সুপণ্ডিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের *India Wins Freedom* শিরোনামের 'counterblast' হিসেবেই তাঁর বইয়ের টাইটেল। কেন? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যেখানে, কালপরম্পরায়, আবেদন নিবেদন, স্মারকলিপি পেশ, আলাপ-আলোচনা, আপস, বক্তৃতা, কারাবরণ এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, জাতীয় বিপ্লবীরা বা সুভাষচন্দ্র বসু সেখানে গিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, আত্মোৎসর্গ, নিঃশেষে প্রাণ দেওয়ার রক্তঝরা পথে। সভ্য ভাষায় বলা চলে, কংগ্রেস চেয়েছে স্বাধীনতা অর্জন করতে বা লাভ করতে, বিপ্লবীরা চেয়েছেন স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে। গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বৈপরীত্য তথা বিরোধের মূল এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার মধ্যেই নিহিত।

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায় থেকে একটি অংশ উদ্ধার করি তার মূল ইংরিজিতেই ঃ৩

> But I have claimed that the two greatest figures in the history of the Indian National Congress are Mohandas Karamchand Gandhi and Subhaschandra Bose. *Yet no two men could be more unlike.* Mahatmaji started as a loyalist and a co-operator who was forced by circumstances to tread the path of Satyagraha or passive resistance. Subhaschandra, on the other hand, was temperamentally a revolutionary.

এই দাবি আমি একটু সংশোধন করে নিতে চাই। গান্ধী-সুভাষ নিঃসন্দেহে দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, তবে তা শুধুমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের বলা ঠিক নয়, ১৯৩৯ এর শেষ দিক থেকে সুভাষের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ক্ষীণ। গান্ধী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, সত্যাগ্রহ বা অহিংসার পূজারী হলেও আন্দোলন বিমুখ নন। অন্তত 'ভারত ছাড়ো' পর্বে তাঁর ভূমিকা সেই সাক্ষ্য দেয়। তবে সুভাষ-চন্দ্র বা বিপ্লবীগণ প্রয়োজনে সহিংস সশস্ত্র পথে এবং সম্ভব হলে বলপূর্বক লড়াইয়ে বিশ্বাসী। গান্ধী বা গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে আলোচনার বিশ্বাসী, এমনকি আস্থা স্থাপনেও। ক্ষমতার খণ্ডিত

অংশে তাদের আপত্তি ছিল না বলে দীর্ঘকাল তারা 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' পেলেই খুশি হতেন, জানিয়েছেন। অপর পক্ষে, বিপ্লবীরা এবং সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সবচেয়ে বড় কথা, এই মৌলিক পার্থক্য শুধু পথের বা আদর্শের নয়, মানস-প্রকৃতির ও দৃষ্টিভঙ্গির। সেই ভিন্নতা, বৈপরীত্য এবং ফলত বিরোধের কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব এই প্রবন্ধে।

ভূমিকায় আরও দু'-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। সুবোধবাবুর বইতে বিধৃত 'মহাত্মাজী' বনাম 'নেতাজী'কে প্রতিপাদ্য ধরে তার যাথার্থ্য যাচাইয়ের চেষ্টা করেছি প্রবন্ধের সীমায়িত পরিসরের মধ্যে। সম্প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা দিক বিষয়ক প্রচুর গবেষণাকর্ম বা দলিল-নথি প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি সুবোধ-বাবু ব্যবহার করেননি, তার সাহায্য নিতে হয়েছে অকৃপণভাবে। এই বিপুল তথ্যের অরণ্যে হারিয়ে না গিয়ে সেগুলি সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণাত্মক সূত্রায়ণের প্রয়াস পেয়েছে। ব্যবহার করেছি বহু প্রাথমিক উপকরণ/এবং প্রয়োজনে স্বীকৃতি, টীকা ও তথ্যসূত্র নির্দেশ করেছি। নতুবা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস-চর্চায় সচরাচর যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় অর্থাৎ নেতাদের কাজকর্ম, আদর্শ বা উপদলীয় কূটকৌশলের উপর আলোচনা নিবন্ধ রাখা, তা আমার মনঃপূত নয়। বরং গণ আন্দোলনের বিষয়ে আমার নিজের যে গবেষণায় আগ্রহ তার আলোকে নিচু বা তলা থেকে ইতিহাসের সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখা দরকার মনে করি। তাই ঘটনাবহুল দশ বছরের (১৯৩৭—৪৭ খ্রিঃ) কিছু বিশেষ ঝোঁক, প্রবণতা ও কর্মের উপর বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব, গান্ধী-সুভাষ বৈপরীত্যের সন্ধানে।

দুই

গান্ধী-সুভাষের বিরোধ তীব্র আকার নেয় ১৯৩৭ এর পর থেকে বিশেষত ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর। এ বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালিদের ধারণা আছেই, আধুনিক গবেষকগণও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৪] দক্ষিণপন্থীদের দয়ায় সভাপতি না হয়ে দ্বিতীয়বার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গান্ধীপন্থী অন্ধ্রের পট্টভি সীতারামায়াকে হারিয়ে দেওয়ার পর ১৯৩৯ এর ৩১ জানুয়ারি গান্ধীর সেই নাটুকেপনাপূর্ণ উক্তি আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর হাস্যকর মনে হয়। 'After all, Subhasbabu is not an enemy of the country. He has suffered for it"—কথাটিতে আধুনিক প্রজন্ম

বলতেই পারে, হ্যাঁ suffer তো করেছেনই, চরখার মাধ্যমে দেশমুক্তির স্বপ্নের বদলে সংঘর্ষ চাইলে-আত্ম-বলিদান তো দিতেই হয়। কথাটিতে যদি ক্রোধের প্রকাশ বলে পাঠক-পাঠিকগণ মনে করেন, তাই সবিনয়ে জানাই শুধু পরোক্ষে সুভাষবিরোধিতা করেই গান্ধী ক্ষান্ত হননি, তাঁকে একেবারে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। সাম্রাজ্যবাদী সরকারও বামপন্থীদের পতনে খুশি। তাই জেটল্যাণ্ডকে লেখা এক চিঠিতে লর্ড লিনলিথগো-কে লিখতে দেখি "Mahatma took the opportunity to pull him to pieces and leave him in no doubt whatever as to what he thought of him on all points."।[৫] সত্যের পূজারীর এরকম আচরণ আরও অনেক পরে আলোচনায় দেখব। অথচ, বিপরীতপক্ষে, শ্রদ্ধাবনত সুভাষের মুখে গান্ধী সম্পর্কে আমরা শুনি অবিস্মরণীয় অভিধা : জাতির জনক।

তবে বিরোধ বা বৈপরীত্য ১৯৩৭ থেকে হঠাৎ শুরু হয়নি, তা ছিল প্রথমাবধি। সেই কারণে পটভূমিস্বরূপ গোড়ার কথা একটু বলে নেওয়া দরকার। ১৯৩৭ থেকে সুভাষচন্দ্র যেখানে সর্বশক্তি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিলেন, সেখানে গান্ধীর কংগ্রেস ও তার মধ্যে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী হিংসা, দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অজুহাতে চাইছিল সরকারের সঙ্গে আলোচনা বা আপস। গান্ধী-সুভাষ মানসপ্রকৃতির প্রথম পার্থক্যই মনে হয় আলোচনা-আপস-লক্ষ্যপূরণ বনাম সংগ্রাম, ছিনিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগত পার্থক্য।

গান্ধী-সুভাষের বৈপরীত্য ও বিরোধের সন্ধানে খুঁটিয়ে তথ্যগুলি বিচার করে খোলা মনে ও আবেগহীন নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে সিদ্ধান্ত নিলে দেখা যায় এই বিরোধ নিছক ব্যক্তিগত নয়। শুধু মনস্তত্ত্ব দিয়ে এর ব্যাখ্যা করলে সরলীকরণের পথ নেওয়া হবে না কি? বরং অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী যখন বলেন...গান্ধী-সুভাষ বিরোধ প্রসঙ্গে আমাদের শুধু পারিবারিক মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব বা মেজাজের পার্থক্য, শিক্ষার হেরফের ইত্যাদি ভাবলেই চলবে না, ভাবতে হবে পরিবর্তনশীল বৈদেশিক পরিস্থিতির কথা, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের কথা, মত ও পথ নিয়ে পার্থক্যের কথা, ভারতীয় ও আঞ্চলিক তারতম্যের কথা"[৬]—তখন তা মেনে নিতে দ্বিধা নেই। বস্তুত গান্ধী—সুভাষ বৈপরীত্য ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক, নীতিগত ও সাংগঠনিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিগত এই তিন দিক থেকেই বিচার্য। এই মত ও পথের অমিল বহু দিনের। স্বভাব ও মেজাজ

তাদের সম্পর্ককে যেমন নিয়ন্ত্রণ করেছে, তেমনি পরিস্থিতির। সে বিষয়ে এবার দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

এরিক এরিকসন যেভাবে 'গান্ধীর সত্য' খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন, তা দিয়ে কোন রাজনৈতিক নেতার আদর্শ বা কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ হয় না ঠিকই এবং আগের অনুচ্ছেদেই আমরা শুধু মনস্তত্ত্ব নিয়ে ব্যক্তিত্বের সংঘাতের বিশ্লেষণ করলে তা অসম্পূর্ণ বা অতিসরলীকরণ হয়ে যাবে বলেছি ঠিকই, তবে অন্যদিকে একথাও ঠিক মনস্তত্ত্ব বাদও দেওয়া চলে না। গান্ধী-সুভাষ মনস্তত্ত্ব বা মানসপ্রকৃতিই ভিন্ন একথাও কি অস্বীকার করা যায়? যদি না যায়, তবে সেদিকে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। একটি প্রবন্ধের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা বা বিষয়টির প্রতি সুবিচার করা যায় না, এ-কথা মনে রেখে দু-চার কথা বলা দরকার।

প্রথমত, সুভাষচন্দ্র তার আত্মজীবনীর শেষ পংক্তিতে লিখেছেন, 'Reality therefore, is Spirit, the essence of which is Love, gradually unfolding itself in *an eternal play of conflicting forces* and their solutions'।[৭] অর্থাৎ জীবন জটিল এবং এই জটিলতার অন্যতম কারণ দ্বন্দ্ব; দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সমাজজীবনে ও ব্যক্তিজীবনের মূল 'স্পিরিট'টির মর্মকথা মৈত্রী, যাকে পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বে উন্মোচিত ও সমাধান করতে হয়। এই স্পিরিট কথাটির বাস্তবতা গান্ধিও স্বীকার করেন, এই 'স্পিরিট' শব্দটির অর্থ চেতনা, বোধ, মর্মবাণী যাই হোক না কেন গান্ধির সঙ্গে সুভাষের সর্বপ্রধান পার্থক্য হল গান্ধি ঐ চৈতন্যে মৈত্রীই আদর্শ মানলেও দ্বন্দ্ব মানেন না। দ্বিতীয়ত, সমাজ ও সভ্যতার প্রক্রিয়ায় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া গান্ধি মানতেন না, সুভাষ মানতেন। কেন সুভাষ মানতেন তার কারণ অন্তত দুটো বলে আমার মনে হয়। কলকাতা এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুভাষচন্দ্র ছিলেন দর্শনের তন্নিষ্ঠ ছাত্র। বিবর্তনবাদ জানতেন। তার উপর জার্মান দার্শনিক হেগেল-এর প্রভাব এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে আগে মনে আসে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদও পড়েননি তা নয়। বস্তুবাদকে তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। অপরদিকে গান্ধি, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ঠিকই লিখেছেন, 'lived his philosophy rather than deduce it from book'। তাঁরা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছেন, যেমন রাসকিন, থরো কিংবা তলস্তয়, তাঁরা 'were morallsts rather than professional philosophers'।[৮] আরও বলা যায়, গান্ধি

ব্যারিস্টার ঠিকই তবে সুভাষের মতন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বা কেম্ব্রিজের মতো প্রতিষ্ঠানে তিনি কখনো পড়েননি; উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় রেনেশাঁস ও ভাবজগতে বা মূল্যবোধে পরিবর্তনের প্রভাব সুভাষের মতন তাঁর উপর পড়েনি। ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্বে দীর্ঘকাল বাঙালি সমাজে চলতে থাকার পরবর্তী প্রজন্মের ফসল সুভাষচন্দ্র।

তৃতীয়ত, সুভাষচন্দ্র মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু গান্ধি কি তাই? এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাববার অবকাশ আছে। সুবোধচন্দ্র লিখেছেন, 'Mahatmaji was the greatest figure in the political life of India, but he was not a poiitician at all.'[৯] এটা একটু বাড়াবাড়ি। তাঁকে আদৌ রাজনীতিবিদ বলা যাবে না এটা কি ঠিক? তিনি পুরোপুরি সন্ন্যাসীও না। মনে হয়, 'আমার জীবনই আমার বাণী' যিনি বলেন, অভিজ্ঞতা ও আচরণের মধ্য দিয়ে যিনি সত্যের সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তিনি মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। এখানেই সুভাষের সঙ্গে তফাত। গান্ধির মূল প্রেরণা নৈতিক, যার অনুষঙ্গে ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা সবই এসে যায়।

চতুর্থত, ইডিওলজির মধ্যে দর্শন ও আদর্শ যেমন জড়িত, তেমনই মানস-প্রকৃতির সঙ্গেও তার সম্বন্ধ নিবিড়। সত্যের কাছে 'অন্তরের আলো'-পাওয়া গান্ধি তাই end দিয়ে means কে justify করতে পারেন না। সুভাষ আবার সেক্ষেত্রে অনেকটাই ম্যাকিয়াভেলিপন্থী। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মার্গের পথিক গান্ধি যতখানি জোর দেন righteousness, morality, justice এবং truth এর উপর, সুভাষের কাছে তা বড় নয়। স্বরাজ চান দুজনেই। গান্ধী স্বরাজ বলতে বোঝেন মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মৈত্রী বজায় রেখে শান্তি, অহিংসা ও সামাজিক কল্যাণে জীবনযাপন। সুভাষচন্দ্র স্বরাজ মানে বোঝেন মুক্তি। ১৯২৯-এর ১৯ অক্টোবর লাহোরে ছাত্র সম্মেলনে বক্তৃতায় তিনি মুক্তি ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

> 'This freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequalities and destruction of communalism and religious intolerance.'[১০]

সন্ত গান্ধির রামরাজ্য যেখানে অতীতাশ্রয়ী, সুভাষচন্দ্রের মুক্তি সেখানে আধুনিক।

পঞ্চমত, বৈদান্তিক নিরাসক্তির সঙ্গে ক্ষাত্রিয়সুলভ তেজ সুভাষ যাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তার মধ্যে সর্বাগ্রে স্বামী বিবেকানন্দের নাম করা দরকার। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েও বীর, তিনি একদিকে যেমন ভারতের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্গতির জন্য জীবে প্রেম করতে উপদেশ দেন, তেমনি ইংরেজদের শাসন ও শোষণ সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা ছিল। সেই সঙ্গে ভারতীয় কূপমণ্ডূকতা, জাতিভেদ, ছুৎমার্গ, নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা, দৌর্বল্য ইত্যাদি তাঁর নজর এড়ায়নি। ফলে রাজনীতি বা বস্তুবাদ, যা পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য, তার সঙ্গে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার, বৈদান্তিক মস্তিষ্কের সঙ্গে ইসলামীয় দেহের মিলনের কথা বলেন। বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য সুভাষ জানেন ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও আর্তির কারণ ইংরেজ শাসন ও সাম্রাজ্যবাদ। তাকে উচ্ছেদ করতে হলে রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম প্রয়োজন, আর তার জন্য গান্ধীবাদী অহিংস সত্যাগ্রহ বা বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ নয়। চাই সশস্ত্র বিপ্লব। তাই গান্ধি-সুভাষ বৈপরীত্য।

মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যক্তি পার্থক্যের কথাটি এবার গুটিয়ে আনা যাক। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ যে হাত ধরে চলে, আধ্যাত্মিক হৃদয় পরিবর্তনে যে বাস্তব পরাধীনতার মুক্তি নেই, জাতীয়তাবাদকে অগ্রাধিকার দিয়েও সমাজতন্ত্রের কথা ভুললে চলবে না—এসব কথা যুক্তি দিয়ে বুঝতেন জওয়াহরলাল নেহরু-ও। কিন্তু গান্ধির প্রভাবমণ্ডল থেকে কার্যক্ষেত্রে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি, যা পেরেছিলেন সুভাষচন্দ্র, তার মৌলিক পার্থক্যজনিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই। মুক্তিকামী সুভাষ বাস্তববাদী আবার আবেগ প্রবণ, নিজেই বলেছেন সবরমতী বা পণ্ডিচেরী কারুর নির্দেশই তিনি বেদবাক্য মনে করেন না, শ্রমিক মুক্তির ক্ষেত্রে রুশ নির্দেশও নয়। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইয়ে আমরা (প্রথম খণ্ডে) অনেক অপরিণত চিন্তার ছাপ পাই। একদা সুভাষ সাম্যবাদ ও নাৎসীবাদের সমন্বয়ের কথা বললেও, পরে মতের বদল হয়।[১১] রজনীপাম দত্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ১৯৩৮-এ পৌঁছে সুভাষচন্দ্র প্রথমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও পরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এই দুই বিষয়ে জোর দেন।[১২] শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, সুসংহত শক্তিমান দল, সামরিক শৃঙ্খলা তিনি চাইতেন ঠিকই, তবে ঐ দল বা সরকারের লক্ষ্য অবশ্যই সকলের জন্য ন্যায় ও জনগণের মুক্তি।[১৩] গান্ধীর সঙ্গে তফাতও তিনি স্পষ্ট করে বলেন। ১৯৩৫-এর ৩ এপ্রিল তার সঙ্গে রমাঁ রল্যাঁর

সাক্ষাৎকারের বিবরণে পাই : 'non-violence cannot be the central pivot of our entire social activity.'[১৪]

তিন

গান্ধির যেমন নিজস্ব এক অসাধারণ মোহনীয় যাদু ছিল তার নির্দেশ কিংবা অঙ্গুলী হেলনে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ত, জাতীয় আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করার পিছনে যার ভূমিকা খাটো করে দেখার প্রশ্নই ওঠে না, তেমনি সুভাষচন্দ্রেরও গড়ে ওঠে একটা charisma যা বাঙালি ভদ্রলোকদের মানসিকতা ও আবেগের সঙ্গে মিলে যায় বলেই তাদের প্রবলভাবে আন্দোলিত করে।

আমেরিকান ঐতিহাসিক জন ব্রুমফিল্ড এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : 'He encouraged their elite acivist, philosophy of politics, and offered it a purpose in a catchword 'Socialism', which he was careful never to difinc. He applauded heroic acts of violence—the glory of self immolation for the nation—and he provided paramilitary organssation and parades to appeal to the Hindu bhadralok's romantic militarism.'[১৫]

সুভাষের এই ভাবমূর্তি বাঙালিদের মধ্যে উজ্জ্বলতর হয় গান্ধি-বিরোধিতার ফলেই, কারণ গান্ধিবাদ বাংলার মাটিতে কোনো কালে তেমন ফসল ফলাতে পারেনি।[১৬] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে উপমার সাহায্যে তুলনা করেছেন 'উদ্যত খড়্গ' বলে। সেই খড়্গে ঝলসে উঠছে উনিশ শতকীয় রেনেশাঁসের আলোকদীপ্ত বাঙালির গর্ব আর বিশ শতকীয় সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বাঙালির অভিমান।

সুভাষচন্দ্র রাজনীতিতে যোগ দেন ১৯২১-এর জুলাই মাসে বিলেত থেকে ফেরার পরে, আর গান্ধি ছ'বছর আগেই, ১৯১৫-তে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে রাজনৈতিক মঞ্চে ধীরে ধীরে উঠে এসেছেন পাদপ্রদীপের সামনে।[১৭] আমরা এখন ১৯২১ থেকে ১৯৩৯ পর্বে গান্ধি-সুভাষ বিরোধিতার প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি।

জাহাজে ইংল্যান্ড থেকে বোম্বাইতে পা রেখেই ১৯২১-এর জুলাই মাসে চব্বিশ বছরের তরুণ, আই. সি. এস. ছেড়ে দেওয়া সুভাষ, অসহযোগ আন্দোলনের

মধ্যজোয়ারে দেখা করলেন গান্ধির সঙ্গে। স্বাধীনতা আনয়নের ব্যাপারে, সত্যাগ্রহের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনায় সুভাষ সন্তুষ্ট হলেন না। পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে বিশ্বাসী সুভাষের পক্ষে হৃদয় পরিবর্তনে বিশ্বাস না থাকারই কথা। তাঁর মনে হয়েছিল গান্ধীর পরিকল্পনার মধ্যে 'a deplorable lack of clarity' রয়েছে।[১৮] সহযোগিতা করি আর না করি, সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিস্পর্ধা জানাতে গেলে করতে হবে প্রত্যাঘাত। তার জন্য বিপ্লবী সুভাষের মন গড়ে উঠল। বিপ্লববাদের প্রেরণা তাঁর মনে ছিল। বাংলায় এসে পেলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্ব, স্নেহ ও সাহায্য। দেশবন্ধুর মৃত্যুহীন প্রাণ দান করে দেওয়ার ঘটনার সময় (১৯২৫) সুভাষ বার্মাতে মান্দালয় জেলে বন্দী, সেখানেই খবর পেলেন। ১৯২৫-এর আগেই তিনি স্থির করে ফেলেন ব্রিটিশ শাসনের মূলোচ্ছেদ চাই, যে-কোন উপায়ে।[১৯]

বাংলার মাটি যে দুর্জয় ঘাঁটি তা গান্ধি বুঝেছিলেন।[২০] এই কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে সংশয়াতীত আধিপত্য তাঁর কোনো কালেই ছিল না। এর একটি কারণ যদি হয় দেশবন্ধু ও তার স্বরাজ্য দলের প্রভাব, তাহলে দ্বিতীয় কারণ বিপ্লবী কর্মতৎপরতা। 'বিজলি', 'শঙ্খ', 'প্রবর্তক', 'বঙ্গবাণী', 'বসুমতী', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায় তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। বিপ্লবীদের সঙ্গত কারণে অশ্রদ্ধা ক্রোধে রূপান্তরিত হয় গোপীনাথ সাহা সম্পর্কিত বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব এ. আই. সি. সি. বাতিল করায়। গান্ধির বিপ্লববাদ বিরোধিতা সুবিদিত। তাঁর কাছে গ্রহণীয় না হতেই পারে, সকলের কাছেই কি তাই? হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সুবিখ্যাত পুস্তিকা *The Philosophy of the Bomb* যে ইতিবাচক দর্শন আছে তা গান্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু বাংলার মানসিকতা তাতে প্রতিফলিত।[২১] তৃতীয় কারণ ১৯২০-এর পর থেকে বামপন্থী গণ আন্দোলনের প্রসার।[২২] চতুর্থ কারণ, গান্ধির ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর চাপের কাছে নতিস্বীকার।[২৩] শেষ কারণ অবশ্যই সুভাষচন্দ্র বসু।

চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতি বুদ্ধিগত ও আবেগপূর্ণ আনুগত্য এবং বিপ্লবী ধ্যানধারণার প্রতি সমর্থন ছাড়াও তারুণ্যের দীপ্তি, দেশের কাজে স্বার্থত্যাগ, বারবার কারাবরণ, প্রশাসনিক দক্ষতা, উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ সুভাষকে বাংলায় জনপ্রিয় করে তোলে। সুভাষবিরোধী গান্ধি বাংলায় তাই আমল পাননি, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী বলে। 'দেশপ্রিয়' বা 'দেশপ্রাণ' কেউই 'দেশবন্ধু' নন,

সুভাষের মতন জননায়কও নন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ও সুভাষের কারাগারে থাকার সুযোগে গান্ধী চেষ্টা করলেও সুভাষবিরোধী কোনো নেতাকে অবিসংবাদিত প্রতিপন্ন করতে পারেননি।

গান্ধির কাছে গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্র ছিল গ্রাম, চিত্তরঞ্জনের কাছে লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও করপোরেশন। রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বেশি। আইন সভায় বা কাউন্সিলে ঢোকা নিয়ে তখনকার তর্ক আমাদের আলোচ্য নয়, শুধু বলার এই যে ১৯২৪-এ দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনে জয়লাভের পর নিজে মেয়র ও সুভাষকে প্রধান কার্যনির্বাহিক করার পর যারা সুভাষবিরোধী ছিলেন তাদের গান্ধি কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্গীয় কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার নেওয়ার পিছনে কুড়ির দশক থেকে গান্ধি-পন্থী ও পরে গান্ধি-সুভাষ বৈপরীত্য কম দায়ী নয়।

দলাদলি ও বিভেদ প্রবণতা শুধু কংগ্রেসে ছিল ভাবলে ভুল হবে। ছিল নানা বিপ্লবী গোষ্ঠীর মধ্যেও। বাংলায় নানা গোষ্ঠী নানা ব্যক্তির ও সংগঠনের পিছনে থাকলেও সমস্ত বিপ্লবীরা গান্ধি ও তাঁর প্রভাবে নিখিল ভারত কংগ্রেস নেতৃত্বও বিপ্লববাদ বিরোধী। প্রথম দলের পথ সংগ্রাম। শেষের দলের পথ আলাপ-আলোচনা ও আপস। গান্ধি ও তাঁর প্রভাবে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বহুদিন পর্যন্ত চাইছেন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস', যেন এটা পেয়ে গেলেই ভারতবাসী হাতে চাঁদ পেয়ে যাবে আর কুড়ির দশক থেকেই যখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন জোরদার হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি হচ্ছে কঠোর, তখন থেকেই জাতীয় বিপ্লবীরা, কমিউনিস্টরা এবং কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যালঘু অথচ তরুণ গোষ্ঠী চাইছেন পূর্ণ স্বরাজ। কংগ্রেসের এই complete independence বা 'পূর্ণ স্বরাজ' পন্থীদের মধ্যে ছিলেন জওয়াহরলাল নেহরু। তবে প্রথম নাম অবশ্যই সুভাষ।

তারুণ্যের দীপ্ত প্রতিমূর্তি সুভাষ। সশস্ত্র বৈপ্লবিক পন্থায় বিশ্বাসী সুভাষ, সমাজতন্ত্রী সুভাষ, পূর্ণ স্বরাজপন্থী সুভাষ, সব মিলে যে ভাবমূর্তি তাঁকে বাংলায় এবং অনেকাংশে সারা ভারতে উজ্জ্বলতর করে তা সুভাষচন্দ্র বসুর গান্ধি-নীতি বিরোধিতার মূল হল। লক্ষ করবেন, ১৯২৭ (মাদ্রাজ), ১৯২৮ (কলকাতা), ১৯২৯ (লাহোর), ১৯৩১ (করাচী)-এর কংগ্রেস অধিবেশন। সুভাষ স্থির, গান্ধি দোদুল্যমান ১৯২৭-৩১ পর্বে। চার বছর বন্দী থাকার পর মুক্ত সুভাষ

ডাঃ আনসারির সভাপতিত্বে মাদ্রাজে কংগ্রেসে অন্যতম সম্পাদক হন। জওয়াহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে প্রস্তাব তোলেন। গান্ধি পরে বললেন প্রস্তাবটি 'had been hostily conceived and thoughtlessly passed'।[২৪] মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধি ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের উপর প্রস্তাব আনেন। গান্ধিজি ও কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দের প্রতি অকুন্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে মতবাদের ভিন্নতার জন্য অপূর্ব সৌজন্যসিদ্ধ অথচ সুদৃঢ় ভাষায় পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে সংশোধনী আনেন সুভাষ। ব্যালট ভোটে ১৩৫০—৯৭০ পার্থক্যে গান্ধির মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। ক্ষুব্ধ সুভাষ পরে লিখেছেন, 'But the vote conld hardly be called a free one as the followers of Gandhi made it a question of confidence and gave out that if Gandhi was defeated he would retire from the Congress.'[২৫] এ তো মানসিক ব্ল্যাকমেল, এই পন্থা গান্ধি ও তাঁর চেলারা অনেকবার নিয়েছেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য জওহরলালের সভাপতিত্বে লাহোর অধিবেশন পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে মেনে নেয়।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন 'Like the pendulam of a clock Gandhi's interpetation of Swaraj was moving between Dominion Status and Complete Independence'।[২৬] শুধু-পূর্ণ স্বরাজ নিয়েই নয়, বহু ব্যাপারেই তফাত দেখি। সব ঘটনা ও তথ্য দিতে গেলে বই লিখতে হয়, প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। তবু না বললে রচনার অঙ্গহানি হবে যে, আইন অমান্য আন্দোলন, সুভাষের মতে, ১৯৩০-তে অযথা সময় নষ্ট করে দেরিতে শুরু করা হয়েছে, তা ঠিক হত সাইমন কমিশন বিরোধী দেশব্যাপী আন্দোলনের সময়।[২৭] অথবা সামরিক পোশাকে সজ্জিত কলকাতা অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G. O. C.) সুভাষকে গান্ধীর অপছন্দের কথা।[২৮] গোলটেবিল বৈঠকের ধাপ্পাবাজী ও ব্রিটিশের চুম্বন ও পদাঘাত নীতি গান্ধি বুঝতে পারেননি, নতুবা তাঁকে খালি হাতে বিলেত থেকে ফিরে আসতে হত না। বরং শূন্যগর্ভ আরউইনের সঙ্গে চুক্তি (১৯৩১), পুনায় আম্বেদকরের সঙ্গে চুক্তি (১৯৩২), ধুরন্ধর ব্রিটিশ শাসকদের সাম্প্রদায়িকতার বাঁটোয়ারা, স্বাধীনতা সংগ্রামকে অন্য পথে ঠেলে দেয়। এমনকি, বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে আইন অমান্য অভিযান দাণ্ডিতে লবণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে শুরু করে, পরে বন্ধ রেখে

আবার শুরু করে শেষ পর্যন্ত কি হল? সুভাষচন্দ্র জানতেন গোলটেবিলে কিছুই হবে না, আইন অমান্য আন্দোলনও ব্যর্থ হতে চলেছে। বরং দমননীতি, হিজলির হত্যাকাণ্ড বা ভগৎ সিংদের ফাঁসি দিয়ে যারা বায়ু বিষিয়ে তুলেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমা বা ভালবাসার নীতি কি নেওয়া যায়? এই 'প্রশ্ন' শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, সুভাষের, সমগ্র ভারতের প্রতিবাদি বিপ্লবী কণ্ঠের।

এবার ১৯৩১-৩৭ পর্বের দিকে তাকাই। অসুস্থতার জন্য ভিয়েনা যাত্রা (১৯৩৩), পিতার অসুস্থতার জন্য দেশে প্রত্যাবর্তন (ডিসেম্বর ১৯৩৪), আবার ইয়োরোপ যাত্রা (জানুয়ারি ১৯৩৫), ভারতে ফেরা (এপ্রিল ১৯৩৬), গ্রেপ্তার ও অবশেষে মুক্তি (মার্চ ১৯৩৭)—সুভাষের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন। ইয়োরোপেও গান্ধীর কঠোর সমালোচক সুভাষ, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন কুর্তি।[২৯] বাংলায়ও গান্ধীর প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।[৩০] বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী, সুভাষের ধাঁচের অথচ নিজের মতই দোদুল্যমান, তাঁর প্রভাবের বাইরে যেতে অপারগ, পণ্ডিত জওহরলালকে ১৯৩৬ এ লক্ষ্নৌ অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি করার পিছনে কি গান্ধীর মনে বামপন্থী, বিপ্লবীবাদী বা তরুণসমাজের জনপ্রিয়তার পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়ার কথা মনে ছিল না?

তিরিশের দশকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, দুই গোষ্ঠীবিভাগ ব্যাপকতর হয়ে ওঠে যার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আরউইন, উইলিংডন, লিনলিথগো এই তিন ভাইসরয় পর-পর এসেছিলেন, তাঁরা কি চুপ করেছিলেন? ব্রিটিশ শাসকদের দলিল-পত্র, চিঠি, ব্যক্তিগত কাগজপত্র ইত্যাদি এখন লভ্য, সেসব সূত্র থেকে দেখানো যায় যে বিবাদে তারা উৎফুল্ল, কংগ্রেসের মধ্যে ডান-বাম নয় বিভেদের বীজ সৃষ্টি করতে তারা সিদ্ধহস্ত, হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের বা অন্য ভাষায় হিন্দু কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের ভিন্ন স্বার্থ প্রতিপন্ন করিয়ে মদত দেওয়া, ভারতীয় বণিক শ্রেণীর সাহায্য পাওয়া অনেক কিছুই ঘটেছিল। সুভাষ-চন্দ্র বসুকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা 'সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু' মনে করত, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'His Majesty's most seditious subject' লিখে ভুল করেননি।[৩১] লণ্ডনে ভারত-সচিব জেটল্যাণ্ডকে লেখা বড়লাট লিনলিথগোর ১৯৩৯ এর ৩১শে জানুয়ারি কিংবা ২৮ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে লক্ষ করি যে শাসককুল গান্ধী-সুভাষ বিরোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, সম্ভবত গান্ধী কর্তৃক সুভাষকে খতম (to pull him to pieces) করে দেওয়াতে তারা খুশি।[৩২]

চার

এবার গান্ধী-সুভাষ বিরোধের চূড়ান্ত পর্ব, অর্থাৎ ১৯৩৭—১৯৪০ সময়কালের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধী সুভাষ সম্পূর্ণ দুই মেরুতে। ১৯৩৯ এ দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার ছ'মাসের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছে, সুভাষের শাসনে একদিকে বামশক্তির সংহতিসাধন ও তীব্রতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলা, এই দুই লক্ষ্য। ১৯৪১ এর জানুয়ারিতে ভারত থেকে 'মহানিষ্ক্রমণ', তারপর গান্ধীর মনেও অন্য প্রতিক্রিয়া কিন্তু সে-কথা পরে। আপাতত, ঘটনাবহুল ১৯৩৭-৪০ এর দিকে তাকালে দেখতে পাই দেশ জুড়ে এক টানাপোড়েনের ছবি, কংগ্রেসের মধ্যে তো বটেই। তকমা এঁটে বা বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করে সবাইকে বা সব গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যায় না। তবু, গান্ধী এবং দক্ষিণপন্থীদের বৃহৎ বন্ধনীভুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আজাদ, সর্দার প্যাটেল, রাজা গোপালাচারি, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, সত্য মূর্তি, ভুলাভাই দেশাই, সরোজিনী নাইডু, আচার্য কৃপালনি, যমুনালাল বাজাজ প্রমুখ। আর বামপন্থী দলভুক্ত নরেন্দ্র দেব, অশোক মেহতা, মিনু মাসানি, অচ্যুত পট্টবর্ধন, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সহজানন্দ সরস্বতী, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ। জওয়াহরলাল নেহরু বামমার্গী, সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রবল আগ্রহ, গান্ধীর সঙ্গে অনেক ব্যাপারে পার্থক্য তৎসত্ত্বেও গান্ধীর নেতৃত্বে তাঁর অগাধ আস্থা। তেমনি জয়প্রকাশ নারায়ণ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের চাঁই দলের জন্মাবধি (১৯৩৪), দক্ষিণপন্থীদের ঘোর বিরোধী অথচ গান্ধীকে ছাড়তে নারাজ। আর সুভাষচন্দ্র? তিনি গান্ধী বিরোধী ও দক্ষিণপন্থা বিরোধী এক নম্বর বামনেতা, তাঁর পিছনে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য বামপন্থীরা তো আছেনই, আছেন প্রাক্তন জাতীয় বিপ্লবীরা এবং কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টরা রামগড় অধিবেশন পর্যন্ত (১৯৪০) কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন।

তিরিশের দশকের কংগ্রেসের টানাপোড়েনের ছবি পাওয়া যাবে ইতিহাসবিদ টমলিনসনের বইতে।[৩৩] এবং কিছু প্রবন্ধে।[৩৪] কংগ্রেসের 'অফিসিয়াল' ইতিহাস অপাংক্তেয় আগেও ছিল, এখনও তাই।[৩৫] বাংলাভাষাতেও গোপালচন্দ্র রায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কানাইলাল দত্ত প্রমুখের বই দেখা যেতে পারে, তবে সর্বশেষ বিস্তারিত আলোচনা অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর।[৩৬] উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ (১৯৩৬), মহারাষ্ট্রের ফৈজপুর (১৯৩৭), গুজরাটের হরিপুরা (১৯৩৮), মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরি (১৯৩৯) ও বিহারের রামগড় (১৯৪০)

—এই সব অধিবেশন যখন বসেছে তখন কংগ্রেসের মধ্যেই যে শুধু একটা ঘটনা ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব, গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে, তাই নয় দেশের অভ্যন্তরেও পরিস্থিতি দ্রুত বদল হচ্ছে। এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সাম্রাজ্যবাদ এবং মুক্তিসংগ্রাম উভয়ের উপরই পড়েছে। এমনকি, ঘটে চলেছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সুদূরপ্রসারী ঘটনা, হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। এই জটিল টানাপোড়েনের ইতিহাস ছাত্রছাত্রীদের কাছে অবশ্যজ্ঞাতব্য তবে বর্তমান প্রবন্ধে সেই সাতকাহন নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু গান্ধী সুভাষ বিরোধিতাতে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন প্রবর্তন, কংগ্রেস অনেক বিতর্কের পর নির্বাচনে অংশ নিতে ও ফেডারেশনে যোগ দিতে সম্মত হয়। ১৯৩৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেসের ফল হয় উল্লেখযোগ্য, এগারোটির মধ্যে ছটি প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ক্ষমতায় যাওয়া নিয়েও অনেক বিতর্ক হয় এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হয়। এই উভয় সম্মতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের চাপই জয়যুক্ত হয়। বামপন্থীদের চাপ কম ছিল না, সংহতির অভাব সত্ত্বেও। সুভাষ নিজেকে বামপন্থী গোষ্ঠীর প্রবক্তা হিসেবে তুলে ধরেন, গান্ধী দক্ষিণ-পন্থীদের। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ মুহূর্তে, ১৯৩৫-এ, ভারতে অনুপস্থিত সুভাষ বুঝেছিলেন দক্ষিণপন্থীরা বৃহত্তর ফ্রন্ট গঠনে বামপন্থীদের বাধা দিচ্ছে। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ১৯৩৫ এর ১৯ ডিসেম্বর এক চিঠিতে লিখছেন, 'If my words had the slightest influence with Mahatmaji, I would have written to him', সুতরাং গান্ধীকে বলে কোনো লাভ নেই।[৩৭] দলাদলি শুধু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন রাজ্যেও। যেমন, বাংলাপ্রদেশের গান্ধীপন্থী-সুভাষপন্থীদের বিরোধ বিষয়ে সুভাষ স্বয়ং নেহরুকে ১৯৩৭ এর ১১ এপ্রিল এক চিঠিতে জানিয়েছেন: The differences centre around personalities and it is difficult to discover any principle underlying them'।[৩৮]

১৯৩৬ এ লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সময়ও সুভাষ অনুপস্থিত। থাকলে অবস্থা অন্যরকম হতে পারত বলে সরকারি নথির স্বীকৃতি।[৩৯] তবু, সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠী, বিপ্লবী দল এবং কমিউনিস্টদের চাপ—সব মিলে বাম হাওয়া কম গরম ছিল না। কিন্তু বামপন্থী জওয়াহরলাল সংকল্পে অটল হয়ে সুভাষ-

চন্দ্রের সঙ্গে হাত মেলাতে পারেননি। হলে ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত বলে হীরেন মুখার্জি[৪০] বা মোহিত সেনের[৪১] মতন বামপন্থী লেখকেরা মনে করেন।

নেহরুর জীবনীকার, ইতিহাসবিদ সর্বপল্লী গোপাল গান্ধী-সুভাষ বিরোধকে ডান-বাম বিরোধ মনে করেন না, যা সুভাষ ভাবতেন। নেহরুর দায়িত্ব তিনি স্বীকার করেন না। তবে নেহরু যে কেন সুভাষের পাশে আসেননি, তার তাৎপর্য বোঝা যায় ডঃ গোপালের মন্তব্য থেকেই ঃ 'Happy on the inside track, he allowed his only rival, on the outer rails, to be pushed off the course'।[৪২] নিশ্চয়ই সুভাষ জওহরলালের উপর ভরসা করতেন না, কারণ তিনি জানতেন নেহরু এমন একজন ব্যক্তি যার 'head pulled him to the left, but his heart to the right, that is, to Gandhi'।[৪৩] তবে চতুর গান্ধি যেমন বামপন্থীদের পালের হাওয়া কেড়ে ও তরুণ সমাজের উপর নেহরুর প্রভাব কাজে লাগাতে জওহরলালকে সভাপতি করেন তেমনি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আবার বামপন্থীর পালের হওয়া কাড়তেও সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি করা হল হরিপুরাতে (১৯৩৮)।

কিন্তু বৈপরীত্য যেখানে মৌলিক, সেখানে সংঘাত অনিবার্য। হরিপুরা ভাষণে সুভাষ বললেন ঃ

> I would appeal specially to the leftist group in the country to pull all their strength and their resources for democratising the Congress and reorganizing it on the broadest anti-imperialist basis.

১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত বাম ঐক্য মোটামুটি বজায় ছিল। অধ্যাপক সুমিত সরকার লিখেছেন যে ঃ 'বামপন্থীদের সমস্ত অংশই একমত ছিলেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে থাকাটা ঠিক, আর কিছু অনিবার্য সমঝোতা সত্ত্বেও, মনে হয়, এতে ভালই লাভ হচ্ছিল।'[৪৪] কিন্তু সকল বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কথা বলা তখন গান্ধী, বিড়লা বা প্যাটেলের ভাল লাগার কথা নয়।

গান্ধী-সুভাষ বা দক্ষিণ-বাম বিরোধ অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে ছিল মৌলিক— সমাজতন্ত্র, শিল্পায়ন এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ও তজ্জনিত (সরকারের প্রতি)

দৃষ্টিভঙ্গি। সহজ কথায় বলা যায় যে সমাজতন্ত্র বা বৃহৎ শিল্পায়নের প্রতি গান্ধীর ছিল তীব্র অনীহা। যুদ্ধপরিস্থিতে গান্ধি চাইছেন আলাপ-আলোচনা ও আপস, সুভাষ মনে করছেন ব্রিটেনের বিপদ ভারতের সুযোগ, সরকারের দুর্দিন ভারতীয়দের সুদিন, এই সুযোগে আঘাত কর।

বিরোধ হবে গান্ধী বোঝেননি? সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মন্তব্য: 'This was quite characteristic of the Mahatma—his infinite faith in his capaciry for moral conversion, a sample of a moralist's egotism and an egotist's short-sightedness'।[৪৫] নেহরুকে যখন বাগে আনা যায়, সুভষাকে যাবে না? যায়নি। সুভাষের দোষ-গুণ যাই থাক, তিনি ভিন্ন ধাতুতে গড়া এবং বৈপরীত্যের পরিণতি বিরোধ, যা তুঙ্গে ওঠে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দাঁড়িয়ে গান্ধীর বকলমে তারই আশীর্বাদপুষ্ট প্রার্থী পট্টভি সীতারামায়াকে হারিয়ে দেওয়ার পর।

তারপর ইতিহাস সকলের জানা। আধুনিক ঐতিহাসিক লিখছেন: 'প্রভূত উন্নততর কৌশলে ও বামপন্থী ঐক্য না থাকায়, আপাত চূড়ান্ত পরাজয়ের কবল থেকেও গান্ধী ও কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীরা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন জয়। তৎক্ষণাৎ গান্ধী ব্যাপারটাকে তাঁর ব্যক্তিগত ইজ্জতের ব্যাপার করে তুললেন।'[৪৬] এই কৌশল অবলম্বন করেই অসুস্থ ও অতিষ্ঠ সুভাষকে শেষ পর্যন্ত দল থেকে তাড়ানো হল। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বারদৌলি বিবৃতি (২৪ জানুয়ারি), গণ পদত্যাগ (২২ ফেব্রুয়ারি), পন্থ প্রস্তাব (১২ মার্চ) এসবের পিছনে গান্ধীর হাত নেই? ৩১ মার্চ সুভাষ গান্ধীকে লেখেন 'the gulf can yet be bridged and that by you', সুভাষের এই আবেদন করা উচিত হয়নি, কারণ গান্ধী কিছুই করবেন না ১০ এপ্রিলের উত্তরেই তা বোঝা যায়।[৪৭] রবীন্দ্রনাথের ২৯ মার্চের চিঠির জবাবে গান্ধীর এড়িয়ে-যাওয়া উত্তরও কি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় না? বস্তুত নৈতিকতার ধ্বজাধারী গান্ধীর মনে তখন ক্ষমাহীন ক্রোধ আর কংগ্রেস সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করে সুভাষ গড়লেন 'ফরওয়ার্ড ব্লক' (৩ মে)। আগস্টে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারে অবশ্য কিছু এল গেল না সুভাষচন্দ্রের সমর্থকদের কাছে।

বাঙালি চিত্ত সেদিন উদ্বেল। গুরুদেব (গান্ধীর দেওয়া নাম) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষকে বরণ ক'রে দিলেন সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে 'দেশনায়ক' অভিধায় ভূষিত করে।[৪৮] রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেছিলেন ওজস্বীতার,

বীরত্বের, শক্তিমত্তার। উত্তাল ভারতবর্ষও। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা খুশি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সুভাষ চাইছিলেন সকল শক্তি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, সেখানে হিংসা, দুর্নীতি, সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অজুহাতে কংগ্রেস কেবলই চাইছে আপস। এমনকি, লিনলিথগোর একগুঁয়েমির ফলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি থেকে পদত্যাগ করার পরেও, রামগড় কংগ্রেসেও 'পূর্ণ স্বাধীনতা চাই' বলা ছাড়া কংগ্রেস তীব্র গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে পারেনি। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে খুশি শাসককুল আগেই রাজন্যবর্গ ও মুসলিম তাস খেলছিলেন, এবার ১৯৪০ এর লাহোর অধিবেশনে লীগ 'পাকিস্তান' প্রস্তাব নেওয়ায় তারা আশ্বস্ত। জুলাই ১৯৪০ এ সুভাষ কলকাতা হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের দাবিতে সত্যাগ্রহে সফল হলেও বন্দী হলেন। সুভাষ অনশন করলেন, স্বাস্থ্যের অবনতি হলে সরকার তাকে মুক্তি দিয়ে এলগিন রোডে নিজের বাড়িতে অন্তরীণ রাখলেন, সেখান থেকে ১৯৪১ এর জানুয়ারি মাসে তাঁর মহানিষ্ক্রমণ।

পাঁচ

সুভাষ আর ঘরে ফেরেনি, কিন্তু গান্ধী কি তাঁকে ভুলে গিয়েছিলেন? তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটেনি? যদি ঘটে থাকে তবে তার প্রতিফলন কেমন? সুভাষচন্দ্র বা ভারতের বাইরে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে কি পন্থা নেন যা গান্ধী-নীতির, অহিংসার বিরোধী? এবার আলোচনার শেষ অংশে সেই প্রশ্নগুলি তোলা যেতে পারে।

মৌলানা আজাদের সাক্ষ্য দিয়েই শুরু করি। আজাদ লিখেছেন:[৪৯] 'I also saw that Subhas Bose's escape to Germany had made a great impression on Gandhiji. He had not formerly approved many of Bose's actions but now I found a change in his outlook. Many of his remarks convinced me that he admired the courage and resourcefulness Subhas Bose had displayed in making his escape from India. This is admiration for Subhas Bose unconsciously coloured his view about the whole war situation'।

কথাটি ভাবার মতন এবং সত্য হতেই পারে। ১৯৪২ এ আমরা এক অন্যরকম গান্ধী দেখতে পাই। প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নিতেও যিনি হয়তো পশ্চাদপদ

নন, ডাক দিচ্ছেন open rebellion এর, রামধুন ছেড়ে বলছেন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' সে গান্ধীর উপর সুভাষের পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই আছে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কি গান্ধীর সুভাষের কাছে বিলম্বিত ত্রুটি স্বীকার? প্রশ্ন রাখছেন অমলেশ ত্রিপাঠী। এর উত্তর আমাদের ইতিবাচক দেওয়ার মতন প্রমাণ হয়তো নেই, কিন্তু কিছু তথ্য-প্রমাণ থেকে দেখান যেতে পারে যে ১৯৪১-৪৭ পর্বে গান্ধী সুভাষের বা সুভাষপন্থার দিকে নিকটতর হয়েছিলেন, বৈপরীত্য কমে এসেছিল।

১৯৪১-এর ১৭ জানুয়ারি মহানিষ্কমণ, দুঃসাহসিক সেই অভিযাত্রার কাহিনী অনেকেই শুনিয়েছেন, বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন। ২৬ জানুয়ারি সংবাদটি জানল সারা দেশ, ঘটনার আট দিন পর। টেলিগ্রাম পাঠালেন উদ্বিগ্ন গান্ধীজি, চিরশুভার্থী রবীন্দ্রনাথ। দুজনের তারের ভাষা আলাদা, শরৎচন্দ্র বসুর প্রত্যুত্তরও ভিন্ন ধরনের। এখন সকলেই জানেন সুভাষচন্দ্র যুদ্ধকালীন ব্রিটেনের বিপদের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী দেশ, প্রথমে জার্মানি ও পরে জাপানের সহায়তায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানতে চেয়েছিলেন, যার ফলে আসবে স্বাধীনতা। শেষপর্যন্ত অবশ্য এই পথে স্বাধীনতা আসেনি, ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া যায়নি, হয়েছে হস্তান্তরিত। এই ট্রান্সফার অব পাওয়ার-এর সঙ্গে দেশ-ভাগও হয়েছে।[৫০]

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং অক্ষশক্তির সহায়তায় ভারত-মুক্তির প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও আদৌ মূল্যহীন নয়।[৫১] যেমন গৌরবোজ্জ্বল আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির লড়াই।[৫২] সুভাষ ছিলেন নেতা, হলেন দেশবাসীর 'নেতাজী'। নেতাজী ও আই এন এ ব্রিটিশ শাসকদের নীতি ও কর্মপন্থার উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ের গতিপ্রকৃতির উপর, জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপর। খুব চিত্তাকর্ষক সে আলোচনা আপাতত দূরে সরিয়ে রেখে, শুধু গান্ধীর উপর প্রতিক্রিয়াই দেখা যাক।

সুভাষের অন্তর্ধানের পরেও গান্ধী সুভাষের ঐকান্তিক দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়ার পরেও সুভাষকে মনে করতেন 'পথভ্রান্ত দেশপ্রেমিক' (misguided patriot)।[৫৩] কিন্তু বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, দেশীয় পরিস্থিতির বদল, উইনস্টন স্পেনসার চার্চিলের আপাদমস্তক ভারত বিরোধিতার দুই চূড়ান্ত রক্ষণশীল দোসর এমেরি ও লিনলিথগোর একগুঁয়েমি, আন্তর্জাতিক পট পরিবর্তন

এবং সর্বোপরি দেশের বাইরে সুভাষের প্রয়াস গান্ধীর মনে পরিবর্তন এনেছে। ১৯৪২-এ গান্ধীর চোখে সুভাষ সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক।[৫৪] উপায়ন্তর না দেখে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের চাপে (অন্যান্য চাপও ছিল), ভারতবাসীকে ধাপ্পা দিয়ে তুষ্ট করে ক্ষমতা হস্তান্তর উহ্য রেখে, যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যখন স্ট্র্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে পাঠালেন এবং দৌত্য নিষ্ফল হলে তার দায় চাপিয়ে দিলেন কংগ্রেসের কাঁধে, তখন অহিংস সত্যাগ্রহের পূজারী গান্ধি যে পথ নিলেন তা সুভাষের—কোনো আলাপ-আলোচনা বা আপস নয়, ইংরেজকে ভারত ছাড়তেই হবে। না ছাড়লে মরণপণ শেষ লড়াই। 'Thus the gulf that had seperated the two Leaders was now bridged'—সুবোধ সেনগুপ্তের এই মন্তব্য অনেকটাই সত্য।[৫৫]

ক্রিপর্স মিশনের ব্যর্থতার পর গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি যে অনেক বদলে গেছে তা যেমন আধুনিক ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন,[৫৬] তেমনি তৎকালীন প্রাথমিক সূত্র থেকেও তা স্পষ্ট। 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধি লিখছেন ব্রিটিশ শাসকদের ভারত ত্যাগই একমাত্র সমাধানের পথ।[৫৭] আন্দোলনের পদ্ধতিও বদলে গেছে। গান্ধীর মুখে যেন সুভাষের কথা, কখনো open rebellion-এর ডাক, বলছেন অরাজকতা (fifteen days chaos) দেখা দিতে পারে, কর্মসূচি নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপরে। হিংসার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে তবু গণআন্দোলনে নামতেই হবে। এটা 'fight to the finish'। গান্ধী বলছেন conflagration-এ চলে যেতে পারে দেশ।[৫৮]

আমাদের মতে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ থেকে গণবিদ্রোহে রূপান্তর ঘটিয়ে গান্ধি সুভাষের সঙ্গে বৈপরীত্য কমিয়ে এনেছিলেন; প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে তাঁর আপত্তি ছিল না—এই সর্বাত্মক আন্দোলন সুভাষচন্দ্র বসুর কাঙ্ক্ষিত ছিল। ক্রিপসের সঙ্গে যখন আলোচনা চলছে তখন বার্লিন থেকে বেতার ভাষণে সুভাষ আবেদন জানিয়েছিলেন, আপস নয় যেন সংগ্রামের পথ নেওয়া হয়। তার প্রভাব গান্ধির ওপর পড়েছিল মনে হয়। ১৯৪২-এর পর গান্ধী যেন সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে বৈপরীত্য অনেক কমিয়ে আনছেন, সুভাষের সংগ্রামী চেতনা গান্ধীর কণ্ঠে দেখা যাচ্ছে। একবার পরে লর্ড ওয়াভেলকে বলছেন 'if a blood bath was necessary, it would come about in spite of non-violcnce'।[৫৯] ইতিহাসের পরিহাস হয়তো এই ১৯৪২-৪৭ পর্বে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বৈপরীত্য কমে আসা। বাপুজীর প্রতি সুভাষের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অটুট

কেননা আজাদ হিন্দের প্রথম ব্রিগেডের নামই রাখা হয় গান্ধী ব্রিগেড, আর গান্ধীও ছেড়ে দিয়েছেন আপসের পথ। বিমান দুর্ঘটনার কথা শুনে মর্মাহত গান্ধী বললেন ঃ আমি বিশ্বাস করি না। আর ইতিহাসের ট্রাজিক পরিণতি এই যে গান্ধী না চাইলেও, কংগ্রেসের নেতৃত্ব—নেহরু, রাজাজী, প্যাটেল, আজাদ প্রমুখ—গেলেন সেই আপসেরই পথে, ফলে ক্ষমতার হস্তান্তর শেষ পর্যন্ত হল, কিন্তু দেশ-ভাগের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে, যা গান্ধী বা সুভাষ কারুরই কাম্য ছিল না।[৬০]

সূত্রনির্দেশ ও টীকা ঃ

১. স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা নিয়ে সম্প্রতি নানা ধরনের গবেষণা কর্ম হয়েছে ও হচ্ছে। তবে সব ধারা-উপধারার একত্রে মূল্যায়ন সংবলিত বই নেই, বাংলায় তো নেইই। পাঠকবর্গ অবশ্য অল্পকথায় এই ধারাগুলি বিষয়ে সহজ আলোচনা পাবেন চিন্মোহন সেহানবীশের 'স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় ধারা' (কলকাতা, ১৯৮৫) শীর্ষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত প্রথম সূর্য সেন স্মারক বক্তৃতায়।

২. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, **ইণ্ডিয়া রেস্টস্ ফ্রিডম,** সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮২।

৩. তদেব, পৃঃ ২২৩ (স্থূলাক্ষর বর্তমান লেখকের)।

৪. জেমস্ সি উইলসন, 'বোস ভার্সাস গান্ধী ঃ ত্রিপুরি অ্যাণ্ড আফটার', ড: জগদীশ পি শর্মা (সম্পা.), **ইণ্ডীভিজুয়ালস্ অ্যাণ্ড আইডিয়াল ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া,** ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১৪৮-১৯৬।

৫. Eur. Mss. Fi 25/1V লণ্ডনের কমনওয়েলথ রিলেশনস্ অফিসে (পূর্বতন ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি) রক্ষিত দলিল।

৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,** আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ২৪০-৪১।

৭. সুভাষচন্দ্র বসু, **অ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম,** ১৯৩৮, পৃঃ ১৪৪ (স্থূলাক্ষর আমার)।

৮. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২২২।

৯. তদেব, পৃঃ ১৬৮।

১০. **সিলেক্টেড স্পিচেস অব সুভাষচন্দ্র বসু** ভারত সরকার, নতুন দিল্লি, ১৯৬২, পৃঃ ৫৩ ।

১১. সুভাষচন্দ্র বসুর ১৯৩২-এর আগে জার্মানি ও ইতালির প্রতি কিছু দুর্বলতা ছিল। নাৎসী ফ্যাসিস্ট মতবাদের শক্তি নির্ভরতা, দক্ষ প্রশাসন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশ গঠন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ইত্যাদি হয়তো তাঁকে মোহগ্রস্থ করেছিল। তাছাড়া ফ্যাসিবাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং মানবিকতা ও সভ্যতা বিরোধী নগ্ন আক্রমণ তিরিশের দশকের ঘটনা। যে দশকে ভিয়েনা, প্রাগ, বার্লিন তিনি অনেক ঘুরেছেন। তখন তার মোহভঙ্গ হয়। জার্মানির সাহায্য তিনি পাবেন না তাও পরে বুঝতে পারেন। জার্মান জাতীয় সমাজ-তন্ত্রের সংকীর্ণতাও তাঁর চোখে ধরা পড়ে। আলেকজান্ডার ওয়ার্থ, কৃষ্ণা বসু (**ইতিহাসের সন্ধানে,** কলকাতা, ১৯৭২) প্রমুখের রচনা দ্রষ্টব্য।

১২. রজনীপাম দত্তের সঙ্গে সুভাষের সাক্ষাৎ হয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে, লণ্ডনে। অবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের পর সুভাষ মত বদল করেছেন বলে তাঁকে সুভাষ জানান। 'ডেইলী ওয়ার্কার' লণ্ডন, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৩৮ কাগজে ঐ সাক্ষাৎকারের বিবরণ সহ সুভাষের উদ্ধৃতি পাই ঃ 'My personal view today is that the Indian National Congress should be organised on the broadest anti-imperialist front and should have the two bold objective of winning political freedom and the establishment of a socialist regime'। উদ্ধৃতির জন্য, অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৪৮।

১৩. সুভাষচন্দ্র বসু, **ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল,** পৃঃ ৩১০-১৪, ৩৮১-৮৬।

১৪. বসু—রঁল্যা সাক্ষাৎকারের জন্য দ্রষ্টব্য, **দ্য মডার্ন রিভিউ,** সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫।

১৫. জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড, **এলিট কনফ্লিক্ট ইন আ প্লুরাল সোসাইটি,** বোম্বাই, ১৯৬৮, পৃঃ ৩০১-২।

১৬. জন গ্যালাহার, 'কংগ্রেস ইন ডিক্লাইন ঃ বেঙ্গল, ১৯৩০-৩৯', ড. জন গ্যালাহার, অনিল শীল ও গর্ডন জনসন (সম্পা.),

প্রভিন্স অ্যান্ড নেশন, লোকালিটি, ইন বেঙ্গল পলিটিক্স কেম্ব্রিজ, ১৯৭৩ ; গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, **কনস্ট্রেণ্টস্ ১৯২১-৪১ ঃ গান্ধীয়ান লিডারশিপ,** কলকাতা, ১৯৭৪ ; লেনার্ড গর্ডন, **বেঙ্গল ঃ দ্য ন্যাশানালিস্ট মুভমেণ্ট,** কলম্বিয়া, ১৯৭৪।

১৭. জুডিথ ব্রাউন, **গান্ধীজ রাইজ টু পাওয়ার, ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স ১৯১৫-১৯২২,** কেম্ব্রিজ, ১৯৭২। গান্ধীর উত্থানের জন্য দেখা যেতে পারে। সুভাষের উত্থানের উপর অনেক লেখা আছে, বিশেষত ড. লেনার্ড গর্ডন, **ব্রাদার্স এগেনস্ট দ্য রাজ** এবং হিউ টয়, **দ্য স্প্রিঙ্গিং টাইগার ঃ এ স্টাডি অব আ রেভোলিউশনারি,** লণ্ডন, ১৯৫৯। অপিচ ড. অমলেশ ত্রিপাঠী, 'গান্ধীজ সেকেণ্ড রাইজ টু পাওয়ার, ১৯২৪-১৯২৯, **ক্যালকাটা হিস্টোরিকাল জার্নাল,** প্রথম খণ্ড নং ১-২, জুলাই, ১৯৭৬ জানুয়ারি, ১৯৭৭।

১৮. **ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল,** পৃঃ ৮২।

১৯. 'Even during 1921-24 his mind had begun to move in different directions but they all pointed to one goal—the disruption, by whatever means or methods, of the British Government in India'. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২২৭।

২০. গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'Bengal continned to be a perennial source of tronble for' Gandhi. পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৫৮।

২১. পুস্তিকাটি পাঠকবর্গ দেখতে পাবেন H. W. Hale-এর Terrorism in India বইয়ের তৃতীয় পরিশিষ্ট হিসেবে, পুনর্মুদ্রণ, নতুন দিল্লি, ১৯৭৪, পৃঃ ১৯৯-২০৮।

২২. এই বামপন্থী আন্দোলনের কিছু আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, **কমিউনিজম অ্যাণ্ড বেঙ্গলস্ ফ্রিডম মুভমেণ্ট,** প্রথম খণ্ড, দিল্লি, 1970।

২৩. আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ড. সুমিত সরকার, 'দ্য লজিক অব গান্ধীয়ান ন্যাশানালইজম ঃ সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স অ্যাণ্ড গান্ধী আরুইন

প্যাক্ট', **ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রিভিউ**, জুলাই, ১৯৭৬, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, **দ্য অ্যাসেনডেন্সি অব দ্য কংগ্রেস ইন উত্তরপ্রদেশ**, দিল্লি, ১৯৭৮। আর এক ইতিহাসবিদ লিখেছেন 'Big capitalists were pillars of Gandhian Leadership and Gandhi conld not afford to see them recined by the advent of class consciousness among the masses' (গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২০২)।

২৪. গান্ধী, কমপ্লিট ওয়ার্কস্‌, ৩৫ খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮।

২৫. ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পৃঃ ১৫৭।

২৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, এপ্রিল, ১৯৬৫, উদ্ধৃতির জন্য গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৮৪। গান্ধীর দ্বিচারিতা সম্বন্ধে শ্রীমতী জুডিথ ব্রাউনের মন্তব্য এই সূত্রে উদ্ধার করছি ঃ 'The different needs of Indians impelled Gandhi into a position of particular leverage. Gandhi was willing to play this lubricant role rather than break decisively with liberals whose support would be influential in negotiation with the Government' (দ্রঃ **গান্ধী অ্যাণ্ড দ্য সিভিল ডিসওবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট**) পৃঃ ৬৬।

২৭. ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল, পৃঃ ১৭৪।

২৮. 'Mahatma Gandhi, being a sincere pacifist vowed to non-violence, did not like the strutting, clicking of boots and saluting, and he afterwards described the Calcutta session of the Congress as a Bertram Mills circus, which caused a great deal of indignation among the Bengalis' মন্তব্য নীরদচন্দ্র চৌধুরীর। দ্রঃ **The Continent of Circe**, London, 1965, p. 109। অনেক বাঙালিও সুভাষ 'গক' বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

২৯. কে. কুর্তি, **সুভাষ বোস অ্যাজ আই নিউ হিম**, কলকাতা ১৯৬৫, পৃঃ ৩০।

৩০. বাংলা সরকারের পাক্ষিক প্রতিবেদন। Home Pol Progs. file Nos 18/II, 18/IV, 18/VI, 1934 (ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত)।

৩১. সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ…।

৩২. Eur. Mss. 125/IV (কমনওয়েলথ রিলেশনস্ অফিসে রক্ষিত)।

৩৩. বি. আর. টমলিনসন, **দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস অ্যাণ্ড দ্য রাজ, ১৯২৯-৪২ঃ দ্য পেনালটিমেট ফেজ,** লণ্ডন, ১৯৭৬।

৩৪. ড. বি. এন. পাণ্ডে (সম্পা.) **লিডারশিপ ইন সাউথ এশিয়া** (নতুন দিল্লি, ১৯৭৭) গ্রন্থে ডেভিড ডি টেলার-এর প্রবন্ধ, "ক্রাইসিস অব অথরিটি অ্যাণ্ড লিডারশিপ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস, ১৯৩৬-৩৯"।

৩৫. পট্টভি সীতারামায়ার **দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস,** দু' খণ্ড, বোম্বাই, ১৯৪৬, ইতিহাস পদবাচ্য নয়। এমনকি, ১৯৮৫-র প্রকাশিত শতবার্ষিকী ইতিহাসেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

৩৬. ড. গোপালচন্দ্র রায়, **কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত,** কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৪৯; হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, **ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,** তিন খণ্ড, কলকাতা, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ১৯৪৭; হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, **কংগ্রেস,** কলকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯২৮; কানাইলাল দত্ত, **স্বাধীনতা ও কংগ্রেস** কলকাতা, দাশগুপ্ত প্রকাশন, ১৯৮৮ এবং অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩৭. রাজেন্দ্রপ্রসাদ কাগজপত্র, ফাইল নং VII (1936)।

৩৮. এ আই সি সি কাগজপত্র, ফাইল নং p-5 (1937)।

৩৯. হোম, পলিটিকাল, ফাইল নং 18/4 (1936)

৪০. হীরেন মুখার্জি, **দ্য জেণ্টল্ কলোসাস,** কলকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ৮০।

৪১. মোহিত সেন, **দ্য ইণ্ডিয়ান রেভোলিউশন,** নতুন দিল্লি, ১৯৭০ পৃঃ ৩৫।

৪২. এস. গোপাল, **নেহরুঃ আ বায়োগ্রাফি,** প্রথম খণ্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি, ১৯৭৫, পৃঃ ২৪৩।

৪৩. এ কথা বসু বলেছিলেন নিজেই। ড. কে. কুর্তি, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৯।

৪৪. সুমিত সরকার, **আধুনিক ভারত** (অনূদিত, কলকাতা, কে পি বাগচী, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৭৭।

৪৫. সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪১।

৪৬. সুমিত সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৯।

৪৭. বসুর উত্তর গান্ধী দেন ২ এপ্রিল। ৬ এপ্রিল বসু আবার লিখলে গান্ধী উত্তর দেন ১০ এপ্রিল। তাতে 'The gulf is too wide, suspicion too deep' জানিয়ে গান্ধী লেখেন, 'I smell violence in the air I breathe' (দ্র. গান্ধী, কমপ্লিট ওয়ার্কস্, ৬৯ খণ্ড, পৃঃ ৯৬-৯৮)।

৪৮. 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের সঙ্গে পন্থার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবপন্থার বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি ও মহিমাকে স্বাগত জানিয়েছেন। দ্র. **কালান্তর,** পরিবর্ধিত রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ৩৭১-৭৬।

৪৯. আবুল কালাম আজাদ, **ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম,** দিল্লি, ওরিয়েণ্ট লংম্যান, ১৯৫৯, পৃঃ ৪১।

৫০. এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্বে ব্রিটিশ নথিপত্র ও দলিলপঞ্জী বর্তমানে প্রকাশিত, ফলে ইতিহাসচর্চায় অনেক প্রাথমিক আকর-উপাদান এখন লভ্য যা ১৯৪৭ খ্রিঃ ছিল না। ড. ম্যানসার্গ, লাম্বি ও মুন (সম্পা.) **দ্য ট্রান্সফার অফ পাওয়ার,** ১২ খণ্ড, লণ্ডন: হার ম্যাজেস্টিস স্টেশনারী অফিস, ১৯৭০-৮৩।

৫১. আলোচনার জন্য 'শিশির বসু ও কৃষ্ণা বসু' 'সুভাষচন্দ্র বোস অ্যাণ্ড দ্য আই এন এ', দ্র. **হানড্রেড ইয়ারস্ অব ফ্রিডম স্ট্রাগল,** প্রধান সম্পাদক নিশীথরঞ্জন রায়, প্রকাশক বিপ্লবী নিকেতন, কলকাতা তারিখ নেই, পৃঃ ২৩১-২৫৭; শিশিরকুমার বসু (সম্পা.), **নেতাজী অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম,** নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, কলকাতা, ১৯৭৫।

৫২. আ. ইন. এ-র ভূমিকার জন্য ড. শিশিরকুমার বসু, 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম', দ্র. **সাগা: আ চ্যালেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম,** সম্পা. নিশীথরঞ্জন রায়, কল্পনা যোশী ও অন্যান্য, নতুন দিল্লি; পিপলস্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৪, পৃঃ ৫৭৪-৫৯০; জে লেব্রা, **জাঙ্গল অ্যালায়েন্স: জাপান অ্যাণ্ড**

দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল পার্টি, লণ্ডন, ১৯৭১ ; কল্যাণকুমার ঘোষ, **ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল পার্টি**, মীরাট, ১৯৬৯।

৫৩. টেনডুলকর, **মহাত্মা**, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১১৮।

৫৪. দুর্গা দাস, **ইণ্ডিয়া ফ্রম কারজন টু নেহেরু অ্যাণ্ড আফটার**, পৃঃ ২৫৭।

৫৫. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৪।

৫৬. 'There was a marked change in Gandhiji's attitude after the failure of the Cripps Mission' ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, **হিস্ট্রি অফ ফ্রিডম মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া**, ফার্মা কে এল, কলকাতা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫২৩।

৫৭. হরিজন, ১৯ এপ্রিল, ১৯৪২।

৫৮. আন্দোলন শুরু হয়ে যাওয়ার পর তা অবশ্য আর সর্বদা গান্ধীবাদী ছিল না। ড. গৌতম নিয়োগী, 'ভারত ছাড়া আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর ঃ জনগণের ভূমিকা', **চতুরঙ্গ**, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯২, পৃঃ ৩৫৬-৩৬৫।

৫৯. ম্যানসারগ ও অন্যান্য, পূর্বোল্লিখিত, অষ্টম খণ্ড, নং ২০৫।

৬০. স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে নেতৃত্বের চরিত্র বিষয়ে ড. সুমিত সরকার, **পপুলার মুভমেণ্টস্ অ্যাণ্ড মিডল ক্লাশ লিডারশিপ ইন লেট কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া**, কলকাতা, ১৯৮৩।

সুভাষচন্দ্র ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

[১]

১৮৯৭র ২৩ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম হয়। কার্যতঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর প্রথম পরাক্রান্ত আবির্ভাব ঘটে ১৯২১ এর মধ্যভাগে, যখন তিনি বিলাতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, ভারতে ফিরে এসে সর্বক্ষণের স্বেচ্ছাসেবক রূপে স্বরাজলাভের লক্ষ্যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রায় একই সময় রাশিয়ার ১৯১৭-র ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবে, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অস্পষ্ট অঙ্কুরও দেখা দেয়।

১৯১৯ এর বর্ষ শেষে, কলেজ স্কোয়ারে ১৪ ডিসেম্বর তারিখে এক জনসভায়, প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল বলেন ঃ

"সারা পৃথিবীতে এক নতুন জনশক্তি জেগে উঠেছে। তারা চায় জনগণের ন্যায্য অধিকারকে পুনরুদ্ধার করতে। তারা চায় শোষণ মুক্ত সমাজে, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি পেয়ে, সুখে স্বাধীনভাবে বাঁচতে। তারই নাম বলশেভিজম্।" [১]

এরও আগে কলকাতার একটি জাতীয়তাবাদী বাংলা দৈনিক পত্রিকাও লিখেছিল ঃ "জারতন্ত্রের পতন ভারতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পতনের দিনকে ঘনিয়ে আনছে।"[২]

প্রসিদ্ধ জাতীয় বিপ্লববাদী নেতা ও কাবুলে অবস্থিত স্বাধীন ভারত সরকারের অন্যতম সংগঠক মৌলানা বরকতুল্লাহ্ ১৯১৯-এ সোভিয়েত রাশিয়াতে গিয়েছিলেন। সর্বহারা বিপ্লবের তখন শৈশব। কিন্তু তাই চমৎকৃত করে বরকতুল্লাহকে। তাসখন্দ থেকে প্রকাশিত এক উর্দু পুস্তিকায় তিনি লেখেন ঃ "রাশিয়ার দিকচক্রবালে মানব স্বাধীনতার ভোর দেখা দিয়েছে। আর সেই দীপ্যমান সূর্যের নাম লেনিন।"[৩]

ভারতের মধ্যেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লৌহ-যবনিকা ভেদ করে রুশ-

বিপ্লবের মহৎ আদর্শের কথা সচেতন মানুষদের কাছে পৌঁছাতে লাগল। আদৌ কমিউনিস্ট ন'ন, এরকম একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের ১৯১৭ তে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতির ভাষণেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব সুস্পষ্ট। চিত্তরঞ্জন বলেন ঃ

"ভারতে ইংরেজ শাসকদের আমি বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে চরমপন্থী বা নরমপন্থী নেই। বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমানরা সবাই শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী আমরা হোমরুল বা স্বরাজ চাই। কিন্তু যে স্বরাজে ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের অধিকার স্বীকৃত নয়, তা আমাদের কাম্য নয়। আমি যখন বলি "স্বরাজ চাই", তখন আমি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রর বদলে ফিরিঙ্গি আমলাতন্ত্র বা এমনকি ভারতীয় আমলাতন্ত্রর শাসন চাই না। আমরা যে স্বরাজ চাই, তা জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য শাসনব্যবস্থা। আমরা যে স্বরাজ চাই, তাতে দেশের দরিদ্রতম কৃষকও তার ন্যায্য অধিকার পাবে। আমরা ভারতের জনগনের সম্মতির উপর ভিত্তি করে ব্যাপকভিত্তিক স্বরাজ চাই।"[৪]

ভারতে, বলশেভিক-বিরোধী গোয়েন্দা প্রধান লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল সেসিল কে ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব ম্যাকফারসনকে এক গোপন রিপোর্টে জানালেন ঃ "অনেকেই বলছেন যে উত্তর প্রদেশের কিষাণ সভা ও বাংলা দেশের রায়ত সভা একেবারে বলশেভিক পন্থী। ১৯১৯-এ অমৃতসরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এরা যে খসড়া প্রস্তাব দিয়েছিল, তাতে বলা হয় ঃ (ক) সমগ্র ভারতবর্ষে চাষীদেরই জমির মালিক বলে ঘোষণা করতে হবে, (খ) চাষীরা কর দেবে কিন্তু খাজনা দেবে না এবং (গ) কৃষকদের উপর কর ধার্য করার জন্য উৎপন্ন ফসলকেই তাদের আয়ের ভিত্তি বলে গণ্য করতে হবে। ...জমি বিতরণের প্রশ্নে বলশেভিকদের কর্মপদ্ধতি ভারতীয়দের কাছে খুবই আদর পাবে এবং ভারতীয় আন্দোলনকারীদের মধ্যে যারা কমিউনিস্ট তারা এই কাজটিই করছেন। ভারতবর্ষে বিপ্লব নিশ্চয় লেনিনের কাম্য, তবে আমার মনে হয় যে লেনিন চাইছেন যে ভারতে বিক্ষোভ তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই এগিয়ে চলুক।"[৫]

বাংলার শ্রেষ্ঠ জাতীয় বিপ্লবী বাঘা যতীনের দক্ষিণ হস্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন বাঘা যতীনেরই নির্দেশে, বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রসংগ্রহ করতে।

বাঘা যতীনের মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথ চলে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে মার্কসবাদকে নিজের আদর্শ বলে গ্রহণ করলেন এবং মেক্সিকোর সমাজতন্ত্রী দলের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন তিনি, মানবেন্দ্রনাথ রায় ছদ্মনাম গ্রহণ করে। লেনিনের প্রেরিত বলশেভিক নেতা বোরোদিনের আমন্ত্রণে রায় ও তাঁর মার্কিন পত্নী এভেলিন মস্কোতে গিয়ে যোগ দিলেন নবগঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০)। সেখানে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তিসংগ্রামের রণকৌশল নিয়ে লেনিনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হয়। সংক্ষেপে তা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি।

লেনিনের উত্থাপিত মূল প্রস্তাবটির নাম ছিল "প্রিলিমিনারি ড্রাফ্‌ট থিসিস অন দ্য ন্যাশনাল অ্যান্ড কলোনিয়াল কোয়েশ্চন।" ঐ দলিলের ১১ নং অনুচ্ছেদে লেনিন লিখেছিলেন: "যে সব অনগ্রসর দেশে এখনও সামন্ততান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা চালু আছে সে সব দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে:

(ক) সেই সব দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করা সকল কমিউনিস্ট পার্টির অবশ্য কর্তব্য;

(খ) সেই সব পশ্চাৎপদ দেশে পাদ্রিতন্ত্র ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যযুগীয় শক্তিদের বিরুদ্ধেও নিরন্তর সংগ্রাম করতে হবে;

(গ) প্যান-ইসলামিক ও ঐ জাতীয় মতধারা যা ইউরোপীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে খান, সামন্ততন্ত্র ও মোল্লাদের শক্তিবৃদ্ধি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে;

(ঘ) উপনিবেশ ও পশ্চাৎপদ দেশগুলির বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলন মৈত্রীস্থাপন করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া চলবে না। এইসব দেশে একেবারে প্রাথমিক অবস্থাতেও শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সযত্নে রক্ষা করতে হবে।"[৬]

মানবেন্দ্রনাথ রায় একমত হতে পারলেন না এই খসড়া প্রস্তাবের সঙ্গে। তাঁর বক্তব্যে তিনি বললেন: "ভারতে একটি পরাক্রান্ত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার মত সমস্ত উপাদানই রয়েছে। কিন্তু ব্যাপক জনসাধারণ ও ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের কোনও মিলই দেখতে পায় না।"[৭]

লেনিন রায়ের মতকে ভ্রান্ত ও সংকীর্ণতাবাদদুষ্ট বলে সমালোচনা করলেন, কিন্তু রায়কে তিনি সুযোগ দিলেন তাঁর বক্তব্যটি সংশোধিত আকারে "সাপ্লিমেণ্টারি থিসিস" নামে কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসেই পেশ করতে। আর "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, জাতীয় আন্দোলন" এর পরিবর্তে, নিজের চুড়ান্ত খসড়ায় লেনিন লিখলেন "বৈপ্লবিক জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।" অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য মারফত পদানত দেশগুলির বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনের যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছিল, তাকেও যথাযোগ্য মূল্য দিলেন লেনিন।

ফরাসিদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের একজন নেতা যিনি ঐ মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লেনিন-রায় বিতর্ক সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ

"খানিক পরে লেনিন রায়ের বক্তব্যের জবাব দিলেন। তিনি রায়কে বোঝালেন যে এখন বেশ কিছুদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একটা ছোট্ট পার্টি থাকতে বাধ্য। তার সভ্য অল্প কয়েকজনই হবে। তার নিজস্ব কর্মসূচি স্বাধীন মঞ্চ মারফত পার্টি খুব বেশি শ্রমিক ও কৃষকের কাছে পেঁছাতেই পারবে না। অন্যদিকে জাতীয় স্বাধীনতার দাবিকে কেন্দ্র করে অনেক বড় জনসংখ্যাকে জমায়েত করা সম্ভব।...এই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণের ভিত্তিতেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সেই প্রভাব ও সংগঠিত ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে, যার জোরে, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর তারা ভারতীয় বুর্জোয়াদের সফলভাবে আক্রমণ করতে সক্ষম হবে।"[৮]

লেনিনের সমালোচনা মেনে নিয়ে এম. এন. রায়, অপর একজন গোড়ার যুগের ভারতীয় কমিউনিস্ট অবনী মুখার্জির সঙ্গে একত্রে রচনা করেন একটি ইস্তাহার, যা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামে হাজার হাজার কপি বিতরণ করা হয় ১৯২১ এর ডিসেম্বরে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে। তাতে লেখা ছিল যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও একটি সার্বভৌম যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র গঠনই কমিউনিস্টদের প্রথম লক্ষ্য। সেই রাষ্টে নির্বাচিত সরকার গঠনের ভিত্তি হবে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকার, সামন্ততন্ত্র ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা এবং বৈদেশিক পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা, শ্রমিক ও

কৃষকদের স্বাধীন শ্রেণী সংগঠন গড়ার দাবি মেনে নেওয়া এবং নারীসমাজ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। এই ইস্তাহারটি পুনরায় বিতরণ করা হয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে, ১৯২২ এর ডিসেম্বরে।[৯]

আমেদাবাদ কংগ্রেসের সময় রায় ও অবনী ছিলেন সুদূর ইউরোপে এবং পরবর্তীকালে এদেশে যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি'র গোড়াপত্তন করেন, তাঁরা কেউই সেই কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন না। কিন্তু নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির অন্যতম নেতা মৌলানা হসরৎ মোহানি কমিউনিস্ট পার্টি'র নামে প্রচারিত ইস্তাহারটি পড়ে, তার সমর্থকে পরিণত হন এবং আমেদাবাদ কংগ্রেসে উদাত্ত ভাষণ দিয়ে স্বরাজের চরিত্র সম্বন্ধে এক সংশোধনী প্রস্তাব এনে বলেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত "পূর্ণ স্বাধীনতা" তাঁকে সমর্থন করে ভাষণ দেন ফেরারি এক বাঙালি বিপ্লবী, যিনি রাজস্থানে কৃষক আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন স্বামী কুমারানন্দ নাম গ্রহণ করে।[১০]

গান্ধীজী এই প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেন। ফলে প্রস্তাবটি পরাজিত হয়। তরুণ সুভাষচন্দ্র তখন জেলে। অপরের মুখে আমেদাবাদ কংগ্রেসের রিপোর্ট শুনে, হসরৎ মোহানির সংশোধনী যদিও তিনি তখন সমর্থন করেননি, তথাপি তাঁর বক্তৃতা তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। এক দশক পরে, তাঁর লেখা বই "দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল" এ সুভাষচন্দ্র লেখেন ঃ

"আমেদাবাদ কংগ্রেসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলছি। উত্তর-প্রদেশের প্রভাবশালী মুসলিম জননেতা মৌলানা হসরৎ মোহানি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত পরিপূর্ণ স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এত উদ্দীপনাময় ছিল তাঁর ভাষণ, যে মনে হয়েছিল বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হবে। কিন্তু গান্ধীজি শান্ত যুক্তি দিয়ে প্রস্তাবটির বিরোধিতা করলেন এবং ফলে প্রস্তাবটি পরাজিত হল। কিন্তু এই দাবি বার বারই এই সময় থেকে কংগ্রেসের মঞ্চে উত্থাপিত হতে থাকল..."[১১]

আমরা জানি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তরুণ সুভাষচন্দ্রের প্রথম প্রবেশ ১৯২১ এর মধ্যভাগে এবং তার সমস্ত সম্পর্কই ছিল মুখ্যতঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে। ১৯২২ এর আগে ভারতের

কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর কোনও ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। তবে আমেদাবাদ কংগ্রেসে হসরৎ মোহানির বক্তৃতা যখন তাঁর মনে যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল, তখন সম্ভবতঃ রায় ও অবনীর নামে স্বাক্ষরিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারিত ইস্তাহারটিও তাঁর নজরে এসেছিল।

সুভাষচন্দ্র যখন উচ্চশিক্ষা লাভের ও আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্য কেমব্রিজ গিয়েছিলেন, তখন বিলাতের শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রথম অভ্যুদয়ের যুগ। তাছাড়া বার্লিনে ঘাঁটি করে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচার করছেন তখন শুধু এম. এন. রায় বা অবনী মুখার্জিই নন, প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ দুইবন্ধু ছিলেন দিলীপ-কুমার রায় ও ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা এতই ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে বিলাতে ১৯২০-২১-এ তাঁদের নাম ছিল "ত্রয়ী" (Trio)।[১২] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগ্রাম করছে জেনে, তাদের সম্বন্ধে সেযুগের প্রায় সব সংগ্রামী ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর মতই সুভাষচন্দ্রেরও অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু কমিউনিস্ট আদর্শের দিকে তিনি তখন আদৌ আকৃষ্ট হননি। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করলে তারা জাতীয় বিপ্লবের সপক্ষে একটা বড় শক্তি হয়ে দাঁড়াবে একথাও সুভাষচন্দ্র মনে করতেন কিনা সন্দেহ।

অথচ এই সম্ভাবনা তখন তাঁর প্রায় চোখের সামনেই বাস্তব রূপ পাচ্ছিল। তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্ষিতীশপ্রসাদ ১৯২১ থেকে ১৯২৩, কেমব্রিজে নৃতত্ত্বে পড়াশুনো করার সময়, দীর্ঘ ছুটি পেলেই পূর্ব লণ্ডনে চলে এসে ভারতীয় বন্দর শ্রমিক ও খালাসিদের সংগঠিত করার কাজে হাত লাগাতেন। শীঘ্রই তিনি গড়ে তুললেন "লস্কর ওয়েলফেয়ার লিগ" কমিউনিস্টদের সহায়তায়। সংগঠনের সভাপতি হলেন ইংলণ্ডের পার্লা-মেণ্টের প্রথম কমিউনিস্ট সদস্য সাপুরজি শাকলাৎওয়ালা, যুগ্ম সম্পাদক হলেন ক্ষিতীশপ্রসাদ ও তাঁর বন্ধু (পরবর্তীকালে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ) ডি. আর. গাডগিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইংরেজ সদস্য টি. জে. মারফি ক্ষিতীশপ্রসাদকে পরামর্শ দিলেন বার্লিনে গিয়ে এম. এন. রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দাদের গোপন রিপোর্টে এই সময় লেখা হচ্ছে ঃ

"রায়ের যোগাযোগ হয়েছে লিডসের অজয় ব্যানার্জি'র ও কেমব্রিজের ক্ষিতীশ চ্যাটার্জি'র সঙ্গে। মার্ফি ক্ষিতীশের কথা রায়কে বলেছেন·· লস্কর ওয়েলফেয়ার লিগে নিয়মিত কমিউনিজমের সপক্ষে প্রচার চলছে।"[১৩] আবার "রায় আইরিশ কমিউনিস্ট রডির মারফত ক্ষিতীশকে খবর পাঠিয়েছেন, জোরদারভাবে বন্দর শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ চালিয়ে যেতে।"[১৪]

সুভাষচন্দ্র এই টালমাটালের যুগে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট বা প্রভাবিত হলেন না। সাংবিধানিক বা নির্বাচনী রাজনীতিও কিন্তু তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। অহিংস গণ-আন্দোলনের মারফত ভারতে ইংরেজ শাসনকে অচল করার অভিযানে সুভাষচন্দ্র একজন অক্লান্ত কর্মী'র ভূমিকা পালন করার সিদ্ধান্তই মনে মনে গ্রহণ করলেন।

১৯২১-এর নভেম্বর মাসে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে যে ইংলন্ডের যুবরাজ ভারতে সরকারি সফরে আসছেন। কংগ্রেস ও খিলাফত নেতৃত্ব ঘোষণা করেন যে যুবরাজের আগমনকে তাঁরা বয়কট করবেন, যেখানেই তিনি যাবেন সেখানেই হরতাল পালন করা হবে। ১৭ নভেম্বর যুবরাজ জাহাজ থেকে বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করলে সারা ভারত জুড়ে সর্বাত্মক হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলকাতায় এই হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তরুণ সুভাষচন্দ্রর উপর, তাঁকে করে দিয়েছিলেন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন।[১৫]

১৭ নভেম্বরের হরতাল সংগঠিত করতে গিয়ে ২৫০০০ কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করেন। দেশবন্ধু সুভাষকে, সংগঠনের স্বার্থে, তখনই সত্যাগহ করে জেলে যেতে নিষেধ করেন। কলকাতায় হরতাল সম্পূর্ণ সফল হয় এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 'ক্যাপ্টেন' রূপে সুভাষচন্দ্রের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অগ্রজ বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৫-এ স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন ঃ 'আমার জীবনে আমি সুভাষের মত অক্লান্ত কর্মী দেখিনি। আলস্য বাঙালি চরিত্রের একটি অঙ্গ। আমরা যে কোনও কাজ সময়মত করতে পারি না। সুভাষ ছিল একেবারে অন্য চরিত্রের মানুষ। ইংরেজদের ভাষায়, তার ছিল 'বুলডগের' মত জিদ। কাজ শুরু করে, তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মধ্য পথে তা কখনও ছেড়ে দিত না। শেষ করতেই

হবে—এই ছিল তার পণ। খাওয়া, বিশ্রাম, নিদ্রা, প্রয়োজনে সব কিছু বাদ দিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত সে।…সবাই জেলে যাচ্ছে, আর দেশবন্ধু তাকে জেলে যেতে দিলেন না, এতে সুভাষ কেঁদেই ফেলেছিল। তাই দেখে, সস্নেহ পরিহাস করে দেশবন্ধু তাকে বলতেন 'ক্রন্দনরত ক্যাপ্টেন'।'[১৬]

তবে সুভাষচন্দ্রকে বেশিদিন জেলের বাইরে থাকতে হয়নি ১৯২১-এর ১০ ডিসেম্বর পুলিশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।[১৭] ইংরেজ শাসকদের জেলখানার অভিজ্ঞতা সুভাষচন্দ্রর এই প্রথম। সে অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কয়েকবছর পরে তিনি লিখেছিলেন ঃ

'প্রথমে প্রেসিডেন্সি ও পরে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আমি ছিলাম, দেশবন্ধুর সঙ্গে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে বেশি কাছে থাকলে মানুষের দুর্বলতা ধরা পড়ে। কিন্তু ৬ মাস একসঙ্গে থেকে, দেশবন্ধুর চরিত্রের সরলতা ও মহত্ত্বই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।'[১৮]

১৯২২-এ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশবন্ধু কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সেই অধিবেশনে নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে, মাদ্রাজের শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার বললেন ঃ 'বন্ধুরা, সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টরাই সমর্থন করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে, মনে করে আমাদের দাবি ন্যায্য। আমাদের স্বরাজ অর্জনের সংগ্রামের তারা সমর্থক। আসুন, আমরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে স্বাগত জানাই।'[১৯]

এই গয়া কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন তিলকের ভক্ত, বোম্বাই-এর ছাত্র নেতা এস. এ. ডাঙ্গে। তিনি ততদিনে গ্রহণ করেছেন কমিউনিস্ট মতবাদ, তাঁর নিজের ভাষায় ঃ 'ছিলাম তিলকের চেলা, হলাম লেনিনের চেলা।'[২০] ডাঙ্গে তখন বোম্বে থেকে 'সোস্যালিস্ট' নাম দিয়ে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক বের করেছিলেন। তাতে তিনি লেখেন ঃ 'কংগ্রেসের মধ্যেকার বামপন্থীদের আমরা পরামর্শ দিই ঃ আসুন, আমরা সবাই মিলে কংগ্রেসের মধ্যেই একটা প্রগতিশীল দল গড়ি ও তার নাম দিই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দল।'[২১]

সিঙ্গারাভেলুর বক্তৃতার উল্লেখ ছিল কলকাতার সুপরিচিত অমৃতবাজার পত্রিকায়। সিঙ্গারাভেলুর বক্তৃতার একটি লাইন ছাপা হয় বড় হরফে ঃ

'বন্ধুগণ, আমাদের কমিউনিস্টদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ হল স্বরাজ লাভের জন্য সংগ্রাম করা।'[২২] সুভাষচন্দ্রও এই সময়ই প্রথম সপ্রশংস উল্লেখ করেন ভারতের কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে। তিনি লেখেন: '১৯২৩-এ কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রধান বিদ্রোহী অংশ ছিলেন স্বরাজপন্থীরা। তাছাড়া, আর একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীও এই সময় আত্মপ্রকাশ করল—বোম্বাই-এ শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের নেতৃত্বে···এরাই ছিলেন ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট গোষ্ঠী।'[২৩]

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল ১৯২২-এ। লেনিনের পরামর্শে কমিণ্টার্নের সভাপতিমন্ডলী গয়াতে সম্মেলনে রত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে এক তারবার্তায় অভিনন্দন জানালেন, সমর্থন জানালেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে।[২৪] তাতে সাড়া দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা দিলেন: আমি চাই শতকরা ৯৮ জনের জীবনে প্রকৃত স্বরাজ।[২৫]

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পরামর্শে এম. এন. রায় ভারতবর্ষ থেকে ৫ জন ব্যক্তিকে কমিন্টার্নের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। তাঁরা হচ্ছেন: প্রবীণ বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন দাস, তরুণ জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসু ও তরুণ কমিউনিস্ট শ্রীপাদ অমৃৎ ডাঙ্গে।'[২৬]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা আতঙ্কিত হল। তাদের গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা হল: 'বেশ কিছু অসহযোগ আন্দোলনের নেতা বর্তমানে কমিউনিস্ট আদর্শের দিকে ঝুঁকেছেন। স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর সহকর্মীরা কেউ কেউ জনগণকে জাগ্রত করার জন্য এম. এম. রায়ের পরামর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন।'[২৭]

'সহকর্মীরা কেউ কেউ' এর মধ্যে তরুণ সুভাষচন্দ্র থাকতেই পারেন, নিশ্চিতভাবে ছিলেন সুভাষচন্দ্রর বন্ধু হেমন্ত সরকার। তার জন্যই কমিণ্টার্ণের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য ডাঙ্গের পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রের নামও যোগ করে দিয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'লৌহ যবনিকা' ভেদ করে মস্কোতে তাঁরা কেউ পৌঁছতে পারেননি—না সুভাষচন্দ্র, না ডাঙ্গে।

সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিজমের দিকে ১৯২১-২৪-এর পর্বে

তেমনভাবে আকৃষ্ট না হলেও, বেশ কিছু জাতীয় বিপ্লববাদী সে দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট দুই বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুশীলন দলের তরুণ বিপ্লবী গোপেন চক্রবর্ত্তী, ধরণী গোস্বামী, সতীশ পাকড়াশি প্রমুখ। 'শঙ্খ' পত্রিকাতে ১৯২২-এ শচীন সান্যাল ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লেখেন 'লেনিন ও সমসাময়িক রাশিয়া' নাম দিয়ে। বার্লিন থেকে ফেরারী বিপ্লবী ও স্বামী বিবেকানন্দর ছোট ভাই ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত 'শঙ্খ'-তে ১৯২২-এ এক খোলা চিঠিতে লেখেন যে মার্কসবাদের চর্চা করতে হবে ও গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে আকৃষ্ট না হলেও, ফেরারী কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয় দেবার জন্য সাহায্যের হাত সুভাষচন্দ্র সব সময়েই বাড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯২২-এ ভারতে আসেন, মাথায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট অবনী মুখার্জি। পুলিশের তাড়া খেয়ে অবনী হাজির হন তাঁর পরিচিত ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সুনীতিকুমার লিখছেন ঃ

'১৯২২-এর ডিসেম্বর মাসের শেষে সন্ধ্যাবেলা কে আমাকে ডাকল। অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে চিনতে না পারলেও বসবার ঘরে আলোতে আসতেই দেখলাম লোকটি অবনীনাথ। তাকে ভারতে দেখে আমি তো হতবাক। কারণ তখন তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত ছিল।'[২৮] সুনীতিকুমার অবনীকে নিয়ে গেলেন দিলীপকুমার রায়ের কাছে। তিনি অবনীকে নিয়ে গেলেন তাঁর বন্ধু সুভাষচন্দ্রর কাছে। ইংরেজ গোয়েন্দা পুলিশ খবর পেয়ে গেছে বুঝে সুভাষচন্দ্র তাঁকে তৎপরতার সঙ্গে 'যুগান্তর' বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহায়তায় 'বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি মারফত সঁপে দেন সন্তোষ মিত্রর নিরাপদ আস্তানাতে।'[২৯]

সন্তোষ মিত্রকেও তখন পুলিশ খুঁজছে। তাই তিনি যোগাযোগ করলেন তাঁর কমিউনিস্ট বন্ধু আবদুর রেজ্জাক খানের সঙ্গে। সুভাষচন্দ্র সন্তোষ মিত্রর এই ব্যবস্থায় সম্মতিই জানালেন, যার থেকে বোঝা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে তিনি সেই আদিযুগের কমিউনিস্টদের নির্ভরযোগ্য মিত্র বলেই মনে করতেন। রেজ্জাক খান সাহেবও ১৯৭০-এ এক সাক্ষাৎকারে এই লেখককে বলেছিলেন ঃ 'সন্তোষ অবনীর পরিচয় গোপন রেখে, তাঁকে আমার জিম্মায় দিয়ে গেল। সন্তোষ ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার উপর

আস্থা ছিল বলেই আমি অবনী মুখার্জিকে না চিনলেও, তাঁকে নারকেল ডাঙার এক নিরাপদ আশ্রয়ে বেশ কয়েকদিন রেখেছিলাম।'[৩০]

কোনও একটি গোপন আস্তানায় বেশিদিন থাকা নিরাপদ ছিল না অবনীর পক্ষে। বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে তীব্র দলাদলি সত্ত্বেও, সুভাষচন্দ্রকে তাঁরা সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। অবনী আবার বিপন্ন জেনে সুভাষচন্দ্র এবার অনুশীলন দলকে অনুরোধ করেন তাঁকে আশ্রয় দিতে। অনুশীলন দলের নেতারা অবনীকে ঢাকাতে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখাশোনা করার ভার দেওয়া হল তরুণ কর্মী (পরে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা) সতীশ পাকড়াশীর উপর।[৩১]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা অবনীর কার্যকলাপে খুবই উদ্বিগ্ন হয়। তাদের গোপন রিপোর্টে লেখা হয় 'একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সম্প্রতি অবনী মুখার্জি যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন তিনি জার্মানি থেকে আসা জাহাজী শ্রমিকদের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের যোগাযোগ করিয়ে দেন, যার ফলে তারা যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।'[৩২]

সুভাষচন্দ্রর সঙ্গে এই সময়ে, স্বল্পকালের জন্য হলেও, অবনীর সঙ্গে কি রাজনৈতিক মত বিনিময় হয়েছিল, তার কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ এখন পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। কিন্তু একথা মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে সুভাষচন্দ্র অবনীর কাছ থেকে জানতে চান যে কমিউনিস্টরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কি ধরনের ভূমিকা নেবেন এবং অবনীও জানতে চান যে কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মতামতই বা কি।

অবনীর মতামত ১৯২২-এ কি ছিল, তার প্রমাণ অবশ্যই রয়েছে। অবনী মুখার্জি মনিলাল মগনলাল ডক্টর ও সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার এক যুক্ত ঘোষণাপত্রে (১৯২২) লেখেন : 'আমাদের পরিচালিত হিন্দুস্থান লেবার কৃষাণ পার্টি ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের বাঁচাবার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। স্বরাজ অর্জনও আমাদের দলের লক্ষ্য। একটি সংগঠিত শক্তি হিসাবে এই দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করবে।'[৩৩]

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে ১৯২২-এর ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন কমিউনিস্টের চতুর্থ কংগ্রেসের সভাপতি মণ্ডলী এবং কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য তাঁরা আমন্ত্রণ জানান কমিউনিস্ট ডাঙ্গে ছাড়াও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্র

বসুকে ও দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন দাসকে। দেশবন্ধুও এই সময়েই ঘোষণা করেন যে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে শতকরা ৯৮ জন ভারতবাসীর জন্য স্বরাজ। এই প্রেক্ষাপটে ফেরারী অবনী মুখার্জির দিকে সুভাষচন্দ্রর সাহায্যের হাত বাড়ানো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী, সশস্ত্র বিপ্লববাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হতে চলেছে এবং তা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে বিপন্ন করবে, একথা ১৯২২-২৩-এ একাধিক সরকারি গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে। ১৯২৩-এর গোড়ার দিকে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব একটি গোপন পত্রে লিখলেন যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের, কমিউনিস্টদের ও বিপজ্জনক বিপ্লববাদীদের বন্দী করে রাখার সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হয়েছে। 'প্রশ্ন হচ্ছে কবে আক্রমণটা করা হবে। কর্নেল কে মত দিয়েছেন যে যখন এদের সবাইকে একসঙ্গে জালে ছেঁকে তোলা যাবে, তখনই আমরা ধরপাকড় করব।'[৩৪]

১৯২৩-এর জুলাই মাসে সারা ভারত জুড়ে গ্রেপ্তার হলেন আদিযুগের কমিউনিস্ট সংগঠকরা—শ্রীপাদ অমৃৎ ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহমদ, নলিনী গুপ্ত, শওকৎ উসমানি। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হল পয়লা নম্বর আসামী মানবেন্দ্রনাথ রায়েরও বিরুদ্ধে। বার্ধক্য ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ছাড় পেয়ে গেলেন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার। ১৯২৪-এ বন্দী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শুরু হল কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। বিচারে চারবছর সশ্রম কারাদণ্ড হল চার কমিউনিস্ট নেতার। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখছেন: 'গলায় লোহার হাঁসুলি ও পায়ে লোহার মল পরিয়ে আমাদের ৪ জনকে ৪টি বিভিন্ন জেলে বদলি করে দেওয়া হল।'[৩৫]

পার পেলেন না সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা ও বিপ্লববাদীরাও। ১৯২৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাপক ধরপাকড় করা হল বাংলার বিপ্লববাদীদের। ১৯২৪-এর ২৫ অক্টোবর ভোরবেলা গ্রেপ্তার হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রেরিত হলেন উত্তর ব্রহ্মে, মান্দালয়ের কারাগারে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের চণ্ড নীতিই কাছাকাছি টেনে আনল বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের ও কমিউনিস্টদের।

[২]

সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হলেন ১৯২৮-এর সূচনায়। দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়েছে ১৯২৫-এ। বাংলার কংগ্রেসের নেতা তখন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত,

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা সবাই তাঁকেই সমর্থন করছে। এমনকি বাংলার বিপ্লববাদীদের একটা অংশও সেনগুপ্তর পক্ষে। আদর্শগত যে প্রশ্নে তখন কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ চলছিল তা হচ্ছে এই যে কংগ্রেসের আদর্শ কি হবে—ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন নাকি ডোমিনিয়নের মর্যাদা পেলেই কংগ্রেস সন্তুষ্ট থাকবে। আমেদাবাদ কংগ্রেস (১৯২১) থেকে শুরু করে কংগ্রেসের প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করে আসছিলেন কমিউনিস্টরাই।

১৯২৭-এ মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আবার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তোলেন বোম্বাই-এর রেলশ্রমিক নেতা, কমিউনিস্ট সংগঠক কে. এম. যোগলেকর।[৩৬] অবশ্য প্রতিবারই বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হত কমিউনিস্টদের আনা এই প্রস্তাবটি। এবার একটু ভিন্নতর চিত্র দেখা গেল। সদ্য ইউরোপ সফর করে ও 'লিগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজমের' প্রথম মহা-সম্মেলনে অংশ নিয়ে ফিরেছিলেন জওহরলাল নেহরু। সবাইকে বিস্মিত করে তিনি মঞ্চে উঠে যোগলেকরের প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। গান্ধীজি সম্মেলনে আসেননি। দক্ষিণপন্থীরা কি করবেন স্থির করতে পারলেন না, প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গেল।[৩৭] পরদিন খবরটি জেনে কংগ্রেসের প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করলেন গান্ধীজি। ফলে সমগ্র ১৯২৮ ধরে জাতীয় আন্দোলনে প্রধান বিতর্কের বিষয় হল আন্দোলনের মূল লক্ষ্য নিয়ে ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পূর্ণ স্বাধীনতা।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা, বিপ্লববাদীরা ও কমিউনিস্টরা এর ফলে খুব কাছাকাছি এসে গেলেন। অবশ্য ১৯২৭ থেকেই কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ধর্মঘটের একটা জোয়ার এসেছিল এবং বহুক্ষেত্রেই কমিউনিস্টরা ও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা একত্রে এইসব ধর্মঘট পরিচালনা করেছিলেন—বাংলার রেল ও চটকল ধর্মঘট, বোম্বাই-এ সুতাকলে সাধারণ ধর্মঘট প্রভৃতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯২৮-এর গোড়াতে কারামুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সঙ্গে মিলে গঠন করলেন 'দি ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ', যার লক্ষ্য হল 'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আইন করা এবং স্বাধীন ভারতকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা।'[৩৮] জন্ম লগ্নেই ভারতের কমিউনিস্টরা যোগ দিলেন এই সংগঠনে এবং কারামুক্ত

সুভাষচন্দ্রর সঙ্গে তাঁদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হল। এই সংগঠনের সংযোগ স্থাপিত হল বার্লিনে অবস্থিত 'লিগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজমের' সঙ্গে, যার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।[৩৯]

১৯২৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে, বাংলাদেশের সমস্ত সংগ্রামী ছাত্ররা কলকাতায় এক সম্মেলন ডেকে, সেখান থেকে জন্ম দিলেন এক পরাক্রান্ত ছাত্র সংগঠনের—নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি (ABSA)। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিশাল ছাত্র-সমাবেশে সভাপতির ভাষণ দিলেন জওহরলাল নেহরু, বিশিষ্ট অতিথির ভাষণ দিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। নবগঠিত ছাত্র সংগঠনের তিনজন প্রধান নেতাই ছিলেন কমিউনিস্টদের দিকে আকৃষ্ট—প্রমোদ ঘোষাল, বীরেন দাশগুপ্ত ও রেবতী বর্মণ। বীরেন দাশগুপ্ত ও রেবতী বর্মণ পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। বীরেন দাশগুপ্ত হন রেল শ্রমিকদের নেতা, আর রেবতী বর্মণ প্রথম যুগের অন্যতম বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক। প্রমোদ ঘোষাল সারাজীবন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় প্রধানতঃ জোর দেন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ছাত্রদের সমর্থন জানাবার ডাক দিয়ে। আর জওহরলাল ছাত্রদের ডাক দেন সমাজতন্ত্রর আদর্শকে গ্রহণ করবার জন্য।[৪০] ছাত্র যুব সমাজে তখন প্রবল বামপন্থার ঝোঁক এবং সংগঠনের নেতাদের জওহরলালের বক্তৃতাই মনে বেশি দাগ কাটে, যদিও ছাত্র সাধারণ সুভাষচন্দ্রর ভাষণকেও বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন।

এর পরের বৃহৎ ঘটনা ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন সুভাষচন্দ্র: 'এই কংগ্রেস, মাদ্রাজ অধিবেশনের প্রস্তাবকে পরিপূর্ণ সমর্থন করছে যে ভারতের জনগণের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আরও ঘোষণা করছে যে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করলে সত্যকার স্বাধীনতা আসবে না।'[৪১] এই সংশোধনী সমর্থন করলেন জওহরলাল নেহরু, বিপ্লববাদীরা ও কমিউনিস্টরা।[৪২] গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সংশোধনীর পক্ষে ৯৭৩ ও বিপক্ষে ১৩৫০ ভোট পড়ল। পরাজিত হলেও বামপন্থীদের পরাক্রমের প্রথম অভ্যুদয় ঘটল।[৪৩]

কলকাতা কংগ্রেসের অপর প্রসিদ্ধ ঘটনা—সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী,

সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের যুক্ত নেতৃত্বে ৫০ হাজার ধর্মঘটী শ্রমিকের বিশাল মিছিল কংগ্রেস সম্মেলনে এসে শ্রমিক শ্রেণীর দাবি জাতীয় নেতাদের সমর্থন করার আহ্বান জানায় ও পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকে সোচ্চার সমর্থন করে। কংগ্রেসের সরকারি ইতিহাসবিদও লিখেছেন ঃ "জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন ৫০ হাজার শ্রমিকের সুশৃঙ্খল মিছিলের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারা দুই ঘণ্টার জন্য মণ্ডপ দখল করে এবং জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে।"[৪৪]

সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসের এই অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক। ফলে প্রথমে তিনি কংগ্রেস মণ্ডপে শ্রমিক মিছিলকে ঢুকতে দেননি এবং তাই নিয়ে কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর খানিকটা ভুল বোঝাবুঝিও হয়। কিন্তু পরে সুভাষচন্দ্র মিছিলটির সপ্রশংস উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ "কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় হাজার হাজার শ্রমিকদের বিরাট মিছিল কংগ্রেস মণ্ডপে আসে, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করে ও দাবি করে যে কংগ্রেস বুভুক্ষু শ্রমিকদের দাবি সমর্থন করুক।[৪৫]

১৯২৯-র ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় সাইমন কমিশন এলে, সুভাষচন্দ্রই উদ্যোগ নিয়ে কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে একত্রে সাধারণ ধর্মঘট, হরতাল ও কালো পতাকার মিছিলের ডাক দেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তৎকালীন মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' লেখে (২০ জানুয়ারি, ১৯২৯) যে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতায় লক্ষাধিক মানুষের বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের অর্ধেকই ছিল শ্রমিক। সুভাষচন্দ্রর সঙ্গে কমিউনিস্টদের সৌহার্দ্যের সম্পর্কের এটা একটা স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ১৯৩০-এ কমিউনিস্টদের সমর্থনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯২৯-এর বর্ষশেষে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত হল পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্যর সপক্ষে প্রস্তাব। সিদ্ধান্ত হল সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'গণআইন অমান্য আন্দোলন' শুরু করার। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী শক্তিদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের মৈত্রীর ভিত্তিতে দেশে বৈপ্লবিক গণজাগরণের বাস্তব উপাদান এইসময় তৈরি ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই

সংগ্রামী মৈত্রী অগ্রসর হতে পারল না। তাতে চিড় ধরল ও পরে সে ঐক্য ভেঙে গেল। তার জন্য অনেকটা দায়িত্বই কমিউনিস্টদের, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না।

[৩]

ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রামে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদের এই ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী ঐক্য ধাক্কা খেল প্রধানতঃ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের হঠকারী ও সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতার জন্য। লেনিনের প্রাজ্ঞ নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে যোসেফ স্তালিনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী অটো-কুসেনিন কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে পরাধীন ও অর্ধ পরাধীন দেশদের জন্য নতুন রণকৌশলের সুপারিশ করে বললেন: "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সামন্ততান্ত্রিক মিত্রদের বিরুদ্ধে ভারতে সংগঠিত সংগ্রামে জয়লাভের পথে প্রধান বাধা সুবিধাবাদী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রভাব।"[৪৬] ইতিমধ্যে ১৯২৯-এর ২০ মার্চ ভারতের প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট নেতাকে (কয়েকজন অ-কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতাকেও) গ্রেপ্তার করে সাম্রাজ্যবাদ শুরু করল ঐতিহাসিক মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। জেলের বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইলেন কিছু তরুণ কমিউনিস্ট। কমিন্টার্নের পরামর্শকে সম্পূর্ণ সঠিক মনে করে তাঁরা রচনা করলেন এক গভীর সংকীর্ণতাবাদী রণকৌশলের দলিল। তাতে তাঁরা জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের মত সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতাদের সম্বন্ধে লিখলেন যে তাঁরা হচ্ছেন "ধনিক শ্রেণীর প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি, যাঁরা আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনতার স্বার্থের বিরুদ্ধেই মূলতঃ কাজ করছেন।"[৪৭] সে যুগের একজন উদীয়মান কমিউনিস্ট নেতা বহুদিন পরে আত্মসমালোচনা করে লিখেছেন: "এই ভ্রান্ত নীতির ফলে আমরা মস্ত বড় সুযোগ হারালাম।"[৪৮] বিক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্রও এই যুগ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯৩৪-এ লিখলেন:

"কমিউনিস্টদের ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে লেনিনের থীসিস, মনে হয়, এই সময়ে বাতিলই হয়ে গিয়েছিল।"[৪৯]

সংগ্রামী ঐক্যের একটি নড়বড়ে সেতু তখনও টিকে ছিল শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। ১৯৩১-এ কমিউনিস্টদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত

হলেন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি, আর কমিউনিস্ট দেশপাণ্ডে নির্বাচিত হলেন তার সাধারণ সম্পাদক। তবে এই ঐক্যও ধোপে বেশিদিন টিকল না। কমিউনিস্টরা এ. আই. টি. উ. সি. থেকে বেরিয়ে গিয়ে গঠন করলেন লাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, টুকরো হল সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যও।[৫০]

ঐক্যের সপক্ষে তবু জেগে রইল ভরসার সামান্য রুপোলি রেখা। জেলের বাইরে বাংলার কয়েকজন কমিউনিস্ট—বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আবদুল মোমিন, মনি সিং, আবদুল রেজাক খান প্রমুখ—সক্রিয় অংশ নিচ্ছিলেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে। গাড়োয়ান ধর্মঘট, চটকলের সাধারণ ধর্মঘট প্রভৃতির নেতৃত্ব দিতে গিয়ে এঁরা কারারুদ্ধ হলেন। আলিপুর জেলে বন্দী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। ভেঙে যাওয়া সৌহার্দ্য খানিকটা জোড়া লাগল।

ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য কারামুক্তি পেয়ে সুভাষচন্দ্র চিকিৎসার ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ যাত্রা করলেন। ১৯৩৪-এর শেষে ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রসিদ্ধ বইঃ "দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল।" প্রায় একই সময় জওহরলাল সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে বললেনঃ "ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের মাঝখানে কোনও মধ্য পন্থা নেই। এ দুটোর মধ্যে একটাকে যদি আমাদের বেছে নিতেই হয়, তবে আমি কমিউনিস্ট আদর্শকেই বেছে নেব, যদিও কট্টরপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে সব প্রশ্নে আমি মোটেই একমত নই।"[৫১]

এই বিবৃতির উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র তাঁর বইএ লিখলেনঃ

"এই বিবৃতির মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমাদের এই দুটি পথের মধ্যে একটা বেছে নিতেই হবে এমন কোনও কারণ নেই। সব মিলিয়ে আমার ধারণা পৃথিবীতে এর পরে সভ্যতার ভিত্তি হবে কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের একটা সমন্বয়।...ভারতে কমিউনিস্ট মতবাদ কেন দানা বাঁধবে না, তার বহু কারণ আছে।"[৫২] এই বিবৃতি পড়ে স্বভাবতই ভারতের কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্রের মন্তব্যর তীব্র সমালোচনা করলেন। সুভাষচন্দ্রর সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আবার একটা চিড় ধরল।

ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রর আংশিক সপ্রশংস ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত

ছিল, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও একথা তাঁর সম্বন্ধে সামগ্রিক মূল্যায়নে আমাদের বলতেই হবে।

১৯৩৫-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন তাদের সংকীর্ণতাবাদী গুরুতর ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন দেশগুলির সমস্ত সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ার নীতি গ্রহণ করল। ১৯৩৬-এ ভারতের কমিউনিস্টরাও নতুন কর্মনীতি গ্রহণ করল যার মূল বক্তব্য হল "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়তে হবে, যার প্রাণশক্তি হবে কমিউনিস্টরা, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা, বামপন্থী কংগ্রেসীরা ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা।"[৫৩]

সুভাষচন্দ্রও ১৯৩৩-৩৪ থেকে ১৯৩৭-৩৮-এ ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে তাঁর মত অনেকখানি বদলে ছিলেন এবং আত্মসমালোচনাও করেছিলেন। ১৯৩৮-র গোড়ায় লন্ডনে তাঁর দেখা হয় ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্তর সঙ্গে। এক সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র তাঁকে বলেন ঃ "আমার বইটি লেখার পর গত তিন বছরে আমার মতামত আমি অনেক পরিবর্তন করেছি। যখন আমি বইটা লিখছিলাম, তখন ফ্যাসিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ প্রকাশ করেনি। আমার তখন মনে হয়েছিল যে ফ্যাসিবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদ মাত্র। তাছাড়া, ভারতে যারা কমিউনিস্ট তাদের অনেক কার্যকলাপকেই আমার মনে হয়েছে জাতীয় স্বার্থবিরোধী। এটা এখন স্পষ্ট যে তাদেস্থ মতও অনেক বদলেছে। তবে একথা আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই মার্কস ও লেনিন তাঁদের রচনার মারফত যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করেছেন, তার আমি অনুরাগী..."[৫৪]

১৯৩৮-এ সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে এলেন, কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হ'লেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনী। তথাপি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কমিউনিস্ট সদস্যরা কংগ্রেসে বিতরণ করলেন পার্টির ইস্তাহার, যার শিরোনামায় লেখা ছিল ঃ "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত দেশপ্রেমিকের ও জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে যুক্ত মোর্চা গড়ে তোল।"[৫৫] সুভাষচন্দ্র কমিউনিস্টদের খোলা চিঠিকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানান।

হরিপুরা কংগ্রেসে তাঁর সভাপতির ভাষণের উপসংহারে সুভাষচন্দ্র

বলেন: "ভারতের মুক্তির জন্য যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠন সংগ্রাম করছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে তাদের সম্মিলিত মঞ্চ। সুতরাং, আসুন আমরা সমগ্র দেশকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকার নিচে সমবেত করি। আমি বিশেষভাবে আবেদন জানাই ভারতের সমস্ত বামপন্থী গোষ্ঠীদের কাছে: আপনারা সর্বশক্তি দিয়ে কংগ্রেসকে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চে রূপান্তরিত করুন ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক গণতন্ত্রকে প্রসারিত করুন। এই সূত্রে আমি বলতে চাই যে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব আমাকে খুবই উৎসাহ দিয়েছে, কারণ আমার মনে হয়েছে যে তাঁদের ভারত সম্বন্ধে নীতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতির খুবই কাছাকাছি।"[৫৬]

সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত করতে চাইলেন দেশের সমস্ত বামপন্থী শক্তিরা আর তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এক যুক্ত বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি, আচার্য জে. বি. কৃপালনী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ।[৫৭]

দুদিনের মধ্যে এই বিবৃতির বিরুদ্ধে, সুভাষচন্দ্রকে বিজয়ী করার জন্য বামপন্থী ঐক্যের উদাত্ত আহবান জানিয়ে বেআইনী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী এক বিবৃতিতে বললেন: "ভারতীয় কমিউনিস্টরাই প্রথম রাষ্ট্রপতি বসুর পুনর্নির্বাচন দাবি করিয়াছিল। রাষ্ট্রপতি বসু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত।...আমরা যদি আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখিতে পারি এবং সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের জয় সুনিশ্চিত। রাষ্ট্রপতি বসু কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষা করিতে পারিবেন।...বিপরীতে আমরা যুদ্ধ যাত্রার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের পরিষ্কার আদেশ পাইব।"[৫৮]

১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় কংগ্রেস সভাপতির (তখনকার দিনে তাঁকে বলা হত রাষ্ট্রপতি) নির্বাচনে কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, এম. এন. রায়পন্থী ও কংগ্রেসের মধ্যেকার অন্য সমস্ত বামপন্থীদের সম্মিলিত সমর্থনে, দক্ষিণপন্থীদের প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র বিজয়ী হলেন। কমিউনিস্টদের আইনী সাপ্তাহিক ইংরেজি

মুখপত্র "ন্যাশনাল ফ্রন্ট"-কে অভিনন্দন জানিয়ে সুভাষচন্দ্র এক সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি বললেন ঃ

"কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তিদের সংহতি ও ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে "ন্যাশনাল ফ্রন্টের" বিশিষ্ট অবদানের কথা আমি উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি।…জাতীয় স্বধীনতার সংগ্রামে সর্বাত্মক ঐক্যকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। এ কথা আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে আমরা বামপন্থীরা ক্ষমতার জন্য লালায়িত নই। আমরা কংগ্রেস সংগঠন দখল করে দক্ষিণ-পন্থীদের বিতাড়িত করতেও চাই না।…আমরা শুধু চাই যে কংগ্রেসের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে যেন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এটাই হোক জনগণের কাছে 'ন্যাশনাল ফ্রন্টের' ঘোষণা।"[৫৯]

১৯৩৯-এর ১০ মার্চ ত্রিপুরীতে, অসুস্থ সুভাষচন্দ্র তাঁর সভাপতির ভাষণে এই হুঁশিয়ারি দিলেন ঃ

"স্বাধীনতা অর্জনের শেষ সংগ্রাম আসন্ন। তার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি চাই। তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন কংগ্রেস সংগঠনকে সর্বপ্রকার দুর্নীতি থেকে মুক্ত করা, যে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে ক্ষমতায় অংশগ্রহণের দুর্বলতা থেকে (নিঃসন্দেহে এখানে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির কথাই বলছেন—চিঠি. চ.)। দ্বিতীয় প্রয়োজন দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংস্থাদের সঙ্গে, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সংগঠনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে কাজ করা। তৃতীয়তঃ দেশের সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে, যাতে করে দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি একসঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত করতে সক্ষম হয়।"[৬০]

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হয়ে, আরও দুটি তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করেন, যে কাজে সমস্ত বামপন্থীরা, বিশেষতঃ কমিউনিস্টরা তাঁকে সুদৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিল। প্রথমটি হচ্ছে জাপানি ফ্যাসিবাদের দ্বারা আক্রান্ত বিপন্ন চীনের সাহায্যে ভারত থেকে একটি মেডিকেল মিশন প্রেরণ করা ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠন করা। এ-দুটিই স্বতন্ত্র ও দীর্ঘ আলোচনার বিষয়, এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে তা সম্ভব হবে না।

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেও, দক্ষিণপন্থী নেতারা কংগ্রেস

সংগঠনে সুভাষচন্দ্রকে কোণঠাসা করে রাখলেন। কমিউনিস্টদের উদ্যোগে এবং সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থনে গড়ে উঠল "বাম সংহতি কমিটি" যার সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্র এবং যার মধ্যে রইলেন সমাজতন্ত্রীরা, কমিউনিস্টরা, রায়পন্থীরা এবং স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর মত নির্দলীয় সংগ্রামী কিষাণ নেতারা। ১৯৩৯-এর ৩ মে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন যে বামসংহতিকে স্থায়ী ও দৃঢ়তর রূপ দেবার জন্য তিনি নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক বলে সংগঠনের জন্ম দিচ্ছেন, যা কংগ্রেসের মধ্যে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করবে।[৬১]

এর এক সপ্তাহ পরেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলকাতা অধিবেশন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। বললেনঃ "শিখণ্ডী সভাপতি থাকতে আমি রাজি নই।"[৬২] ত্রিপুরী কংগ্রেসে কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্রর পক্ষেই দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন, ভোট দিয়েছিলেন কুখ্যাত পন্থ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। দক্ষিণপন্থীদের তীব্র সমালোচনাও করে-ছিলেন তাঁরা। বাম সংহতি কমিটিরও অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন কমিউনিস্টরা, কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠাকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেননি।

সুভাষচন্দ্রর রণকৌশলের সমালোচনা করে কমিউনিস্টরা লিখলেনঃ

"সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের স্বার্থ দাবি করে, এক পক্ষের একচেটিয়া নেতৃত্ব নয়, সকলের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব।"[৬৩] মাসখানেক পরে আর একটি প্রবন্ধে কমিউনিস্টরা লিখলেনঃ "গান্ধীবাদের দুর্বলতাগুলি বামপন্থীরা অতীতে যথেষ্ট সমালোচনা করেছে। এখন তাদের যে বিপুল শক্তি রয়েছে, তার উপর নির্ভর করে, নতুন জাতীয়তাবাদী মঞ্চে গান্ধীবাদী শক্তিদেরও সমবেত করা প্রয়োজন।"[৬৪] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই মতান্তরের ফলে সুভাষচন্দ্র ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সম্পর্ক খানিকটা তিক্ত হয়ে উঠল, ঐক্যের বন্ধন বেশ শিথিল হল। তবে সে ঐক্য একেবারে ভেঙে গেল না। বিশেষতঃ বাংলাদেশে ফরোয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিস্টদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ঐক্য গড়ে উঠল দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে। হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য ১৯৪০-এর জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে যে আন্দোলন শুরু করেন, তাকে ব্যাপ্তি ও গতি দিয়েছিল বাংলার ছাত্রসমাজ, যার পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন।

সুভাষচন্দ্রর তখনও যথেষ্ট আস্থা ছিল কমিউনিস্টদের উপর। সাপ্তাহিক ইংরেজি মুখপত্র "ফরোয়ার্ড ব্লক" এর তিনজন সহযোগী সম্পাদকই ছিলেন কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী—বিখ্যাত সাহিত্যিক গোপাল হালদার, এবং মার্কসবাদী দুজন বুদ্ধিজীবী বিনয় ঘোষ ও শ্রীপ্রমোদ উপাধ্যায়। সুভাষচন্দ্র তাঁর কমিউনিস্ট সহকর্মীদের উপর যে সুগভীর আস্থা রাখতেন, স্মৃতিচারণ করে তার সশ্রদ্ধ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন গোপাল হালদার।[৬৫]

[৪]

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কি সুভাষচন্দ্র, কি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, উভয়েরই স্পষ্ট মত ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ব্যবহার করে, ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন যে কংগ্রেস যোগ দিক বা না দিক, যুদ্ধকালীন সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে, ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও ১৯৩৯ -এর অক্টোবর মাসে তাদের পলিট-ব্যুরো সভায় সিদ্ধান্ত করেছিল যে 'ভারতের জনগণের কর্তব্য হল যুদ্ধজনিত সঙ্কটের বৈপ্লবিক সদ্ব্যবহার করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা।'[৬৬]

১৯৪১-এর জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দাদের সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে। তাঁর সঙ্গে বহু মত পার্থক্য থাকা সত্বেও, তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন ভারতের কমিউনিস্টরা। পেশোয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২২) অন্যতম আসামী মিঞা আকবর শাহ, তাঁর বন্ধু পাঞ্জাবের কমিউনিস্ট নেতা অচ্ছর সিং চীজার কাছে সাহায্য চান, সুভাষচন্দ্রর হয়ে। অচ্ছর সিং সম্মতি জানিয়ে সুভাষচন্দ্র কোন পথে যাবেন, তা স্থির করতে আফগানিস্তানে পাঠান তাঁর তরুণ কমিউনিস্ট সহকর্মী রামকিষেণকে। দুর্গম পথের সন্ধান করতে গিয়ে পা পিছলে খরস্রোতা আমুদরিয়া নদীতে পড়ে প্রাণ হারান রামকিষেণ।[৬৭] সি পি আই-এর পলিট ব্যুরোর সদস্য ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর নির্দেশে সুভাষচন্দ্রকে পেশোয়ার থেকে কাবুলে নিরাপদে পৌঁছে দেন তৎকালীন কমিউনিস্ট ভগৎরাম তলোয়ার।[৬৮] সুপরিচিত ফরোয়ার্ড

ব্লক নেতা হরিবিষ্ণু কামাথও, তার ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও, স্বীকার করেছেন যে ইতালির বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্বশীল পদাধিকারীরা তাঁকে বলেছেন যে 'সুভাষচন্দ্র বসুকে পালাতে সাহায্য করেছিল ভারতীয় কমিউনিস্টরা।"৬৯

ভগৎরাম তলোয়ার লিখেছেন যে সুভাষচন্দ্রর খুবই ইচ্ছা ছিল কাবুল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার ও মধ্য এশিয়াকে তাঁর অভিযানের মূল ঘাঁটি করার, কিন্তু সোভিয়েত নেতারা এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ দেখাননি। কেন সোভিয়েত নেতারা সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না, তার সদুত্তর আমাদের এখনও পর্যন্ত জানা নেই। সম্প্রতি ভারত থেকে যে তিনজন গবেষক মস্কো গিয়ে ঐ যুগের রুশ মহাফেজখানা থেকে অনেক দলিলপত্র দেখে এসেছেন, তাঁরা হয়তো এই বিষয়ে ভবিষ্যতে কোনও আলোকপাত করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র তার ফলে চলে গেলেন জার্মানিতে, অক্ষশক্তিকেই বেছে নিলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের মিত্র বলে, কেননা শত্রুর শত্রুই তো আমাদের মিত্র! ভারাতর কমিউনিস্ট পার্টি এর একেবারে বিপরীতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিবিরে অবস্থান গ্রহণ করলেন, কারণ তাঁরা সঠিকভাবেই মূল্যায়ন করেছিলেন যে অক্ষশক্তি হচ্ছে মানব সভ্যতার নিকৃষ্টতম শত্রু। ফলে ১৯৪১-এর জুন মাস থেকে সুভাষচন্দ্র ও কমিউনিস্টদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল তলহীন গহ্বরের আকৃতি নিয়ে। শুধু এই পর্ব নিয়ে একটি দীর্ঘ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখার বাসনা আছে, তবে এই সামগ্রিক আলোচনার মধ্যে তা সম্ভব নয়।

তবু সুভাষচন্দ্রর জন্মশতবর্ষে কয়েকটি কথা স্পষ্টভাবে বলা দরকার। প্রথমতঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে ১৯৪২-৪৪-এর সময়ে সুভাষচন্দ্রকে জার্মান ও জাপানি ফ্যাসিবাদের ক্রীড়নক বলেছিল, তা শুধু গুরুতর অন্যায় নয়, ঐতিহাসিক বিচারে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সুভাষচন্দ্র কোনও সময়ই হিটলার বা তোজোর হাতের পুতুলে পরিণত হননি। বরঞ্চ নানান সময়ে তাদের কোনও কোনও কাজের বিরুদ্ধে গিয়ে সাধ্যমত নিজের স্বাধীন মতামত রক্ষা করেছেন।

দুটি দৃষ্টান্ত দেব। জার্মানি ছেড়ে চলে আসার আগে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভারতীয় সেনাদের বলে আসেন যে তারা যেন কোনও অবস্থাতেই সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব রণক্ষেত্রে লড়তে না যায়। ১৯৪৪-এ নাৎসী

সমরনায়করা ভারতীয় সৈন্যদের পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাতে চাইলে সুভাষচন্দ্রর নির্দেশ মত তারা যেতে অস্বীকার করেন। তখন জার্মান কর্তৃপক্ষ ১০ জন ভারতীয় সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করে।[৭০] দ্বিতীয় ঘটনাটির সময় ১৯৪৫। জাপানী ফ্যাসিস্টদের চাপ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র তাদের সাফ জানিয়ে দেন যে কোনও অবস্থাতেই তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মার মুক্তিসংগ্রামের নেতা আউং সান ও বর্মী দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে লড়বে না।[৭১]

আরও একটি কথা বার্লিন, তোকিও, সায়গন ও সিঙ্গাপুর থেকে সুভাষচন্দ্র যত বক্তৃতা করেছিলেন, তার একটিতেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমালোচনাপূর্ণ একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করেননি। কমিউনিস্টদের এই ব্যাপারটা গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত।

১৯৪৫-এর ২১ মে ব্যাঙ্কক থেকে এক বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন ঃ

'একথা এখন স্পষ্ট যে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে লক্ষ্য ও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন, যদিও জার্মানি ছিল উভয়েরই শত্রু। সান ফ্রান্সিসকোতে সম্মেলনে ভারত ও ফিলিপাইনের প্রতিনিধি রূপে ইংরেজ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যে তাঁবেদাররা এসেছিল, সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটভ তাদের ভারত ও ফিলিপাইনের যথার্থ প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে রাজি হননি। সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনের এই মতপার্থক্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার ঘোরতর বিরোধ দেখা দেবে।'[৭২]

সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে রণনীতিকে অবলম্বন করেছিলেন, সেই নীতিই অনুসরণ করেছিলেন বর্মার আউং সান, ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকার্নো, আরও অনেকে। কিন্তু জাপানি ফ্যাসিস্টদের বর্বর অত্যাচার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের মোহমুক্ত করে এবং নিজ নিজ দেশের কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁরা গড়ে তোলেন ফ্যাসিস্ট বিরোধী জাতীয় মুক্তিমোর্চা। সুভাষচন্দ্রও হয়তো শেষ পর্যন্ত সেই দিকেই ঝুঁকতেন। ১৯৪৫-এর ২১ মে ব্যাঙ্কক থেকে দেওয়া বেতার ভাষণে কি সেই ইঙ্গিত নেই ?

'শত্রুর শত্রুই আমাদের মিত্র' এই অতি সরলীকরণের রাজনীতির ফাঁদে পা দেয়নি ইন্দোচীনের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। প্রাজ্ঞ কমিউনিস্ট ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতা হো চিমিন সারা ভিয়েতনাম জুড়ে গড়ে তুলেছিলেন

প্রথমে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও পরে জাপানি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। তাঁর সঠিক রণনীতিই ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধকে সারা পৃথিবীর কাছে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। সুভাষচন্দ্রের অতুলনীয় দেশপ্রেম ও বীর্যের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা রেখেও, তাঁর মূল রাজনীতিকে নির্ভুল বলা তাই ইতিহাসবিদদের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সুভাষচন্দ্র আর দৈহিকভাবে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে উপস্থিত নেই। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ১৯৪৫-৪৬ যে গণ বিস্ফোরণ হয়েছিল, জাতীয় নেতৃত্ব তা সঠিক ভাবে ব্যবহার করলে, ভারতবর্ষে ইতিহাসের বৃহত্তম এক গণবিপ্লব সংঘঠিত হত, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। যুদ্ধোত্তর এই গণবিস্ফোরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল কমিউনিস্টরা। তাই যুদ্ধের যুগের তিক্ততা সত্ত্বেও, ১৯৪৫-৪৬-এ কমিউনিস্টরা ও সুভাষপন্থীরা বারবার ব্যারিকেডের লড়াই-এ পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল, ভিত্তি রচনা করেছিল বর্তমানের বামপন্থী মোর্চার।

১৯৪৬-এ চোখে দেখা একটি ঘটনা দিয়েই শেষ করব। নৌ-বিদ্রোহের সময়ে, কলকাতার একটি স্কুলের ছাত্ররা গেটের সামনে প্রাচীর পত্র তৈরি করেছিল উপরে সেনাপতির পোশাকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রর ছবি। তার তলায় 'স্বাধীনতা'য় ছাপা সোমনাথ লাহিড়ীর আগুন ঝরা সম্পাদকীয় 'রক্তের ডাক'। তার তলায় লাল অক্ষরে লেখা 'জয় হিন্দ'। সুভাষচন্দ্র ও কমিউনিস্টদের সম্পর্কের এর চেয়ে চমৎকার মূল্যায়ন আর কি হতে পারে?

পাদটিকা

১। অমৃতবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯১৯
২। দৈনিক বসুমতী, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ১৯১৭
৩। হোম / পল্ / এফ. এম. ২২৯৫, ২৮।১০।১৯১৯
৪। লিওনার্ড গর্ডন : ব্রাদারস এগেনষ্ট দি রাজ, উদ্ধৃতি, পৃঃ ৭১
৫। 'ভারতে বলশেভিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের অধিকর্তা সেসিল কে'র গোপন রিপোর্ট" ১৯২১, পৃষ্ঠা ১-৩
৬। ভি. আই. লেনিন : কালেক্টেড ওয়ার্কস ৩১ খন্ড, পৃঃ ১৪৯-৫০

৭। স্ক্যাম ঃ **'মার্কসিজম্ অ্যান্ড এশিয়া'** লন্ডন, ১৯৬৯

৮। আল্ফ্রেড রোজমার ঃ **'মস্কো ইন লেনিন'স ডেজ,'** পৃঃ ১০৯

৯। **ভ্যানগার্ড** (বার্লিন থেকে প্রকাশিত ও রায় সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক) ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩

১০। ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী (সম্পা) ডকুমেন্টস অব দি হিষ্ট্রি অব দি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া প্রথম খণ্ড

১১। সুভাষচন্দ্র বসু ঃ 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' ১৯৬৪র সংস্করণ, পৃঃ ৬৯

১২। দিলীপকুমার রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃতি—লিওনার্ড গর্ডন ঃ 'ব্রাদার এগেনষ্ট দি রাজ' পৃঃ ৬৩

১৩। হোম / পল্ / এফ. এম. ১০৩-৪

১৪। পূর্বোদ্ধৃত ১৯২৩, পৃঃ ১২-১৩

১৫। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সুভাষ—মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৫২

১৬। তদেব

১৭। সুভাষচন্দ্র বসু ঃ **'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'** পৃঃ ৬৫

১৮। সুভাষচন্দ্র বসু ঃ দি **মিশন অব লাইফ**, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃঃ ১০৭

১৯। ১৯২২র ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে সিঙ্গারাভেলুর বক্তৃতা, পুনঃ মুদ্রিত **লেবার কিষাণ গেজেট**, মাদ্রাজ, ৩১ জানুয়ারি ১৯২৪

২০। এস. এ. ডাঙ্গে ঃ **লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার**, কলকাতা, ১৯৭০।

২১। 'সোস্যালিস্ট' ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ বোম্বাই

২২। **অমৃতবাজার পত্রিকা**, ২ জানুয়ারি, ১৯২৩

২৩। সুভাষচন্দ্র বসু ঃ **'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'** কলকাতা, পৃঃ ৮৮

২৪। ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী (সম্পাঃ) ঃ ডকুমেন্টস্, দ্বিতীয় খণ্ড

২৫। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলনে (১৯২৩) সভাপতির ভাষণ থেকে।

২৬। সেসিল কে ঃ **কমিউনিজম্ ইন ইন্ডিয়া** (জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত গোপন দলিল) ১৯২৬

২৭। হোম / পল / এফ. এন. ১০৩ পার্ট, থ্রি, ১৯২৩ (সেসিল কের গোপন চিঠি ৭।১২।১৯২২)

২৮. **মেইনস্ট্রীম** নয়া দিল্লি, প্রজাতন্ত্র দিবস সংখ্যা ১৯৭৩

২৯. হোম / পল্ / এফ. এন. ৩৭৯-১। (১৯২৪)

৩০. আবদুর রেজ্জাক খান ঃ **সাক্ষাৎকার** ২৯ মে ১৯৭০

৩১. সতীশ পাকড়াশী ঃ অগ্নিদিনের কথা।

৩২. হোম / পল্ / এফ. এন. ৩৬০ বি / ১৯২৪

৩৩. সেসিল কে ঃ গোপন রিপোর্ট ২১ আগস্ট ১৯২৪

৩৪. হেয়ার স্কটের চিঠি ঃ ১৪।২।১৯২৩ হোম / পল্ / এফ. এন. ১০৩। ৩

৩৫. মুজফ্ফর আহমদ ঃ **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ,** পৃঃ ১৭

৩৬. পট্টভি সীতারামাইয়া ঃ **হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস,** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৯

৩৭. তদেব

৩৮. **ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার** ১৯২৮, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫১৩

৩৯. তদেব

৪০. গৌতম চট্টোপাধ্যায় ঃ **স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ**

৪১. পট্টভি সীতারামাইয়া ঃ **হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস,** প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩২

৪২. তদেব

৪৩. সুভাষচন্দ্র বসু ঃ **'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'**, পৃঃ ১৫৭

৪৪. সীতারামাইয়া ঃ **পূর্বোদ্ধৃত,** পৃঃ ৩৩২

৪৫. সুভাষচন্দ্র বসু ঃ 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' পৃঃ ১৫৮

৪৬. 'লেটার টু ইন্ডিয়ান কমিউনিস্টস্ ফ্রম দি একজিকিউটিভ কমিটি অব দি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' ২ ডিসেম্বর, ১৯২৮, (অজয় ভবনের মহাফেজখানায় রক্ষিত)

৪৭. 'ড্রাফট্ প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন অব সি পি আই' **ইনপ্রেকর,** ১৮ ডিসেম্বর ১৯৩০

৪৮. সোমনাথ লাহিড়ী ঃ 'অন্ধকার থেকে আলোয়' কালান্তর বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬৫

৪৯. সুভাষচন্দ্র বসু ঃ 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' পৃঃ ৩১৪

৫০. এম. ডি. পুনেকর : 'ট্রেড ইউনিয়ননিজম্ ইন ইন্ডিয়া,' বোম্বাই ১৯৪৮

৫১. নেহরু : **অমৃতবাজার পত্রিকাতে** প্রকাশিত বিবৃতি, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৩

৫২. সুভাষচন্দ্র বসু : 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' পৃঃ ৩১৩-১৪

৫৩. **দত্ত-ব্র্যাডলি থীসিস**, ইনপ্রেকার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬

৫৪. সুভাষচন্দ্র বসু : সাক্ষাৎকার, 'ডেইলি ওয়ার্কার' লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৮

৫৫. হরিপুরা কংগ্রেসের প্রতিনিধি মন্ডলীর কাছে সি পি আই-এর খোলা চিঠি, ১৯৩৮ (অজয় ভবনের মহাফেজখানায় রক্ষিত)

৫৬. ১৯৩৮, ১৯ ফেব্রুয়ারি হরিপুরা কংগ্রেসে, সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতির ভাষণ থেকে—সিলেক্টেড স্পিচেজ্ অব সুভাষচন্দ্র বসু, ভারত সরকারের তথ্য মন্ত্রক থেকে প্রকাশিত, ১৯৭৪, পৃঃ ৮৭

৫৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৯

৫৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৩৯

৫৯. **ন্যাশনাল ফ্রন্ট**, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

৬০. ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রর সভাপতির ভাষণ থেকে, ১০ মার্চ ১৯৩৯ **সিলেক্টেড স্পিচেজ**, পৃঃ ৯৬

৬১. সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা : ৩ মে ১৯৩৯, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, কলকাতা (**সিলেক্টেড স্পিচেজ**, পৃঃ ১০০-১০৩)

৬২. ১৯৩৯-এর ১৬ মে সুভাষচন্দ্রর বিবৃতি থেকে, **তদেব** পৃঃ ১০৬

৬৩. ন্যাশনাল ফ্রন্ট' ১৯ মার্চ ১৯৩৯

৬৪. 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' ৩০ এপ্রিল ১৯৩৯

৬৫. গোপাল হালদার : সম্পাদক সুভাষচন্দ্র, সপ্তাহ কলকাতা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৩

৬৬. পি. সি. যোশী : 'কমিউনিস্ট রিপ্লাই টু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিস চার্জেস' ১৯৪৫

৬৭. চিন্মোহন মোহানবীশ : রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী

৬৮. ভগৎরাম তলোয়ার : সাক্ষাৎকার : কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ১৯৭৩

৬৯. হরিবিষ্ণু কামাথ : **বিবৃতি** টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি **১৯৫১**

৭০. গৌতম চট্টোপাধ্যায় : **সুভাষচন্দ্র বোস অ্যান্ড ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট মুভমেন্ট**, নয়া দিল্লি ১৯৭৩, পরিশিষ্ট 'D' জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল থেকে।

৭১. জ্যাম বেক : 'আন্তর্জাতিক নেতাজি সেমিনার' নেতাজি ভবন, কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৩—পঠিত প্রবন্ধ

৭২. **সিলেক্টেড স্পিচেজ অব সুভাষচন্দ্র বসু**, পৃঃ ২৪৭

সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৭৬ সালে, আর সুভাষচন্দ্রের জন্ম সাল ১৮৯৭। তাই এঁরা সহপাঠী বা বন্ধু ছিলেন না, হওয়া সম্ভবও নয়। তাছাড়া দুজনেরই গড়ে ওঠার মানসিক স্তর সম্পূর্ণ আলাদা। আর্থিক বা বংশগত কৌলিন্যের কোনোটির ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র সুভাষের ধারে-কাছে আসেন না। তথাপি এই দুই অসমবয়স্কের মধ্যে আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল। আর তা গড়ে ওঠার মূলে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দুজনেই দেশবন্ধুর অনুগামী ছিলেন, সেই অর্থে এরা সতীর্থ। সুভাষ সাহিত্যস্রষ্টা নন, তবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের তিনি অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিলীপকুমার রায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'সুভাষ আমাকে বলেছিল যে জেলে শরৎদার বই পড়েই সে তার মহাভক্ত হয়।'[১] দিলীপকুমার রায় ওরফে মণ্টু শরৎচন্দ্রেরও অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁরও অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি রয়েছে, 'শরৎচন্দ্র কেবল আমার মতো ঝাঁঝালো মানুষের মনই টানেননি—দুজন মহাপ্রাণ মানুষের (দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র) মনও টেনেছিলেন।'[২]

দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতার সূত্র কিন্তু রাজনীতি নয়, সাহিত্য। দেশবন্ধু হবার আগে ব্যারিস্টারির ফাঁকে ফাঁকে চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। তিনি ছিলেন 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকাতেই ১৩২৪ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের গল্পটি এতই ভাল লেগেছিল যে সম্মান দক্ষিণা হিসেবে তিনি শরৎচন্দ্রকে একটি ব্ল্যাংক চেক পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র তাতে কেবল একশ টাকা বসিয়ে নিয়েছিলেন।[৩] সাহিত্যক্ষেত্রে 'নারায়ণ' পত্রিকা ছিল রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্র। 'স্বামী' গল্পটি সম্পাদকের ভাল লাগার কারণও তাই বলেই মনে হয়। এটি কোনোক্রমেই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রায় একই সময়ে রচিত শরৎচন্দ্রের 'একাদশী বৈরাগী' কিন্তু 'নারায়ণে' প্রকাশিত হয়নি। গল্পটি

প্রকাশিত হয় ১৩২৪ সালে কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে', এই গল্পটি 'নারায়ণ' সম্পাদকের কেমন লেগেছিল জানা যায় না। তবে যে কারণে 'স্বামী' ভাল লাগার কথা সেই একই কারণে 'একাদশী বৈরাগী' অপছন্দ হতেই পারে। কেননা এই গল্পের শেষে সনাতন হিন্দুসমাজের বর্ণকৌলিন্য ও রক্ষণশীলতা অস্বীকৃত হয়েছে, স্বামীতে তা হয়নি।

'নারায়ণ' ক্রমশই রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠীর মুখপত্রে পরিণত হচ্ছিল। এই পত্রিকার মাধ্যমেই দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা। তাই পরবর্তীকালে কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই তিনি দেশবন্ধু-সুভাষ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে ওঠেননি, আমাদের ধারণা এই সম্পর্কই প্রথম শরৎচন্দ্রের মনে রবীন্দ্র বিরোধিতার বীজ বপন করে। পরবর্তীকালের নানা ঘটনা এই বিরোধকে তীব্রতর করেছিল মাত্র। শরৎচন্দ্র পাকাপাকিভাবে রেঙ্গুন ত্যাগ করেন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের পর। ১৯১৭ সালেই 'স্বামী' গল্পটি প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের সূচনা। অপরদিকে ১৯১৯ থেকে ১৯২১-এর মার্চ পর্যন্ত ইংলণ্ডে সুভাষচন্দ্রের ছাত্র জীবন অতিবাহিত হয়। এখানে থাকতেই তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে সিভিল সার্ভিসের দাসত্ব নয়, দেশ-সেবাই হবে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। বাংলাদেশে তখন এই আন্দোলনের একচ্ছত্র নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দেশের ডাকে সর্বস্ব ত্যাগ করে তখন তিনি যথার্থই দেশবন্ধু। সুভাষ ইংলণ্ড থেকেই দেশবন্ধুকে একটি চিঠি লিখে জানান যে দেশে ফিরে তাঁরই নেতৃত্বে 'আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া আমি নিজেকে মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিতে চাই।'

দেশবন্ধুর প্রতি সুভাষের এই শ্রদ্ধা ও আনুগত্য শরৎচন্দ্রের সুভাষ প্রীতির অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। দেশবন্ধুর অকালপ্রয়াণে ব্যথিত শরৎচন্দ্র ১৩৩২ সালের আগস্ট মাসের মাসিক বসুমতীর দেশবন্ধু স্মৃতি সংখ্যায় 'স্মৃতিকথা' নামে একটি অসাধারণ আবেগপ্রবণ রচনা প্রকাশ করেছিলেন। এটি পরে তাঁর 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র তখন সুদূর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে অন্তরীণ। সেখান থেকেই ১৯২৫ সালের ১৫ই আগস্ট সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে চিঠিতে লিখলেন,

'শ্রদ্ধাস্পদেষু, মাসিক বসুমতীতে আপনার 'স্মৃতিকথা' তিনবার পড়লাম, বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি। দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করতে পেরেছেন।'[৪] এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতেই শরৎচন্দ্র দিলীপকুমার রায়ের কাছে সুভাষ-প্রশস্তি করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তাঁর (দেশবন্ধু) পাশে ঐ একটি ছেলে আছে মণ্টু যে বড় মন নিয়েই জন্মেছে, সে স্বভাবে শুধু দেশভক্ত নয়, ত্যাগী। তাই, সে দেশবন্ধুর ত্যাগের মহিমা বুঝবে না তো বুঝবে কে? জহুরী না হলে কি জহর চেনা যায়, মণ্টু?'[৫]

মনে হয় দেশবন্ধুর তিরোধানের পর থেকেই শরৎচন্দ্র সুভাষের আরও কাছাকাছি চলে যান। যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাঁর দেশবন্ধুর উপর ছিল তা সুভাষচন্দ্রের ওপরও বর্তেছিল। দিলীপকুমার রায় লিখেছেন, 'তিনি (শরৎচন্দ্র) কথায় কথায় বলতেন সবাইকে ছাড়তে পারি কিন্তু সুভাষকে ছাড়া অসম্ভব।'[৬] শিবপুরে হাওড়া জেলা কর্মী সম্মেলনে সুভাষকে ডাকা হয়নি। উদ্যোক্তাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠরাও ছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সে সভায় যাননি। তাঁর মতে, 'সুভাষহীন সভা ? শিবহীন যজ্ঞ'।[৭] অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েরও মনে হয়েছিল, 'বেশ কয়েক বৎসর (১৯২৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় পর্যন্ত) রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ খুব ছিল, বিশেষত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে হৃদ্যতার জন্যই সম্ভবত।'[৮] প্রথমে দেশবন্ধু এবং পরে সুভাষচন্দ্র এই দুজনের প্রভাবেই শরৎচন্দ্রের রাজনীতির জগতে আসা এবং কিছুদিন টিকে থাকা। তাঁর অন্যতম জীবনী-কার গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন, 'বাজে শিবপুরে থাকাকালেই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি (শরৎচন্দ্র) দেশবন্ধুর আহবানে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তিনি হাওড়ায় থাকতেন বলে দেশবন্ধু তাঁকে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি করেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। মাঝে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি একবার হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগ করতে চাইলে দেশবন্ধু তা করতে দেননি।'[৯]

কিন্তু দেশবন্ধুর থেকে দেশবন্ধু-শিষ্য সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনার

সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা ছিল বেশি। অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, 'সুভাষ-চন্দ্র মান্দালয় থেকে দেশে ফেরার পর যুগান্তর দল মোটামুটি তাঁকে সমর্থন করছিল। কলকাতা কংগ্রেস (১৯২৮)-এর সময় ও পরে বি ভি গ্রুপকে তাঁর পিছনে দেখি। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়ক সূর্য সেন ও তাঁর দলের দু-এক জনের সঙ্গে বসুদের যোগাযোগ ছিল। এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সুভাষের পার্থক্য ছিল। চিত্তরঞ্জন সন্ত্রাস বা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু করপোরেশন ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যপরিচালনায় সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন-নির্ভর ছিলেন। জীবনের শেষে মূলত বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন শক্তি সাধনায় আকৃষ্ট হননি। সুভাষ শাক্ত বৈষ্ণব কোনটাই না হয়েও এবং জীবনের প্রথম ভাগে মোটামুটি বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হলেও স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে যে কোন পথ চলতে প্রস্তুত ছিলেন। গান্ধীর মত লক্ষ্য ও উপায়ের সমতায় কোন বিশ্বাস ছিল না তাঁর।'[১০] শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে দেশবন্ধু ভক্ত, তাঁরই প্রভাবে চরকা, খদ্দর প্রভৃতির অনুগামী হয়েছিলেন। কিন্তু একবছরের মধ্যেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। তাই ১৯২২ সালের ১৪ই জুলাই হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ তিনি পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। আর ১৯২৯ সালে রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে রীতিমতো ব্যঙ্গ করে বললেন, 'সভায় দাঁড়িয়ে খদ্দরের মহিমায় গলা ফাটালেও সে চীৎকার গিয়ে কোনোমতেই পল্লীর নিভৃত অন্তঃপুরে পৌঁছোবে না। (তরুণের বিদ্রোহ)।'

রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্বেই বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর সভা হয়। এখানে শরৎচন্দ্রের সভাপতির অভিভাষণ 'তরুণের বিদ্রোহ' নামে ১৯২৯-এর ১৮ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছিল। নানা কারণেই বক্তৃতাটি মূল্যবান। এখানে শরৎচন্দ্রের পরিবর্তিত রাজনৈতিক মনোভাবের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। এখানে খদ্দর ও চরকা নিয়ে যেমন বিদ্রূপ রয়েছে তেমনি তরুণদের উদ্দেশ্য করে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, 'দেশকে কি বাঁচায় বুড়োরা'? ইতিহাস পড়ে দেখ। তরুণ শক্তি নিজের মৃত্যু দিয়ে দেশে দেশে কালে কালে জন্মভূমিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে গেছে।' নেতৃত্ববদলের ইঙ্গিতটি এখানে সুস্পষ্ট। সুভাষচন্দ্রই তখন দেশের তারুণ্য শক্তির প্রতীক। ঐতিহাসিকের ভাষায়, 'চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক ঐতিহ্য, বাঙালী ভদ্রলোকের হিংসাবাদী, রোমান্টিক, বিপ্লবী মানসিকতা, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও আদর্শবাদ

(যতই ধোঁয়াটে হোক না কেন) সব মিলে সুভাষের যে ভাবমূর্তি তৈরী হয়েছিল, বারংবার গান্ধীনীতির বিরোধিতা করে (মাদ্রাজ ১৯২৭, কলকাতা ১৯২৮ করাচী ১৯৩১) তিনি নিজেই তাকে তরুণদের মধ্যে উজ্জ্বলতর করেছিলেন।[১১]

'তরুণের বিদ্রোহ' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত। সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯২৭-এ দেশে ফিরে আসেন। চিঠির মাধ্যমে পরিচয়ের স্তর ছেড়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঐতিহাসিকের ওপরের মতামতেই এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যে দেশের গোটা তরুণ সমাজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। তাই ১৯২৯-এ রচিত 'তরুণের বিদ্রোহ' বক্তৃতায় শরৎচন্দ্রের তারুণ্য বন্দনা সুভাষচন্দ্রের প্রতিই ইঙ্গিত করে। ১৯২৬-এ রচিত 'পথের দাবী' উপন্যাসে ডাক্তারের কণ্ঠে শরৎচন্দ্রের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার একটি পরিচয় মেলে, 'বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়, বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন। রাজনৈতিক বিপ্লব নয়—সে আমার কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও।' কথাটা বিপ্লবী নায়ক ডাক্তার বলেছিলেন শশী কবিকে। এখানেই শরৎচন্দ্র সর্বপ্রথম রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিকের দায়িত্বের মধ্যে একটা পার্থক্যের সীমারেখা টানতে চেয়েছিলেন। শশী কবিকে তিনি যে সামাজিক বিপ্লবের গান গাইতে বলেছিলেন তা অকারণ নয়। শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে সামাজিক বিপ্লবেরই আহ্বান। ডাক্তারের বক্তব্য আসলে তাঁর স্রষ্টারই বক্তব্য, 'যা কিছু সনাতন, 'যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ', পুরাতন—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার সমস্ত ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক।'

তাই শরৎচন্দ্র যতই দেশবন্ধুর অনুগামী হোন না কেন তাঁর নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সমর্থন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের ধ্যান-ধারণায়। চরকায় স্বাধীনতা আনে এই ধারণাকে উপহাস করে স্বয়ং গান্ধীকে তিনি বলেছিলেন. 'No, I don't believe, I think attainment of swaraj can only be helped by soldeirs and not by stirders.[১২] শুধু তাই নয়, এই সাক্ষাৎকারেই তিনি গান্ধীজীকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন যে কেবলমাত্র তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই তিনি চরকা কাটেন অন্য কোন কারণে নয়, 'I have learnt spinning because I have love for you though not for the charka.[১৩] এত কথা বলবার কারণ এই যে

রাজনৈতিক আনুগত্যের চেয়েও ব্যক্তিগত আনুগত্যকে শরৎচন্দ্র গুরুত্ব দিতেন। তাই সামাজিক-বিপ্লবের প্রবক্তা অনায়াসে চিত্তরঞ্জনের রক্ষণশীল পত্রিকা নারায়ণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, দেশবন্ধুর কাছ থেকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেন, চরকা কাটেন, এমনকি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও হন, কিন্তু সবই হৃদয়ের টানে।

সম্ভবত এই ব্যক্তিগত টানেই কিংবা দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি রবীন্দ্রনাথকে খদ্দর চরকা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগী করতে গিয়েছিলেন এবং যথারীতি ব্যর্থও হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী এই প্রত্যাখ্যানের ফলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাঁর নামে কিছু মিথ্যা বা কুৎসা প্রচারেও দ্বিধা করেননি, 'আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই হয়ত কতকগুলো মিথ্যা প্রচার করিয়া থাকিব।' ১৩২৯ সালের ২৬শে বৈশাখে লিখিত চিঠিতে শরৎচন্দ্র এই কুৎসার বর্ণনাও দিয়েছেন, 'অন্তত, এসব নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন এবং বাংলাদেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্বের যে স্নেহ-মমতা আর নাই। চরকা, নন কো-অপারেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।'[১৪] আগ বাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে এত কথা শুনিয়ে দেওয়া এবং কিছু পরেই এই জাতীয় অপরাধ স্বীকারের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শরৎচন্দ্র আসলে রাজনীতির লোকই নন। এই ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা চালিত হয়েই তিনি একদা স্কুল-কলেজ বর্জন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতের তীব্র বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। মান্দালয় জেল থেকে ১৯২৫-এর ১লা আগস্ট শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিতে সুভাষচন্দ্র 'রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রানুরাগীদের জীবনে ও সাহিত্যে যে শূন্যগর্ভ অগভীর আন্তর্জাতিকতাবাদের স্ফুরণ দেখা যায় এবং যে আন্তর্জাতিকতাবাদ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের মূল সত্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম' তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের প্রতিবাদে লিখিত শরৎচন্দ্রের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধেরও আক্রমণের লক্ষ্য একই।

শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধটি 'নারায়ণ' পত্রিকার ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব এটি যতটা ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের মনোভাব তার চেয়েও বেশি তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দৃষ্টি-

ভঙ্গিরও প্রতিফলন। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করেছিলেন, 'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ নয়।' শরৎচন্দ্রও বিশ্বাস করতেন যে বয়কট আন্দোলনের ফলে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে। আবার বিরোধী গোষ্ঠীর অন্যতম মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর উত্তরে জানিয়েছিলেন যে শিক্ষা ছাড়া স্বরাজ এক বছরেও লাভ করা যায় না বা একদিনও রক্ষা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ তো স্কুল-কলেজ বর্জনকে 'নিছক শূন্যতার নৈরাজ্য' বলেছিলেন, এই বর্জনের আহ্বানকে তাঁর মনে হয়েছিল 'tyranny over the minds of the people', উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধটি লেখার গোষ্ঠীগত বাধ্য-বাধকতা এখানে স্পষ্ট। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তখন স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, এসমস্ত ক্ষেত্রে চিরকালই তিনি তাই। তাই তাঁরই ভাষায় 'মাতৃভূমিতে একাকী নির্বাসন' দণ্ড তাঁকে প্রায় চিরকালই ভোগ করে যেতে হয়েছে। আর শরৎচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধু ও তাঁর ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্রের আড়ালে। তখনকার বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবেই দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির দখলে। ১৯২৩ এর ৫ই মে মতিলাল নেহরুকে এক চিঠিতে দেশবন্ধু জানালেন যে বাংলা তাদের মুঠোয় এসে গেছে। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে ওই বছরেরই জুন মাসে বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহায়তায় দেশবন্ধু বি. পি. সি. সি. দখল করে ফেললেন।[১৫]

এই গোষ্ঠীভাবনার প্রভাবই শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাঁর সাহিত্যিক সত্তা অবশ্যই স্বীকার করে, 'আমার চাইতে বড় ভক্ত কেউ নেই। আমার চাইতে তাঁকে কেউ মানেন নি গুরু বলে আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না। কিন্তু সবার চাইতে বেশীবার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর পত্রগুচ্ছ (অমল হোমকে লেখা চিঠি)।' স্বভাব সুলভ অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও এর মধ্যে শরৎচন্দ্রের গুরু ভক্তি স্পষ্ট, কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ সঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের ভক্তি ছিল, কিন্তু শ্রদ্ধা ছিল না ; 'তবু ছিল ভক্তি ঠিক শ্রদ্ধা নয়। এই শ্রদ্ধার অভাবই হলো বৈপরীত্য বোধের প্রথম কারণ; তারপর লেখার বৈপরীত্য।"[১৬] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রবোধকুমার সান্যালকে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে 'তার সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে

তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হত।'[১৭] ওই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে কেবল 'অকৃত্রিম শ্রদ্ধার গুণে বয়সের বাধা পেরিয়ে সত্যেন্দ্র আমার কাছে আসতে পেরেছিলেন।' অকথিত উক্তিটি হল শরৎচন্দ্র তা পারেননি, কারণ ধূর্জটিপ্রসাদ কথিত ঐ 'শ্রদ্ধার অভাব।'

শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাটি পেয়েছিলেন প্রথমে দেশবন্ধু ও পরে সুভাষচন্দ্র। সুভাষকে কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার করার পর দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন I have sacrificed my best man for this corporation. দেশবন্ধুর অকাল-প্রয়াণের পর তাঁর এই best man টির প্রতিই স্বাভাবিক কারণে শরৎচন্দ্রের আকর্ষণ অব্যাহত ছিল। এই সুভাষ প্রীতির জন্যই তিনি বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক দলাদলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যুর পর বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতিতে চরম দলাদলির সূচনা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী এই সংকট নিরসনের জন্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি করলেন। যতীন্দ্রমোহন একই সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বভার পেলেন। কিন্তু এতে সংকট আরও বাড়ে। ক্রমশঃ বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতি 'পঞ্চ প্রধানে'র হাতে চলে যায়। এঁরা হলেন শরৎচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার ও তুলসী গোস্বামী। যতীন্দ্রমোহন বিরোধী এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্যই ছিল বি. পি. সি. সি-র নেতৃত্ব দখল এবং তার মাধ্যমে কাউন্সিল ও কর্পোরেশন দখল করে ফেলা। এই উদ্দেশ্যে এঁরা সুভাষচন্দ্র ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের মতো নেতাদের হাত করে ফেলেন। সমসাময়িক কালের এই 'ক্যাপচারের রাজনীতি'-র সঙ্গে শরৎচন্দ্র ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতি তখন তিনি এতটাই আকৃষ্ট যে অনায়াসে যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর গোষ্ঠীর বিরোধিতায় নামতে দ্বিধা করেন নি। ১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে একদিকে যেমন পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তেমনি অপরদিকে যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষের দলবল সেখানে সভাপতির কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়েও গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সেখানে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কথা

বলবার জন্য দলবল নিয়ে হাজির। ১৩৩৬ সালের ২৫শে কার্তিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'জানুয়ারী মাসে যদি কাশীতে একবার যান-তো আমি লাহোরের ফিরতি নেমে যাবো।'[১৮] যাকে সরাসরি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে শরৎচন্দ্র তাতেও কীভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তার প্রত্যক্ষ নিদর্শনও আছে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৩৩৮ এর ৫ই আষাঢ়ের চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'কাল আমাদের হাওড়ার জেলা কংগ্রেস ইলেকসন হয়ে গেলো। এবার বিরুদ্ধ দলের সোরগোল, গালিগালাজ ও লাঠি ঠকঠকি দেখে ভেবেছিলাম হয়ত বিনা রক্তপাতে শেষ হবে না। আমি প্রেসিডেণ্ট, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হতে হয়েছিল।' এই প্রস্তুতিটা কি তা সহজেই অনুমান করা যায়। ওই চিঠিতেই একটু পরিহাসের সুরে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'আমাদের, অর্থাৎ সুভাষী দলের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা।'[১৯] এই সভাটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৩৩৮-এর ৩রা আষাঢ় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় হাওড়ায় মধুসূদন পাল চৌধুরী লেনে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য এই সভা। কিন্তু এখানে দুই গোষ্ঠী দুটি আলাদা কর্ম-সমিতি নির্বাচিত করে। ১৯৩১-এর ১৯শে জুন ইংরেজি দৈনিক লিবার্টি লেখে যে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু ওই দিনই আনন্দবাজার পত্রিকায় বিরোধী-দলের খবর ছাপা হয়েছিল যে তাঁরা রিকুই-জিশন সভা ডেকেছেন এবং শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

দিলীপকুমার রায়কে ১৩৩৮-এর ৩০শে বৈশাখ শরৎচন্দ্র যে চিঠি লিখে-ছিলেন তাতেও দেখা যাবে যে কুমিল্লা সহরে ত্রিপুরা জেলা রাজনৈতিক কর্মী-সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচিত করতে গিয়ে তাঁকে কম অপমান সহ্য করতে হয়নি। রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের আগে ঐ সভামণ্ডপেই ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে শরৎচন্দ্রকে এই ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি করা হয়েছিল। এই সময় যুগান্তর পার্টির ছাত্রসমিতির নাম ছিল বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেণ্টস অ্যাসোসিয়েশন। এদের নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র। আর অনুশীলন পার্টির ছাত্রসমিতির নাম ছিল অল বেঙ্গল স্টুডেণ্টস অ্যাসোসিয়েশন। এঁদের প্রধান নেতা ছিলেন যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত। ১৯৩১-এর ৬ই মে সকালে সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিপিন-বিহারী গাঙ্গুলী, বিমল প্রতিভা দেবী, কুন্তিগীর গোবর গুহ প্রভৃতিরা চিটাগং

মেলে শিয়ালদহ থেকে কুমিল্লা রওনা হন। কুমিল্লার পথে চাঁদপুরে গাড়ি পেঁছোলে সেখানকার অনুশীলন পার্টির ছাত্র সমিতির কিছু সদস্য স্টেশনে গাড়ির কাঁচ ভেঙে সুভাষ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতির ওপর কয়লার গুঁড়ো ছুঁড়ে শেম শেম ধ্বনি দিয়ে বিক্ষোভ জানায়। অবশ্য কুমিল্লায় পেঁাছে তাঁরা বিপুল অভিনন্দনও লাভ করেছেন। দিলীপকুমার রায়কে ঘটনার বিবরণ দিয়ে শরৎচন্দ্র পরিহাস করে লিখেছিলেন, 'পথে একদল শেম শেম বললে, গাড়ীর জানলার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতিজ্ঞাপন করলে, আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে গুঁড়োটা কিছুই নয়, ও মায়া।'[২০]

রাজনীতির আসরে ঠুনকো মর্যাদা বোধের কোনো গুরুত্ব নেই। অন্তত এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র মানসম্মানের ধার ধারেননি। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সুভাষচন্দ্রকে সভাপতির পদে নির্বাচিত করা। এর কাছে ব্যক্তিগত মর্যাদা তুচ্ছ। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁরই প্রচেষ্টায় কর্মকর্তা নির্বাচনে আপস হয় এবং সুভাষচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে ত্রিপুরা জেলা রাজনৈতিক কর্মীসম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এইভাবে সরাসরি সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রকে মূল্যও কম দিতে হয়নি। প্রধানত সুভাষপন্থীদের উদ্যোগেই শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্ম জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল ১৩০৯ সালের ৩১শে ভাদ্র কলকাতার টাউন হলে। কিন্তু তাঁর বিরোধী অ্যাডভান্স গোষ্ঠী এটি বানচাল করার জন্য ওইদিনই টাউন হলে হিজলী জেলে নিহত দুই রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্যু দিবস পালনের ডাক দেন। তাই সেদিনের শরৎ সংবর্ধনা সভা বানচাল হয়ে যায়। স্বয়ং শরৎচন্দ্রকে টাউন হলের প্রবেশ পথ থেকে ফিরে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত জয়ন্তী উৎসবটা অনুষ্টিত হয় ২রা আশ্বিন। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শরৎচন্দ্র অমল হোমকে চিঠিতে লিখেছিলেন, '...তুমি যে সেদিন টাউন হলে থাকতে পারনি, তাতে তোমার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ। সেদিন যারা ভণ্ডুল করেছিল রবীন্দ্র জয়ন্তীর সময়েও তারাই ছিল। তারা সাহিত্যিক। তাদের আমি চিনি—তুমিও চেন। তারা সেবার পারেনি—এবার পেরেছে। আশ্চর্য হইনি। রবিবাবুর অমল হোম ছিল, আমার নেই, কিংবা থেকেও ছিল না।'[২১] শরৎচন্দ্রের ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু এ লড়াই রবি-গোষ্ঠী ও শরৎ গোষ্ঠীর লড়াই ছিল না। তাই রবি অনুরাগী অমল হোমের

এখানে সক্রিয় ভূমিকা থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনা সভা বিশেষ করে সুভাষ বিরোধী গোষ্ঠীই আড়ালে থেকে বানচাল করেছিলেন। এদের সবাই সাহিত্যিক নন। ফরওয়ার্ড ও অ্যাডভান্স গোষ্ঠীর সম্পর্কের কথা সকলেরই জানা। শরৎচন্দ্রেরও অজানা নয়। তবে এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি নিজের রাজনৈতিক পরিচয়কে গুরুত্ব দিতে চাননি।

আসলে শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক প্রধানত ব্যক্তিগত, গৌণত রাজনৈতিক। তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিক মতবিনিময়ের তেমন পরিচয় পাওয়া যায়নি। সুভাষচন্দ্র অবশ্যই শরৎচন্দ্রের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। কিন্তু শ্রী অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁর শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণীতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের দেশবন্ধু সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য রচনা রয়েছে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ওপর কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা এই তালিকায় চোখে পড়েনি। অপর দিকে শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর ওপর আলাদাভাবে সুভাষচন্দ্রের কোনো লেখার উল্লেখ এই তালিকায় নেই। কেবল তাঁর মৃত্যুর পর ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্র 'আদর্শ মানব শরৎচন্দ্র' নামে রচনায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই সেটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন, সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কিন্তু 'পথের দাবী' প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয়। উপন্যাসটি নিষিদ্ধ হয় ১৯২৭-এর ৪ঠা জানুয়ারী। সুভাষ মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরেন এই সময়েই। 'পথের দাবী' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বিতর্কের কথা সকলেরই জানা, এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অনুরোধ করেছিলেন। এই অনুরোধ স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাখ্যানে তাঁর ক্ষোভের যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর প্রিয় সুভাষকে এব্যাপারে কোনো অনুরোধ করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। ফরওয়ার্ড গোষ্ঠী বা পঞ্চ প্রধানের এ ব্যাপারে কি ভূমিকা ছিল তা জানলেও ভাল হত। হয়তো নিদর্শন কিছু আছে। এটি সন্ধান সাপেক্ষ।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯৩৮-এর ১৬ই জানুয়ারী। তাই ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারীতে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের গৌরবোজ্জ্বল উত্থান তিনি দেখে যাননি। তবে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে সুভাষ পরলোক-

গত শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ট্র্যাজেডিও শরৎচন্দ্র দেখে যাননি। তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবেই বেদনাবোধ করতেন, হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁরও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যেত। শরৎচন্দ্রের তিরোধানে সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধাঞ্জলির কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর দান ছিল এবং সেই সূত্রেই শরৎচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময় যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ....যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন সরকার ও পুলিশ তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। 'পথের দাবী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, তিনি যে কারারুদ্ধ হন নাই ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কারাবাসজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইতে পারিত। সমাজে যাহারা বঞ্চিত ও উপদ্রুত, তাঁহাদের প্রতি সমবেদনাই শরৎসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় প্রেরণা।...তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী, তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির যুবসমাজের নিকটে এই বাণীই তিনি ছড়াইয়াছেন (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৪)।'

এটি গতানুগতিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ভূমিকার বিশ্লেষণও বটে। রাজনীতিতে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সুভাষকে খুশি করেছিল। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি। রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়ে শরৎচন্দ্র কারারুদ্ধ হলে তাঁর শুধু অভিজ্ঞতাই বৃদ্ধি হত না, তাঁর সাহিত্যও সমৃদ্ধতর হত—সুভাষচন্দ্রের এই ধারণা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। অন্তত, 'পথের দাবীর' আবেগসর্বস্বতা এই বিশ্বাসের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। দিলীপকুমার রায়ের সাক্ষ্যেও দেখা যাবে যে সুভাষ শরৎচন্দ্রকে কখনো বি, পি, সি, সির সভাপতি হবার, কখনো আইন অমান্যে নামবার অনুরোধ জানাচ্ছেন আর শরৎচন্দ্র জেলে আফিং পাওয়া যায় কিনা এইসব প্রশ্ন তুলে পরিহাস করে তা উড়িয়ে দিচ্ছেন।[২২] উপরোক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলিতেই সুভাষচন্দ্র একটি কথা উল্লেখ করেছেন, 'একদিনের কথা আমার মনে আছে, একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলেন, 'কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্তব্য নহে। শরৎচন্দ্র তাঁহাকে

হাসিয়া বলেন, 'আমি কিছুদিন কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।' মন্তব্যটি সুভাষচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু 'কিছুদিনের' বদলে 'চিরদিন' যে তাঁর পছন্দ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্যিক আর রাজনীতিবিদের এই মানসিক পার্থক্য চিরকালের। এর কোনো সমাধান নেই। এর পাশাপাশি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের প্রত্যাশাটিও খোঁজা দরকার। স্পষ্টভাষায় না বলা হলেও তাঁর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে এর ইঙ্গিত রয়েছে, 'যেদিন ভারতের স্বাধীনতার জন্য life and death struggle আরম্ভ হবে আমি বলছি তোমরা দেখ, সে সময় নিশ্চয় lead করবে বাঙালী। এ আমার wishful thinking নয়—এ আমার অন্তরের conviction,' সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী ভূমিকায় এই coaviction' এর সত্যতা প্রমাণিত। তিনি ছাড়া মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার মতো 'বাঙালী' তখন আর কে-ই বা ছিলেন ?

———

তথ্যসূত্র

১. স্মৃতিচারণ, দিলীপকুমার রায় (২য় খণ্ড), পৃঃ ৯৫

২. তদেব, পৃঃ ১৭

৩. শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, পৃঃ ১৫৩

৪. স্মৃতিচারণ, দিলীপকুমার রায় (২য়), পৃঃ ১৯

৫. তদেব, পৃঃ ২০

৬. ও ৭. তদেব, পৃঃ ১৭

৮. তরী হতে তীর, পৃঃ ৭৫

৯. শরৎরচনাবলী (১ম), শরৎসমিতি, পৃঃ ৫৯৬

১০. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, অমলেশ ত্রিপাঠী পৃঃ ২৪২

১১. তদেব, পৃঃ ২৪১

১২ ও ১৩. শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় উদ্ধৃতি, পৃঃ ৯৪

১৪. শরৎচন্দ্র (৩য়), চিঠিপত্র, গোপালচন্দ্র রায় সংকলিত

১৫. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, অমলেশ ত্রিপাঠী পৃঃ ১২১
১৬. ঝিলিমিলি, ৭. ১২. ৫৯
১৭. ভারতবর্ষ, ১৩৪৪ চৈত্র
১৮. চিঠিপত্র, গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত, পৃঃ ২২১
১৯. তদেব
২০. তদেব
২১. অমল হোমকে লিখিত পত্র, পৃঃ ১০০, শরৎচন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মদনমোহন কুমার সম্পাদিত
২২. স্মৃতিচারণ (২য়), পৃঃ ৯৫—৯৬
২৩. শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, শচীনন্দন পৃঃ, ৯৪ (উদ্ধৃতি)

———

সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল

প্রশান্তকুমার ঘোষ

তিরিশের দশকের সূচনা থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদী মতাদর্শে আস্থাবান কয়েকজন নেতা সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন এবং মিনু মাসানি। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার পরে আইনসভার নির্বাচনে যোগদান সমর্থন করে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। দক্ষিণপন্থী নেতাদের আপসকামী মনোভাবের বিরুদ্ধে ১৯৩৩ সালে নাসিক জেলে বন্দী সমাজবাদী নেতারা কংগ্রেসের ভিতরে একটি সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন; তাঁরা চেয়েছিলেন যে এই গোষ্ঠী একটি 'ginger group' হিসাবে কাজ করবে। অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের ভাষায় সমাজতন্ত্রীদের উদ্দেশ্য ছিল "(to) give Congress and the national movement a socialist direction" এবং এই উদ্দেশ্যে "they must organize the workers and peasants in their class organizations and make them the social base of the anti-imperialist struggle."[১]

১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা হল। প্রত্যক্ষভাবে এই দলে যোগ না দিলেও জওয়াহরলাল নেহরু প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্রীদের নীতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সহানুভূতি-শীল ছিলেন। এই সময়ে তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় এই সহানুভূতির ছাপ স্পষ্ট।[২]

পাটনায় সমাজতন্ত্রী দলের সম্মেলনের বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই সরকারি নির্দেশে সুভাষচন্দ্র ইয়োরোপে নির্বাসিত। কারাগারে বন্দী অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতিতে বিব্রত ভারত সরকার তাঁদেরই নিযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শে সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য ইয়োরোপে পাঠানর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন;—অবশ্য সমস্ত আর্থিক দায়ভার

সুভাষচন্দ্রকেই বহন করতে হয়েছিল। সমাজতন্ত্রী দল যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা-তে চিকিৎসাধীন ; গভীর উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে তিনি ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করছিলেন। **The Indian Struggle** এর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলি তাঁর এই উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের পরিচয় বহন করে। গান্ধীজি ও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের আন্দোলন-বিমুখ কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্র যে সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করবেন, এ-প্রত্যাশা ছিল স্বাভাবিক। ১৯৩৫ সালের ১৫ই মার্চ ভিয়েনা থেকে ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া-কে পাঠান একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে সমর্থন জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এই সমর্থন ছিল সতর্ক এবং বেশ দ্বিধাগ্রস্ত। সমাজতন্ত্রী দলের নেতারাও সুভাষচন্দ্রকে কোন সময়েই তাঁদেরই একজন বলে মনে করতে পারেননি, যেমন তাঁরা পেরেছিলেন জওয়াহরলাল নেহরুর ক্ষেত্রে। বস্তুত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী দলের আট বছরের (১৯৩৪—৪১) সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উভয় পক্ষেই অনুরাগ ও বিরাগের এক বিচিত্র মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দল সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের উল্লিখিত বিবৃতিটি নানা কারণেই প্রণিধানযোগ্য। দক্ষিণপন্থী নেতাদের সংগ্রামবিমুখ আপসকামী নীতির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিবাদী ভূমিকার গুরুত্ব তিনি স্বীকার করলেন।[৩] কিন্তু তিনি আপত্তি জানালেন 'সমাজতন্ত্র' অভিধা সম্পর্কেই, কারণ হিসাবে তিনি তত্ত্ব ও প্রয়োগে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপজনিত সমস্যার উল্লেখ করলেন। সুভাষচন্দ্রের মতে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল 'ফেবিয়ান' মতাদর্শে আচ্ছন্ন,—এই মতাদর্শ সাম্প্রতিককালে অচল।[৪]

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য সমাজতন্ত্রীরা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ; এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্র বললেন যে বর্তমান অবস্থায় এ-ধরনের গণপরিষদ গঠিত হলে সমাজতন্ত্রীরা তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন না। তাই সমাজতন্ত্রী দলকে দাবি করতে হবে যে একমাত্র তাদেরই ভারতের সংবিধান রচনা করার অধিকার আছে। তাঁর ভাষায় "The party that is goung to fight for freedom is the party that is entitled to draw up the Constitution."[৫]

লক্ষণীয় এই যে দীর্ঘ বিবৃতিতে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের 'অস্বচ্ছতার' সমালোচনা করলেও সমাজতন্ত্রী দলের কার্যসূচিতে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সংগঠনের যে-প্রস্তাব করা হয়েছিল সে-বিষয়ে সুভাষচন্দ্র নীরব। এই সময়ে তিনি চেয়েছিলেন যে সমাজতন্ত্রীদের প্রধান ভূমিকা হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে প্রাগ্রসর আপস-বিরোধী সমস্ত গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করার হীনম্মন্যতা পরিত্যাগ করে কংগ্রেস সমাজবাদী দলকে ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থ-রাজনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

সমাজতন্ত্রী নেতারা কিন্তু প্রথম থেকেই কংগ্রেসের ভিতরে থেকে তাঁদের আন্দোলন পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রী দলের জাতীয় সম্মেলনে এই প্রসঙ্গে আচার্য নরেন্দ্র দেওর ভাষণ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, "আমরা জানি কংগ্রেসের শত ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে, তবু আজ দেশে এটাই বৃহত্তম শক্তি। এ কথা মনে রাখতে হবে, জাতীয় সংগ্রামের এই পর্ব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে, কাজেই এখন জাতীয় আন্দোলন ও তার প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে।" [৬]

১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতির অভি-ভাষণে সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রীদের কংগ্রেসের ভিতরে থেকে জাতীয় আন্দোলনকে সমাজতন্ত্রমুখী করার প্রয়াসকে সমর্থন জানালেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—"আমি কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দলের তরফে কোন বক্তব্য পেশ করছি না ("I hold no brief for the Congress Socialist Party)—আমি এই দলের সদস্য নই। কিন্তু প্রথম থেকেই আমি এদের মূল সিদ্ধান্ত এবং নীতির বিষয়ে সহমত পোষণ করি।....ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধানে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে একটি বামপন্থী গোষ্ঠীর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক কর্মধারা অনুসরণ করা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব....কিন্তু সমাজতন্ত্রী দল বা অনুরূপ অন্য কোন দলের ভূমিকা হবে একটি বামপন্থী গোষ্ঠীর ভূমিকা। সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আশু কোন সমস্যা নয়—তবু সমাজবাদী প্রচারের দরকার আছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরে দেশকে সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করার কারণে এবং এ-ধরনের প্রচার কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মতো দল-ই করতে পারে—কারণ তারা সমাজবাদে আস্থাবান।"

বস্তুত কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশন (১৯৩৮) থেকে পরের বছর ত্রিপুরি অধিবেশনের প্রারম্ভ পর্যন্ত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল অতীব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু পারস্পরিক সৌহার্দ্যের এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায় শেষ হল কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশনে দক্ষিণপন্থী এবং গান্ধী সমর্থিত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়-বারের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেই। অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল-ও সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিল। সমস্যার সৃষ্টি হল প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি আলোচনার সময়। সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসের সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলার নীতি অনুসরণ করে 'জাতীয় দাবি' সংবলিত প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। 'জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে' (অর্থাৎ দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংঘাতের পথ পরিহার করে) প্রস্তাবে একটি প্রাগ্রসর (Forward) কার্যসূচি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। নবনির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র তখন জ্বরে শয্যাশায়ী ; শরৎচন্দ্র বসু 'জাতীয় দাবি' প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় সমাজতন্ত্রীরা বিব্রত এবং হতাশ হলেন। এরপর তীব্র বাদানুবাদ এবং প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার[৮] মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে গোবিন্দ-বল্লভ পন্থ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন ; এই প্রস্তাবে গান্ধী নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়ে কংগ্রেস সভাপতিকে নির্দেশ দেওয়া হল গান্ধীজির ইচ্ছানুসারে পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোনীত করতে।

এই প্রস্তাব বামপন্থীদের কাছে নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা এখনও যেকোন অবস্থায় জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার নীতিতে অবিচল ; দক্ষিণপন্থীরা সুচতুরভাবে সমাজতন্ত্রীদের 'জাতীয় দাবি' প্রস্তাবে উল্লিখিত 'প্রাগ্রসর' কর্মসূচি সমর্থনের শর্ত হিসাবে পন্থ প্রস্তাবে তাদের সম্মতির দাবি জানালেন। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে আলোচনার সময় সমাজতন্ত্রীরা পন্থ প্রস্তাবে অনেকগুলি সংশোধন আনতে চেয়েছিলেন। সংশোধনে মূল প্রস্তাবে উল্লিখিত সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার সমালোচনা-সংক্রান্ত অংশটি এবং পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে গান্ধীজির ইচ্ছা অনুসরণের নির্দেশ বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। দক্ষিণপন্থীরা কিন্তু সম্পূর্ণ অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন "একটি কমা-ও বাদ দেওয়া যাবে না ! (Not a comma less)—এই পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রীরা পন্থ প্রস্তাবের সরাসরি বিরোধিতা না করে ভোটের সময় নির-

পেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

পন্থ প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জয়-প্রকাশ নারায়ণ কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তাঁর ভাষণে যে-যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন তা স্বভাবতই সমাজতন্ত্রীদলের ভিতরে এবং সাধারণভাবে বামপন্থী মহলে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। জয়প্রকাশ বলেছিলেন, "যদিও আমাদের দল (সভাপতি নির্বাচনে) সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিল, আমরা কিন্তু এই নির্বাচনকে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসন বলে মনে করিনি।…কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন আমরা চাইনি। আমরা মনে করি যে পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটি যদি গান্ধীজির ইচ্ছা অনুযায়ী গঠিত না হয় তাহলে কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষা করা যাবে না।"[৯]

১৯৩৯ এর জুলাই মাসে দিল্লীর সমাজবাদী সম্মেলনে ত্রিপুরি কংগ্রেস অধিবেশনে পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে সমাজতন্ত্রী দলের বিচিত্র আচরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য নরেন্দ্র দেও বলেছিলেন বামপন্থীদের এখনকার অনৈক্য এবং দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রীরা বিরুদ্ধে ভোট দিলেও পন্থ প্রস্তাব অনিবার্যভাবেই গৃহীত হত।[১০]

পন্থ প্রস্তাবের উপর ভোটের সময় সমাজতন্ত্রী দলের নিরপেক্ষতার সমর্থনে যে-যুক্তি বা ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, সমাজতন্ত্রীদের আচরণ যে বাম আন্দোলনে প্রচণ্ড বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-ঘটনার তিন বছর পরে সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে তাঁর The Indian struggle গ্রন্থের বাকি অধ্যায়গুলি রচনা করতে গিয়ে ১৯৩৫-৪২ সালের ঘটনালীর পর্যালোচনা করেছেন; ত্রিপুরিতে সমাজতন্ত্রী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য আশ্চর্যরকম সংযত। তিনি বলেছেন ঃ

"সমস্ত বামপন্থীদের আস্থা অর্জন করতে পারে এমন কোন দল বা গোষ্ঠী তখন ছিল না।….বামপন্থীদের মধ্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলই ছিল প্রধান, কিন্তু তার প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। উপরন্তু যখন বর্তমান লেখক (সুভাষচন্দ্র) আর গান্ধী-অনুগামীদের মধ্যে সংঘাত শুরু হল, তখন সমাজতন্ত্রীরা দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল বামপন্থী কোন দল না থাকায় এই লেখকের পক্ষে তখন (কংগ্রেসের ভিতরে থেকে) গান্ধীপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অসম্ভব ছিল।"[১১]

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে সংকটের সময় নেহরুর বিতর্কিত ভূমিকাকে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল বলে সুভাষচন্দ্র অন্যত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[১২]

দক্ষিণপন্থীদের ক্রমাগত বাধার সম্মুখীন হয়ে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তাঁর কাঙ্ক্ষিত সংহত ও সুশৃঙ্খল আপস-বিরোধী অগ্রণী গোষ্ঠী হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৩৯এ রামগড়ে স্বামী সহজানন্দের কিসান সভার সঙ্গে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত আপস-বিরোধী সম্মেলনে দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে তীব্রতর করার আহ্বান জানান হল। সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সমস্ত বামপন্থী দল এবং গোষ্ঠীকে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল তখনও যেকোন মূল্যে কংগ্রেস ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার নীতিতে অবিচল।

বিকল্প হিসাবে সুভাষচন্দ্র একটি বামপন্থী সমন্বয় কমিটি (Left Co-ordination Committee—LCC) গঠনের প্রস্তাব করলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে (জুন, ১৯৩৯) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কমিউনিস্ট পার্টি এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীরা ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে মিলিতভাবে LCC গঠনে সম্মত হয়ে একটি ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করলেন।[১৩] বর্তমান বামফ্রণ্টের পুরোধা হিসাবে LCC-র গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাম সমন্বয় সমিতি সদস্য-গোষ্ঠীগুলির ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করবে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল—কিন্তু প্রথম থেকেই এই ঐক্যের ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হতেই সুভাষচন্দ্রের দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম আরম্ভ করার প্রস্তাবে শরিক দলগুলির মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হল। বামপন্থীরা যুদ্ধের সময় এ-ধরনের সংগ্রামের বিরোধিতা করলেন ; সমাজতন্ত্রীরা 'কংগ্রেস ঐক্যের' কথার পুনরাবৃত্তি করে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তাব দিলেন। LCC র কমিউনিস্ট সদস্যেরা ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের প্রভাবমুক্ত হয়ে সংগ্রাম করার প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাব সমর্থনের জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে কমিউনিস্ট নেতা পূরণচাঁদ জোশি যে আবেদন পাঠিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যাত হল। গান্ধী ও কংগ্রেস-বিরোধী

যে-কোন বামফ্রন্ট গঠনে জয়প্রকাশের তখনও প্রচণ্ড আপত্তি ছিল।[১৫]

LCC প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র আবার কারারুদ্ধ হলেন (জুলাই ১৯৪০)। এদিকে গান্ধী তখন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করেছেন। তবে ১৯২১ এর অসহযোগ আন্দোলন বা ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা এই আন্দোলনে ছিল না। এই পরিস্থিতিতে দেশের ভিতরে থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলেন।

১৯৪০এর শেষে যখন তাঁর বাসভবনে গৃহবন্দী অবস্থায় মহানিষ্ক্রমণের পরিকল্পনা রচনা প্রায় শেষ, এমন সময়ে সুভাষচন্দ্রের কাছে কারারুদ্ধ জয়-প্রকাশ নারায়ণ একটি অস্বাক্ষরিত গোপনপত্র পাঠালেন।[১৬] 'প্রিয় কমরেড' সম্বোধন দিয়ে এই চমকপ্রদ পত্রটির সূচনা এবং সমস্ত বক্তব্যে আত্মসমালোচনার সুর স্পষ্ট। রামগড়ে তাঁরা ভুল করেছিলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে চলার নীতি ভুল ছিল—এই সব অকপট স্বীকারোক্তির পরে জয়প্রকাশ প্রস্তাব করলেন যে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আপসকামী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে—ভারতে সমস্ত বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নীতি অনুসারী একটি বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য তিনি কমিউনিস্ট দের এই প্রস্তাবিত দল থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর মতে তাদের গঠনতন্ত্র এবং কমিণ্টার্নের বিধান অনুযায়ী তাঁরা অন্য কোন সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন না।

চিঠির শেষে সুভাষচন্দ্রকে প্রস্তাবিত বিপ্লবী দল গড়ায় সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে জয়প্রকাশ বলেছিলেন, "আপনি চাইলেই এ-ঘটনা সম্ভব।"[১৭]

এ-চিঠি যখন সুভাষচন্দ্র পেলেন তখন কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। ১৯৪০ এর শেষে সুভাষচন্দ্র 'মহানিষ্ক্রমণের' জন্য প্রস্তুত। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা যদি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতেন তাহলে হয়তো স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বামপন্থী নেতৃত্বে একটি নূতন এবং উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত হত। সুভাষচন্দ্রের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে যে-সত্য ১৯৩৮-৩৯এ ধরা পড়েছিল সমাজতন্ত্রী নেতারা তা উপলব্ধি করলেন অনেক পরে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের তখনকার কাহিনী তাই বিলম্বিত উপলব্ধির কাহিনী॥

উল্লেখ পঞ্জি / ১

(১) Girja Shankar, **History of Socialist Party,** Jodhpur, Twenty First Century Publishers (1995) গ্রন্থে বি চন্দ্রের প্রাক্‌কথন পৃঃ vii।

(২) এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁর **The Indian Stɹuggle** গ্রন্থে এই সময়ের বর্ণনায় বিশেষভাবে জওহরলালের **Whither India?** রচনাটির উল্লেখ করেছেন। **The Indian Struggle** (নেতাজি সমগ্র রচনাবলি—দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ২৯০।

(৩) "Congress Socialist Party"—The Indian Struggle এর (নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে প্রকাশিত) ১৯৬৪ সালের সংস্করণের ২৬তম অধ্যায় পৃঃ ৩৮৩

(৪) সমাজতন্ত্রী দলের নেতাদের মধ্যে সকলেই কিন্তু "ফেবিয়ান" ছিলেন না। আর ব্রিটেনের "ফেবিয়ান" সমাজতন্ত্রীদের অনেকেই তিরিশের দশকে মার্কস্‌বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে (১৯৩৮) সমাজতন্ত্র এবং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ধারণা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছিল—সভাপতির অভিভাষণে এই পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্রের এই ভাষণের উল্লেখ এই প্রবন্ধে পরে করা হয়েছে।

(৫) "Congress Socialist Party"—প্রাগুক্ত গ্রন্থের পৃঃ ৩৮৪

(৬) সজল বসু সম্পাদিত **স্বদেশে সমাজবাদ** গ্রন্থের পৃঃ ১৭তে উদ্ধৃত।

(৭) হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ,—Verinder Grover সম্পাদিত **Political Thinkers of Modern India** গ্রন্থের (vol. 6) হরিবিষ্ণু কামাথের প্রবন্ধে উল্লিখিত পৃ ২৯৮-৯৯।

(৮) এই প্রসঙ্গে প্রকাশ্য অধিবেশনে ১৯৩৯ এর ১১ই মার্চ নেহরু বলেছিলেন, গত ছাব্বিশ বছরে আমি প্রতি বছর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়ে অনেক বিচিত্র ব্যাপারই দেখেছি, কিন্তু এবারের মতো দৃশ্য কখনও দেখিনি। (Indian Annual Register, 1939, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৯)

(৯) Indian Annual Resiter, 1939, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪

(১০) Girja Shankar প্রাগুক্ত গ্রন্থ (পৃঃ ১২০)। গিরিজাশংকর এই প্রসঙ্গে রজনী পাম দত্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন।

(১১) নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে প্রকাশিত Netaji Collected Works এর দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭২। ইংরেজি রচনা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি / ২

(১২) ১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে লেখা পত্র ঃ দ্রষ্টব্য—N. J Jog, **In Freedom's Quest** পৃঃ ১৫৮।

(১৩) গিরিজাশঙ্কর, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৫।

(১৪) **J P Papers**, AICSP policy, 1938-47

(১৫) গিরিজাশঙ্কর, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৪

(১৬) দ্রষ্টব্য ঃ নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে প্রকাশিত **Cross Roads** গ্রন্থের পরিশিষ্ট ঃ (পৃঃ ৪১৯—৪২৪)।

(১৭) Crossroads, পৃঃ ৪২৩

সুভাষচন্দ্র ও বামশক্তি ঃ অকমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট

অমিতাভ চন্দ্র

মুখবন্ধ ও সূত্রপাত

বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় প্রধানতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তৎকালীন ভারতের অকমিউনিস্ট বামশক্তির সম্পর্ক।[১] তবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অকমিউনিস্ট বামশক্তির সম্পর্কের আলোচনায় প্রতি তুলনা হিসাবে অত্যন্ত সংক্ষেপে হলেও সুভাষচন্দ্র-কমিউনিস্ট সম্পর্কের উল্লেখ ও কমিউনিস্টদের সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত মূল্যায়নের উল্লেখ প্রবন্ধের শেষে অবশ্যম্ভাবী ভাবে আসবেই। আর সেই কারণেই প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়েছে 'সুভাষচন্দ্র ও বামশক্তি ঃ অকমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট।' এই আলোচনার পরিধি থেকে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলকে (সি এস পি) সচেতন ভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই সংখ্যাতেই সে সম্পর্কে একটি আলোচনা স্থান পেয়েছে।[২] এই প্রবন্ধের পরিসরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে চারটি পৃথক অকমিউনিস্ট বামপন্থী দল বা শক্তির সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে। তাদের প্রতিটির সঙ্গে সুভাবচন্দ্র ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পর্ক এক-এক সময় একেক রূপ নিয়েছিল। সম্পর্কের এই মিশ্র চরিত্রের অনুধাবনই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই চারটি অকমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তি ও দলগুলি হল ঃ

১) মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ, যাঁরা সাধারণভাবে 'রায়পন্থী' বলে পরিচিত ছিলেন, কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থানকালে তাঁদের পরিচিতি ছিল লীগ অভ্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন (এল আর সি) নামে এবং কংগ্রেস ত্যাগ করে তাঁরা যে পৃথক্ দল গঠন করেন, তার নাম দেওয়া হয় র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পীপ্‌ল্‌স্ পার্টি বা র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (আর ডি পি), ২) সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রেভলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া (আর সি পি আই) ৩) রেভলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া (আর এস পি আই) পরবর্তীকালে শুধু আর এস পি) এবং ৪) বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি।

সুভাষচন্দ্র ও মানবেন্দ্রনাথ-এল আর সি-আর ডি পি

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হলেন ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।[৩] কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্ন থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বহিষ্কার কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল না, এর পেছনে ছিল দীর্ঘ ইতিহাস, তবে সে ইতিহাস আমাদের এখানে আলোচ্য নয়।

একথা সুবিদিত যে, মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে সদ্য কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণকারী মানবেন্দ্রনাথ রায় ঔপনিবেশিক প্রশ্নে লেনিনের থিসিসের পাল্টা তাঁর নিজস্ব থিসিস পেশ করেন। তাঁর থিসিসে মানবেন্দ্রনাথ ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে গ্রহণ করেছিলেন এক 'অতি-বামপন্থী' অবস্থান, যা ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে। অন্যদিকে লেনিনের থিসিসে ছিল ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধ, যা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক আলোচনার পর দ্বিতীয় কংগ্রেস লেনিন ও রায় উভয়েরই থিসিস কিছুটা সংশোধিত ও পরিবর্তিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বাস্তবে আন্তর্জাতিকের কাজকর্মে পরবর্তীকালে লেনিনের মতই প্রাধান্য পায়, রায়ের থিসিসের কদাচিৎ উল্লেখ করা হতে থাকে।

লেনিনের থিসিসের নিহিতার্থ ছিল, ভারতের কমিউনিস্টদের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে সচেষ্ট হতে হবে, যে পার্টি সর্ব প্রযত্নে সর্বহারার আন্দোলনের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবে এবং একই সঙ্গে একটি সঠিক 'বিকল্প নেতৃত্ব' দানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন ও তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথের অবস্থান পরিবর্তন এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট সহ বামশক্তির সম্পর্কের বিষয়গুলি যথাযথ অনুধাবনের জন্য লেনিনের থিসিসের নিহিতার্থের উল্লেখ অতীব প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক।

লেনিনের মৃত্যুর পর থেকেই, বিশেষতঃ ১৯২৫ সালের ১৮ মে স্তালিনের বক্তৃতা থেকেই, কার্যতঃ কমিনটার্ন দ্বিতীয় কংগ্রেসের অবস্থান থেকে ক্রমশঃ সরে আসতে থাকে। মানবেন্দ্রনাথেরও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে, তবে বিপরীত দিকে। দ্বিতীয় কংগ্রেসের অবস্থান থেকে কমিনটার্ন

ক্রমশঃ বাম দিকে সরে যাচ্ছিল, আর মানবেন্দ্রনাথ সরতে থাকেন বিপরীত মুখে, দ্বিতীয় কংগ্রেস তাঁর 'অতি-বামপন্থী' অবস্থান থেকে ক্রমশঃ 'দক্ষিণে'। কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অবস্থান ছিল, ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীই আপসকামী এবং সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে যোগদানকারী। লেনিনের মৃত্যুর পরে ১৯২৫ সালের মাঝামাঝি থেকেই স্তালিনের নেতৃত্বে কমিনটার্ন 'বাম' দিকে সরে আসতে থাকলেও, সেটা কখনই রায়ের অবস্থানের মত এক 'অতিবাম' রূপ গ্রহণ করেনি। রায়ের মত স্তালিন কখনই ভারতের মত ঔপনিবেশিক দেশে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীকেই আপসকামী ও সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে যোগদানকারী বলে মনে করেননি, বরং ভারতের তৎকালীন বাস্তবতার অনেকটাই সঠিক প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল স্তালিনের বক্তব্যে।

১৯২৮ সালে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল সুবিখ্যাত 'কলোনিয়াল থিসিস'। এখানে 'বামপন্থী' ঝোঁক ছিল ১৯২৫ সালের অবস্থানের চেয়েও প্রকট। শুধু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অবস্থানের থেকেই নয়, এমনকি ১৯২৫ সালের ১৮ মে স্তালিনের পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতার থেকেও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত এই 'কলোনিয়াল থিসিস' অনেকটাই 'বাম' দিকে সরে এসেছিল। কমিনটার্নের এই অবস্থান পরিবর্তনের বিষয়টিও আকস্মিক ছিল না, ক্রমশঃই সূচিত হচ্ছিল এই অবস্থান পরিবর্তন।

কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু ষষ্ঠ কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক প্রশ্নে কমিনটার্ন যে 'বামপন্থী' অবস্থান গ্রহণ করে। তা ছিল দ্বিতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'বামপন্থী' অবস্থানের প্রায় অনুরূপ। কিন্তু স্বয়ং রায়ের অবস্থানই তখন বদলে গেছে। কমিনটার্ন সরে এসেছে 'বামে', আর রায় সরে গেছেন 'দক্ষিণে'। গোড়ায় রায় যে 'বামপন্থী' অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তা কয়েক বছর অনুসরণ করার পর সংশোধন করতে করতে তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন ১৯২৮ সালে। আর রায়ের সেই অবস্থান তখন শুধু যে কমিনটার্নের 'দক্ষিণে' তাই নয়, এমন কি গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির‌ও (সি পি জি বি) 'দক্ষিণে'। নানা বিষয় নিয়েই তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল কমিনটার্নের সঙ্গে রায়ের মতবিরোধ। তার সঙ্গে অবস্থানগত পার্থক্য তো ছিলই। তখনও রায় কমিনটার্নের সঙ্গে যুক্ত আছেন, নিয়মিত লিখছেন কমিনটার্নের মুখপত্র Inprecor-এ। কিন্তু

দূরত্ব বেড়ে গেছে কমিনটার্নের তৎকালীন নেতৃত্বের সঙ্গে, তাঁদের সুনজর থেকেও তখন তিনি বঞ্চিত। ঔপনিবেশিক প্রশ্নে কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত অবস্থান রায় গ্রহণ করতে পারেননি, বিশেষতঃ ভারতে এই নতুন কমিনটার্ন লাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে। তাঁর সমালোচনাও প্রকাশিত হচ্ছিল রায়ের নিবন্ধে। সমালোচনা-পাল্টা সমালোচনায় ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল দূরত্ব, রচিত হচ্ছিল কমিনটার্ন থেকে রায়ের বহিষ্কারের পটভূমি। শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘটল কমিনটার্ন থেকে রায়ের বহিষ্কার।

১৯২৭ সাল থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে সংগঠিত একটি বামপন্থী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। অর্থাৎ তখন থেকেই ভারতে বামপন্থী জাতীয়তাবাদ একটি সংগঠিত রূপ নিয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে এই বামপন্থী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সত্যমূর্তি প্রমুখ। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে 'পূর্ণ ও আপসহীন স্বাধীনতা'র প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য প্রধান দুই বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে গঠিত হয়েছিল The League for Indian Independence.[৪] এই সংগঠনের সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল।[৫] তার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল League Against Imperialism-এর সঙ্গে, যার কেন্দ্রীয় দফতর ছিল বার্লিনে এবং যার প্রধান সংগঠক ও নেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গঠিত হওয়ার সময় বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের এই এই সংগঠন The League for Indian Independence কে সোৎসাহ সমর্থন জানিয়েছিলেন ভারতের কমিউনিস্টরা, তাঁরা এতে অংশগ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশ এল ভিন্নরূপ। ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত থিসিসের ভিত্তিতে কমিনটার্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নির্দেশ দেয় যে ভারতের মত দেশে কমিউনিস্টদের এই লীগের মত বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সংগঠনের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখা উচিত নয়, বরং লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে এই ধরনের সংগঠনের মুখোশ খুলে দেওয়া, স্বরূপ উন্মোচিত করে দেওয়া উচিত।

কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তিনি

দৃঢ়ভাবে চেয়েছিলেন এবং Inprecor-এ প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধে এই মত প্রকাশও করেছিলেন যে, ভারতে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজ্যাণ্ট্স্ পার্টির, যার মধ্যে থেকে কমিউনিস্টরা কাজ করতেন এবং যা ছিল কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য সংগঠন ও আইনী আবরণ (legal cover), তাদের উচিত হবে বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সংগঠন এই লীগের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সাধারণ মঞ্চে যৌথ ভিত্তিতে কাজ করা, গঠন করা 'যুক্তফ্রণ্ট', আর পেটি-বুর্জোয়া বাম র‍্যাডিক্যাল বা বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া উচিত ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টির (ডব্লিউ পি পি)। রায় একথাও বলেন যে, ডব্লিউ পি পি-র সদস্যদেরও লীগের কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আক্ষেপ ছিল, কমিনটার্নের 'বামপন্থী' অবস্থান ও নির্দেশ পেটি-বুর্জোয়া বাম র‍্যাডিক্যাল বা বামপন্থী জাতীয়তাবাদী এবং তাঁদের সংগঠন এই লীগকে শ্রমিক-কৃষকের দিকে নিয়ে আসার এবং বিপ্লবের পথে নিয়ে আসার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে দিল। সম্ভাবনা ছিল এই লীগকে 'বিপ্লবের শক্তিশালী অস্ত্রে' রূপান্তরিত করার। কমিনটার্ন্ 'যুক্তফ্রণ্ট' করে কাজ করার নীতি ত্যাগ করে সংকীর্ণ 'বামপন্থী' অবস্থান নেওয়ায় সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল।[৬] তখনও তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ না হলেও, কমিউনিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দিক থেকে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্র বসুর কাছাকাছি আসার এই হল সূত্রপাত।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে গোপনে ভারতে ফিরলেন কমিনটার্ন্ থেকে বহিষ্কৃত মানবেন্দ্রনাথ।[৭] দেশে ফেরার আগেই রায় ভারতে তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠাতে শুরু করেছিলেন, যাতে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির পাল্টা একটি 'রায়পন্থী' গ্রুপ গড়ে তোলা যায়। রায় স্থির করেই নিয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে দুটি 'রায়পন্থী' গ্রুপ গঠন করা হবে—শ্রমিক, কৃষক এবং পেটি-বুর্জোয়াদের নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে একটি ব্যাপক সদস্যভিত্তিক গ্রুপ, আর কংগ্রেসের বাইরে শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গোপন ছোট গ্রুপ। সেই পরিকল্পনা মত ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম 'রায়পন্থী' গ্রুপ গড়ে উঠল বোম্বাইতে। পরে পরপর 'রায়পন্থী' গ্রুপ সংগঠিত হল কলকাতায়, আহ্মেদাবাদে ও অন্যত্র। প্রথমে এই 'রায়পন্থী' গ্রুপের নাম ছিল কমিটি অভ্ অ্যাক্শন্ ফর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অভ্ ইণ্ডিয়া,

এবং পরে নাম হল লীগ অভ্ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স।[৮]

১৯৩১ সালের ২৯ মার্চ থেকে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হল করাচীতে।[৯] এই অধিবেশনে গোপনে, ছদ্মনামে যোগ দিয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। ঘটনাবহুল এই অধিবেশনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর। কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত নওজওয়ান ভারত সভার দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।[১০] এখানেই প্রথম সাক্ষাৎ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর, তাঁদের মধ্যে চলে সুদীর্ঘ আলোচনা।[১১] করাচী কংগ্রেস পরবর্তী সময় থেকে কয়েক বছর দেখা গিয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে রায়পন্থীদের যৌথ কাজকর্ম। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই যৌথ কাজকর্মের সূত্রপাত করাচী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র-মানবেন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে।

১৯৩১ সালের ৩ থেকে ৭ জুলাই অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (এ আই টি ইউ সি) একাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়, সভাপতি সুভাষচন্দ্র। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিভিন্ন প্রশ্নে বিরোধ দেখা দিল। ফলে দ্বিতীয়বার ভাঙন ধরল এ আই টি ইউ সি-তে। কমিউনিস্টরা ও সমমতাবলম্বী সহযোগীরা এ আই টি ইউ সি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে গঠন করলেন তাঁদের পাল্টা শ্রমিক সংগঠন। ১৯৩১ সালের ৬ জুলাই জন্ম নিল এক নতুন শ্রমিক সংগঠন—অল-ইণ্ডিয়া রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (রেড টি ইউ সি)। মানবেন্দ্রনাথ নিজে এই সম্মেলনে যোগ দেন নি। কিন্তু করাচী কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র সুদীর্ঘ আলোচনার প্রতিফলন পড়তে দেখা গেল এই সম্মেলনে। রায়ের অনুগামীরা কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করে থেকে গেলেন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন মূল এ আই টি ইউ সি-তে। ফলে মূল এ আই টি ইউ সি পরিণত হল সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী জাতীয়তাবাদী এবং রায়পন্থীদের যৌথ সংগঠনে। এ আই টি ইউ সি-র নবনির্বাচিত কর্মসমিতিতেও দেখা গেল কেবল তাঁরাই রয়েছেন।[১২] কলকাতা সম্মেলনের ঘটনাবলীর ও বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকার উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন সুভাষচন্দ্র তাঁর **The Indian Struggle** গ্রন্থে।[১৩]

গোপনে ভারতে ফিরে সাত মাস আত্মগোপন করে কাটাবার পর কানপুর

বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৪ সাল) অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে ১৯৩১ সালের ২১ জুলাই বোম্বাইতে গ্রেপ্তার হলেন মানবেন্দ্রনাথ।[১৪] ২০ নভেম্বর ১৯৩৬ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে[১৫] রায় যোগ দিলেন কংগ্রেসে। তখন তিনি ঘোষণা করেন সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা নয়, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনই হল আশু লক্ষ্য এবং এ কথাও বলেন যে, এই আশু লক্ষ্যর কথা সমাজবাদী এবং কমিউনিস্টদেরও বিশেষভাবে বুঝতে হবে। জাতীয় কংগ্রেস-কেই রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি সমূহের 'সাধারণ মঞ্চ' ('Common Platfrom') হিসাবে ঘোষণা করলেন। কংগ্রেসকেই আরও র‍্যাডিক্যাল ও গণতান্ত্রিক করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাধারণ মঞ্চ হিসাবে তাকে ব্যবহার করার জন্য রায় সমস্ত র‍্যাডিক্যাল শক্তির কাছেই আবেদন জানালেন।[১৬]

তিরিশের দশকের একটা বিরাট সময় জুড়ে সুভাষচন্দ্রকে থাকতে হয়েছিল হয় কারাবাসে, নয় প্রবাসে—ইউরোপে। ইউরোপে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র নিজেকে প্রধানতঃ নিয়োজিত রেখেছিলেন ভারতীয় জনগণের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সমর্থন আদায় ও জনমত গড়ে তোলার কাজে। আর যে সময়টা তিনি স্বদেশে কারাগারের বাইরে থাকতে পেরে-ছিলেন, সেই সময়টাই তিনি নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নানা কাজকর্মে। এই সময়টা মানবেন্দ্রনাথ জেলে এবং বেশির ভাগটা সুভাষচন্দ্র কারাবাসে কিংবা প্রবাসে থাকলেও সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর বামপন্থী জাতীয়তাবাদী অনুগামীদের সঙ্গে 'রায়পন্থী'দের সম্পর্ক মোটের উপর অক্ষুণ্ণই ছিল। ১৯৩৬ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মানবেন্দ্রনাথ এবং 'রায় গ্রুপ' সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ দেখি সুভাষচন্দ্রের **The Indian Struggle** গ্রন্থে।[১৭]

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুগামীবৃন্দের সম্পর্কটি আবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি (তখন বলা হত রাষ্ট্রপতি) পদে পুন-র্নির্বাচনের সময়, ত্রিপুরীর পর নানা ঘটনাবলী, পন্থ প্রস্তাব ও তাকে ঘিরে বিতর্ক-ভোটাভুটি ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে। কংগ্রেসে অবস্থানের সমগ্র-কালেই মানবেন্দ্রনাথও তাঁর অনুগামীরা লীগ অভ্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন বা এল আর সি গ্রুপ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন।

১৯৩৯ সালের ২৯ জানুয়ারি কংগ্রেস সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বামপন্থীদের সম্মিলিত প্রার্থী হিসাবে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজী ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের মনোনীত প্রার্থী ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে ১৫৮০—১৩৭৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে কংগ্রেসে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচনে অন্যান্য বামপন্থীদের মতই 'রায়পন্থী'দের সমর্থনও পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতারা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত হলেন। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর এই নেতাদের জন্য আসন্ন হয়ে উঠল দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের লড়াই। লড়াইয়ের ময়দানও ছিল প্রস্তুত।

১৯৩৯ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরীতে। এই ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আনীত পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতায় সামিল হয়েছিলেন কমিউনিস্টরা—সাবজেক্টস্ কমিটি এবং প্রকাশ্য অধিবেশন উভয় জায়গাতেই, তাঁরা পন্থ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন।[১৯] কমিউনিস্টদের মতই 'রায়পন্থী' রাও ভোট দিয়েছিলেন পন্থ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। মূলতঃ দুটি কারণে 'রায়পন্থী'রা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। প্রথমতঃ, তাঁরা মনে করেছিলেন পন্থ প্রস্তাবের ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, এবং দ্বিতীয়তঃ, এই প্রস্তাবের ফলে কংগ্রেস এমন একটি নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসরফা।[২০] এই ত্রিপুরী সংকটের সময় পরস্পরের খুবই কাছাকাছি এসে ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং রায়পন্থী'রা।

এই সংকটকালীন সময়ে সুভাষচন্দ্রের কাছে মানবেন্দ্রনাথের উপদেশ ছিল, সুভাষ যেন 'সাহস এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে' ('with courage and conviction') গান্ধী এবং দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের যে কোনও সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেন, কংগ্রেস ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও যেন তিনি কোনও ভাবে দুর্বল হয়ে নমনীয়তা না দেখান। মানবেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে আশ্বস্ত করেছিলেন, বামপন্থী শক্তি 'বিকল্প নেতৃত্ব' প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম। মানবেন্দ্রনাথের মাথায় তখন আছে 'বিকল্প নেতৃত্বে'র কথা। মানবেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের কাছে দাবি করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের নিজের মত করে এবং গান্ধী ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের তোয়াক্কা না করে এমন একটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত, যাতে বামপন্থীদের

সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে, অন্তত ষাট শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে বামপন্থী-দের।[২১] সুভাষচন্দ্র মানবেন্দ্রনাথের তুলনায় অধিকতর বাস্তববাদী ছিলেন, আর তাই তিনি জানতেন সেই বিশেষ সংকটকালীন পরিস্থিতিতে এহেন প্রচেষ্টা অসম্ভব ও অবাস্তব। আর অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথও সেই পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রকে নানান্ গরম উপদেশ দিলেও তাঁর নিজের পূর্ববর্তী রেকর্ড অনুযায়ী সেই অবস্থানে তার পর বেশি দিন আর স্থির থাকেননি, আবার পরিবর্তন এসেছিল তাঁর অবস্থানে আর তা বেশ তাড়াতাড়িই। ত্রিপুরীতে পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্রকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে 'রায়-পন্থী'রা আরো কয়েক মাস কাজ করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে।

কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন।[২২] সেটা ছিল অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কলকাতা অধিবেশন। এই কলকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলে 'রায়পন্থী'রা সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন ও এই ইস্তফা প্রদানকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এবার এ আই সি সি-র উচিত হবে 'একটি নতুন বিপ্লবী ওয়ার্কিং কমিটি' ('a new revolutionary Working Committee') নির্বাচিত করা।[২৩] 'রায়পন্থী'দের এই বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য কমিউনিস্ট সহ অন্যান্য বামপন্থীরা একমত হননি।

১৯৩৯ সালের ৩ মে সুভাষচন্দ্র গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক।[২৪] কমিউনিস্টরা ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেননি, যদিও একসঙ্গে আন্দোলন করেছেন। একই কথা প্রযোজ্য 'রায়পন্থী'দের সম্পর্কেও। ফরওয়ার্ড ব্লকে তাঁরা যোগ দেননি, কিন্তু তখনও তাঁরা থেকেছেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে, তখনও তাঁরা সুভাষের সহযোগী শক্তি। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে সুভাষের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বামপন্থী সমন্বয় কমিটি (এল সি সি)। ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল এল সি সি-তে। দল হিসাবে এই সংগঠনে যোগ দিয়েছিল সি পি আই। এল সি সি-তে যোগ দিয়েছিল সি এস পি এবং 'রায়পন্থী' এল আর সি-ও। ১৯৩৯ সালের ৯ জুলাই সুভাষের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী সমন্বয় কমিটি 'সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস' পালন করেছিল। আর এইখান থেকেই শুরু হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের বিচ্ছেদ।

৯ জুলাই 'সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস' অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে রায়ের নেতৃত্বাধীন লীগ অভ্ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল এই কর্মসূচি থেকে এবং এল সি সি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আবার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটল মানবেন্দ্রনাথের। এখানে রায়ের বাস্তববাদ ছাপিয়ে গেল তাঁর আদর্শবাদকে। রায় সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এই 'প্রতিবাদ দিবসে' সামিল হলে অবধারিতভাবেই তাঁদের বিরুদ্ধে গৃহীত হবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। রায় তখনও কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গেই ছিলেন, যাঁরা ছিলেন দক্ষিণপন্থী। কিন্তু তিনি বিচ্ছেদ চাইছিলেন না। আর তাই ছিল এই নিশ্চিত পশ্চাদপসারণ। অত্যন্ত সঠিকভাবেই মানবেন্দ্রনাথের এই পশ্চাদপসারণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে 'বামপন্থীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগ এনে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেনঃ 'Since Mr. M. N. Roy was then looked upon as a Leftist leader and his Radical League was one of the component units of the Left-consolidation Committee, his action amounted to a betrayal of the leftist cause and was warmly acclaimed by the Rightists.'[২৫] শেষ হয়ে গেল সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর অনুগামীদের তিরিশের দশকের 'কামারাদারি'।

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাৎসি জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করল এবং ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স দীর্ঘদিন অনুসৃত নাৎসি তোষণ নীতি পরিত্যাগ করে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফলে সেই দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত সুভাষচন্দ্র ও তাঁর নেতৃত্বাধীন ফরওয়ার্ড ব্লককে এবং মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গেল দুই সম্পূর্ণ বিপরীত শিবিরে। ফলে শেষ হয়ে গেল উভয়ের মধ্যে পুনর্বার যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকের চোখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ', এই দলের লাইনও ছিল আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও যুদ্ধ বিরোধী সংগ্রাম, লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা। অপরদিকে রায়ের নেতৃত্বাধীন এল আর সি সমর্থন করেছিল যুদ্ধকে, সমর্থন জানিয়েছিল নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায়। রায় নেতৃত্বাধীন এল আর সি চেয়েছিল যুদ্ধ শেষ হওয়া এবং ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের

সার্বিক পরাজয় পর্যন্ত ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্থগিত রাখতে।[২৬] যুদ্ধ সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমে ছিল 'স্বেচ্ছাধীন সমর্থন' বা 'voluntary support', তার পরে হল 'সদাশয় নিরপেক্ষতা' বা 'benevolent neutrality', আর সব শেষে 'নিঃশর্ত সমর্থন' বা 'unconditional support'।[২৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় 'নিঃশর্ত সমর্থন'-এর এই অবস্থান 'রায়পন্থী'রা শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন।[২৮] আর কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে এই 'নিঃশর্ত সমর্থন' ও অন্যান্য বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেস ছেড়ে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠন করেছিলেন তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দল —র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পীপল্স্ পার্টি, যা র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (আর ডি পি) নামেই সমধিক পরিচিত ছিল।[২৯]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় 'নিঃশর্ত সমর্থন' সুভাষচন্দ্রের চোখে মানবেন্দ্রনাথকে পরিণত করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'এজেন্ট'।[৩০] আর এরই বিপরীতে অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা 'রায়পন্থীদের' চোখে সুভাষচন্দ্রকে পরিণত করেছিল 'নাৎসিবাদ-ফ্যাসিবাদের দোসরে'। সুভাষচন্দ্র তখন তাঁদের চোখে শত্রু শিবিরভুক্ত। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ বাহিনী (আই এন এ) মানবেন্দ্রনাথের চোখে ছিল 'কমিক অপেরা সৈন্যবাহিনী'। মানবেন্দ্রনাথের মতে এই আই এন এ কোনও 'বৈপ্লবিক মানবমুক্তির আদর্শ' দ্বারা পরিচালিত ছিল না, তারা সাহায্য করেছিল বিশ্ব ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদকে। তাঁর মতে আই এন এ ছিল 'জাপ আক্রমণকারীদের সহায়ক' শক্তি। সুতরাং তার জয় ভারতীয় জনগণের গলায় এঁটে দিত ফ্যাসিবাদের মরণ-ফাঁস এবং 'সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কায়েম করত ফ্যাসিবাদ'। তিনি মনে করতেন, আই এন এ-র ক্ষমতা ছিল না ভারতকে এই 'ট্র্যাজিক পরিণতি'-র হাত থেকে রক্ষা করা এবং আই এন এ-রপরাজয়ই ছিল এই 'কমিক অপেরা সৈন্যবাহিনী'র 'অনিবার্য পরিণতি'। আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে গণ আন্দোলন নিয়ে কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে তিনি সম্মত ছিলেন না। এই 'গণ উন্মাদনা'র স্রোতে গা ভাসানোর কোন প্রশ্নই ওঠেনি। 'জাপ-সমর্থনপুষ্ট', আই এন এ-র সাহায্যে ভারতের 'মুক্তি' তাঁর চোখে ছিল 'ফ্যাসিস্ট "স্বাধীনতা"' এবং 'চীন সহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের অবিমিশ্র দাসত্ব'।[৩১] এই

আই এন এ-কে নিয়ে মানবেন্দ্রনাথের ছিল না কোনও উচ্ছ্বাস, হৃদয়াবেগ। 'রায়-পন্থী' রা আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণ আন্দোলনে কখনো অংশ গ্রহণ করেননি, বরং তার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র ও সৌম্যেন্দ্রনাথ-আর সি পি আই

সোভিয়েত ইউনিয়ন-ফ্রান্স-জার্মানি-ইতালি—প্রবাসে প্রায় সাত বছর কাটিয়ে কমিউনিস্ট সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশে ফিরে এলেন ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে।[৩২] সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থানকালে তিনি যোগ দিয়েছিলেন মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে। জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি শাসনের এবং ইতালিতে মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট শাসনের তীব্র বিরোধী সৌম্যেন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে ২৬ এপ্রিল, চার দিন, কাটিয়েছিলেন জার্মানির মিউনিকের জেলে—হিটলারের নাৎসি কারাগারে, ছাড়া পেয়েছিলেন ২৭ এপ্রিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল হিটলার হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় ফিরে আসার পর সৌম্যেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে নীতি ও তত্ত্বগত মৌলিক মতবিরোধের সঙ্গেই নেতৃত্বের প্রশ্নে মতবিরোধ মীমাংসার অতীত হয়ে যাওয়ায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ১৯৩৪ সালের ১ অগস্ট কমিউনিস্ট লীগ অভ্ ইণ্ডিয়া নামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সমান্তরাল একটি নতুন কমিউনিস্ট দল গঠন করলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ। এই দলের সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান নেতা ছিলেন তিনি নিজেই।[৩৩] কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই নতুন ধারাটি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুবর্তী ছিল না। আর সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'হিস্টরিক্যাল ডেভেলপমেণ্ট অভ্ কমিউনিস্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' অনুসারে, ১৯৪১ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কনফারেন্সে কমিউনিস্ট লীগ কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া নাম গ্রহণ করেছিল।[৩৪] কিন্তু অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্রে জানা যায় ১৯৪০ সালেই এই দল সি পি আই নাম গ্রহণ করে।[৩৫] 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধী মূল কমিউনিস্ট সংগঠন সি পি আই থেকে নিজেদের পৃথক্ সত্তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সৌম্যেন্দ্র-

নাথের নেতৃত্বাধীন এই সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠন এই আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর ১৯৪৩ সালের মার্চে দ্বিতীয়বার নাম পরিবর্তন করে রেভলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া (আর সি পি আই) নাম গ্রহণ করেছিল।[৩৬]

কমিউনিস্ট লীগ থেকে আর সি পি আই—সমান্তরাল এই কমিউনিস্ট সংগঠনটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই ছিলেন এই দলের কেন্দ্রীয় চরিত্র, মস্তিষ্ক। এই দলের দলিলগুলির অধিকাংশই ছিল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই লেখা। সুভাষচন্দ্র-সৌম্যেন্দ্রনাথ সম্পর্ক এবং সৌম্যেন্দ্রনাথের লেখায় সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ দিয়েই এই বামপন্থী দলটির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ককে বুঝতে হয়।

'ফ্যাসিজম' নামে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৪ সালে একটি বই লিখে মুসোলিনি ও ইতালির ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছিলেন।[৩৭] বইয়ের ভূমিকায় সৌম্যেন্দ্রনাথ বলেন, ভারতে তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে ফ্যাসিবাদের পক্ষে একটা অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্র বসুর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি তার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন।[৩৮] ভূমিকায় ভারতের জাতীয়তাবাদীদের ফ্যাসিস্টপ্রীতিরও তীব্র সমালোচনা করে সৌম্যেন্দ্রনাথ লেখেন, 'কালে ভারতবর্ষীয় ন্যাশনালিস্টরা যে ফ্যাসিস্ট মূর্তিতে দেখা দেবে তাতে সন্দেহ নেই।'[৩৯]

সুভাষচন্দ্রের সমালোচক এই সৌম্যেন্দ্রনাথকে আবার দু বছরের মধ্যেই দেখছি ভিন্ন ভূমিকায়। ১৯৩৬ সালের ৮ এপ্রিল ইউরোপ থেকে ভারতে ফিরলেন সুভাষচন্দ্র। দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গ্রেপ্তার হলেন।[৪০] আর ১৯৩৬ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে অক্টারলোনি মনুমেণ্টের পাদদেশে আয়োজিত বিরাট জনসভায় সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে এক অগ্নিগর্ভ ভাষণ দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ এবং দণ্ডিত হলেন এক বছরের কারাদণ্ডে।[৪১] কারাগার থেকেই সুভাষচন্দ্র বসু এবং হাজার-হাজার রাজবন্দীকে বিনা বিচারে আটক রাখার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা করে এক জ্বালাময়ী বিবৃতি দিয়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ।[৪২] তারিখবিহীন এই বিবৃতির তলায় প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেণ্ডেন্টের স্বাক্ষরের সঙ্গে তারিখ আছে ১৯৩৬ সালের ১০ জুলাই।[৪৩]

১৯৩৭ সালের ১৭ মার্চ কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন সুভাষচন্দ্র।[৪৪] সেই বছরই এক বছর পর কারামুক্তি ঘটেছিল সৌম্যেন্দ্রনাথের। কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ আন্দামান রাজবন্দীদের মুক্তি আন্দোলনে।[৪৫] কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্রও নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলেন নানাবিধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কাজকর্মে।

১৯৩৫ সালের ২৫ জুলাই থেকে ২০ অগস্ট কমিনটার্নের সপ্তম ও শেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল মস্কোতে। এই সপ্তম কংগ্রেসে কমিনটার্নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জর্জি ডিমিট্রভ পেশ করেছিলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'যুক্ত ফ্রন্ট' ('United Front') তত্ত্ব। অনেক আলাপ-আলোচনার পর সপ্তম কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল ডিমিট্রভের 'যুক্ত ফ্রন্ট' তত্ত্ব। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও এই 'যুক্তফ্রন্ট' তত্ত্ব গ্রহণ করে। ফলে গৃহীত হয় কমিউনিস্টদের কংগ্রেসে ঢুকে কাজ করার সিদ্ধান্ত। কিন্তু সৌম্যেন্দ্রনাথের কমিউনিস্ট লীগ এই 'যুক্ত ফ্রন্ট' তত্ত্বকে গ্রহণ করেনি। এই তত্ত্ব কমিউনিস্ট লীগের কাছে ছিল শ্রমিকদের স্বার্থ বিসর্জনকারী, শ্রেণী সমন্বয়ের এক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব তাঁর কমিউনিস্ট লীগের চোখে ছিল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা'।[৪৬] তীব্র কংগ্রেস বিরোধী সৌম্যেন্দ্রনাথের কমিউনিস্ট লীগ কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন হিসাবেই মনে করত। তাঁরা কংগ্রেসে ঢুকে কাজ করার বিরোধী ছিলেন।

ফলে ১৯৩৭ সাল থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে বামশক্তি ক্রমশঃই নিজেকে সুসংহত ও শক্তিশালী করে তুলছিল, তাতে সৌম্যেন্দ্রনাথ ও কমিউনিস্ট লীগের কোনও ভূমিকা ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যৌথ ভিত্তিতে কোনও কাজ তাঁরা করেননি, কারণ তাঁরাই ছিলেন একমাত্র বামশক্তি, যাঁদের অবস্থান ছিল কংগ্রেসের বাইরে। কিন্তু বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বৃহত্তর মঞ্চে এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট সহ অন্যান্য ফ্রন্টে সৌম্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সংগঠন সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছেন।[৪৭]

তিরিশের দশকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যৌথ কাজকর্ম প্রসঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তীকালে প্রকাশিত একটি লেখা (মাঘ, ১৩৬২, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬) থেকে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যায়। সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সে বার অনেক বছর বাদে সুভাষচন্দ্রকে

দেশবাসী কাছে ফিরে পেল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে সভায় তাঁকে বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাগত জানানো হয় সেই সভার সভাপতিত্ব করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সেই সভায় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আমি উপস্থিত ছিলুম।

তার কিছুদিন বাদে দেবেন সেন আমাকে বলেন যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি ও আরো কয়েকজন বন্ধু দেখা করে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুভাষচন্দ্র দেশের সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে সংযুক্ত করে একটি প্ল্যাটফর্ম রচনা করার কথা ভাবছেন। দেবেনবাবু আমাকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তার কয়েকদিন পরে দেবেনবাবু এসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর দিন ও সময় আমাকে জানিয়ে দিয়ে যান।

সেদিন রাত নটায় আমি সুভাষচন্দ্রের বাসভবনে (বর্তমান নেতাজী ভবনে) গিয়ে হাজির হলুম।......আমাদের কথাবার্তা শুরু হল। বামপন্থী দলগুলিকে সমন্বয় করবার তাঁর অভিপ্রায়ের কথা তিনি বললেন। এই দলগুলির সম্মিলিত শক্তির দ্বারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের পথে তিনি কংগ্রেসকে পরিচালিত করবেন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের হাত থেকে কংগ্রেসকে ছিনিয়ে নিয়ে সংগ্রামশীল করবার তাঁর মতে এই ছিল একমাত্র উপায়।

আমি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। আমি তাঁকে বলি যে বামপন্থী রাজনীতি কী সেটা আগে স্থির করা হোক, কারা বামপন্থী সেটা নির্ধারিত হোক, তারপরে বামপন্থী দলগুলিকে একটি প্ল্যাটফর্মে সম্মিলিত করবার কথা ভাবা যাবে। নইলে প্ল্যাটফর্ম একটা দাঁড়াবে বটে কিন্তু সেটা বামপন্থীদের প্ল্যাটফর্ম না হয়ে একটা খিচুড়িপন্থী সমন্বয় হবে। এই সমন্বয় টিকবে না বেশিদিন। আজ যারা তাঁর সঙ্গে জুটছে তারা তাঁকে ঝড়-ঝাপ্‌টার দিনে ছেড়ে চলে যাবে। স্টালিনপন্থী সি. পি. আই.-কে যে কোনোক্রমে বিশ্বাস করা চলে না সেটাও তাঁকে জানাই। তা ছাড়া কংগ্রেসের ভিতরে দল তৈরি করে কংগ্রেসের গদীয়ান মোহান্তদের হাত থেকে যে তা কেড়ে নেওয়া যাবে না তাও তাঁকে বলি। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এই রকম নিয়মতান্ত্রিক বোষ্টমী উপায়ে একটি রাজনৈতিক দলকে দখল করে নেয়ার যে কোনো নজির নেই সে কথা তাঁকে সেদিন রাত্রে বলেছিলুম। কংগ্রেসের বাইরে শক্তিশালী বিপ্লবপন্থী দল তৈরি করার যে একান্ত আবশ্যকতা আছে

সেটা তাঁকে জানাই আর সেই কাজের ভার তিনি গ্রহণ করুন এই অনুরোধ করি।

সেদিন তিনি আমার মত গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর ধারণার "বামপন্থী সংহতি" তখন তাঁর মন জুড়ে ছিল।....বামপন্থী মতবাদ সম্বন্ধীয় ধারণায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার মতের মিল না থাকায় তাঁর 'বামপন্থী সংহতি'তে আমার ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট দলের যোগদান করা সম্ভব হয়নি সেদিন।'[৪৮]

সৌম্যেন্দ্রনাথের এই লেখা থেকে তিরিশের দশকের শেষ পর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতিগত প্রশ্নে একদিকে সুভাষচন্দ্র এবং অপরদিকে সৌম্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটির সদস্যদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিল এবং বামপন্থী মতবাদ সম্পর্কে ধারণায় যেসব মতানৈক্য ছিল, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এবং জানা যায় কেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী সমন্বয় কমিটিতে যোগ দেননি।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের সম্পর্ক সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সৌম্যেন্দ্রনাথের এই লেখাটি থেকেই আরও কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'যুদ্ধ শুরু হবার কয়েক দিন পরে আমি যুদ্ধবিরোধী প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে চলে যাই। ১৯৪০ সালে আমি যখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আটক তখন মুসলিম লীগ গভর্নমেণ্ট সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করে আটক করে প্রেসিডেন্সি জেলে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক ছিলেন তাঁর সহকর্মী নরেন চক্রবর্তী। কিছুকাল পরে নরেনবাবু এলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। "মিসডেম"-সেলে যেখানে আমরা থাকতুম সেখানেই তিনি এসে হাজির হলেন। নির্দিষ্ট কক্ষে জিনিসপত্তর রেখে নরেনবাবু এলেন আমার কুঠরিতে, বললেন —সুভাষবাবু আপনাকে বলতে বলেছেন যে কংগ্রেসের বাইরে বিপ্লবপন্থী দল তৈরি করা ছাড়া আর-কোনো পন্থা নেই দেশের মুক্তি-আন্দোলনের জন্যে। আপনার সঙ্গে সুভাষবাবুর যে আলোচনা হয়েছিল এ বিষয়ে সে কথা তাঁর মনে আছে। এখন সবাই এক হয়ে যুদ্ধের সুযোগ নিতে হবে।

আমি খুবই আনন্দিত হলুম। মতবাদের গোড়াঘেঁষা অনৈক্য যদি দূর হয়ে যায় তা হলে সুভাষচন্দ্রের মতন অমন তেজস্বী নেতার পাশে দাঁড়িয়ে

একসঙ্গে কাজ করে যাবার আনন্দের চেয়ে আর কী বড় আনন্দ থাকতে পারে একজন কর্মীর পক্ষে? তার অল্পদিন পরে সুভাষচন্দ্র জেল থেকে তাঁর বাড়িতে নজরবন্দী হয়ে এলেন। আমি আমার সহকর্মীদের খবর পাঠালুম তাঁরা যেন অবিলম্বে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। কিছুদিন পরে আমার সহকর্মী সুধীর দাশগুপ্তের কাছ থেকে খবর পেলুম যে তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেছেন। কর্মপন্থা নিয়ে অনেক আলোচনাও তাঁর সঙ্গে হয়েছে। সুধীর লিখেছিলেন যে সুভাষবাবু আমাদের বার বার বললেন যে যেমন করে হোক আপনাকে জেল থেকে বের করে আনতে।

নরেনবাবু জানালেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সুধীরের আলোচনার কথা। সুভাষচন্দ্র যেমন করে হোক যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে জেল থেকে বাইরে যেতে বলেছেন কিন্তু মেয়াদ ফুরোবার আগে বের-ই বা হই কী করে। বাইরে সহকর্মীদের খবর পাঠালুম সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর একবার দেখা করবার জন্যে।

কয়েকদিন বাদেই খবর এল গোয়েন্দা পুলিসের শিকারী দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান হয়েছেন। কী আনন্দই যে হল সেদিন আমার। জেলখানায় যত রাজবন্দী ছিলেন সকলকে এই পরম আনন্দের খবরটি জানিয়ে দিলুম। সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলুম বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের জ্যোতির্ময় অন্তরের পূর্ণ রূপটি।'[৪৯]

সৌম্যেন্দ্রনাথের এই লেখাটি থেকে জানা যাচ্ছে, তিনি সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন, 'বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের জ্যোতির্ময় অন্তরের পূর্ণ রূপটি'।[৫০] কিন্তু এটি সৌম্যেন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের লেখা—স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় সাড়ে আট বছর পরে। যে যুগের কথা বলা হচ্ছে বা লেখা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়কার কোনও লেখায় এই বক্তব্যের অনুমোদন পাওয়া গেলে অর্থাৎ এই মূল্যায়নটি প্রকাশিত হলে বিষয়টি সম্পর্কে সুনিশ্চিত ধারণা তৈরি করা যেত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত সুভাষচন্দ্রের **The Indian Struggle: 1920—1942** গ্রন্থে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি, মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ সকলেরই উল্লেখ ও মূল্যায়ন থাকলেও সৌম্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর নেতৃত্বাধীন সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটির কোনও উল্লেখ নেই। অপরদিকে **Against the Stream**[৫১] নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত সৌম্যেন্দ্রনাথের তিরিশের দশকের ও চল্লিশের দশকের বিভিন্ন লেখার সংকলনে গান্ধী, জওহরলাল, মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর অনুগামীবৃন্দ, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও তার নেতৃত্ব, কমিউনিস্ট পার্টি সকলেরই উল্লেখ ও কঠোরতম সমালোচনা

থাকলেও সুভাষচন্দ্রের কোনও উল্লেখ বা কোনও মূল্যায়নই নেই—না ইতি-বাচক, না নেতিবাচক। একই কথা প্রযোজ্য ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত আর সি পি আই-এর দলিল **Historical Development of Communist Movement in India**[৫২] সম্পর্কেও। অবশ্য চল্লিশের দশকে প্রকাশিত, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে, সৌম্যেন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি লেখায় ফরওয়ার্ড ব্লকের উল্লেখ ও মূল্যায়ন আছে, এবং সেগুলি যথেষ্ট সমালোচনা-মূলক, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কোনও উল্লেখ বা মূল্যায়ন নেই। এখন ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কিত এই সকল উল্লেখ ও মূল্যায়নগুলিকে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত মূল্যায়ন হিসাবে গণ্য করা হবে কিনা, সে বিষয়ে বিতর্ক ও মতপার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। বর্তমান প্রবন্ধকারের ব্যক্তিগত মত হল, সৌম্যেন্দ্রনাথের ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কিত মূল্যায়ন ও মতামতগুলিকে নির্বিচারে ও সম্পূর্ণ-ভাবে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত মূল্যায়ন ও মতামত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

তৎকালীন গোপন পুলিস রিপোর্টে চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটির সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পর্ক সংক্রান্ত কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এই গোপন পুলিস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করলে শরৎচন্দ্র তাঁকে ফরওয়ার্ড ব্লকে টানার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, সৌম্যেন্দ্রনাথ ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন-নি। জানা যায়, ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনের সদস্যদের ছাত্র ফ্রণ্টে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সমঝোতা করে একসঙ্গে কাজ করতে বলেছিলেন, একই কথা প্রযোজ্য ছিল অন্যান্য ফ্রণ্টের ক্ষেত্রেও। আবার জানা যায়, ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে সৌম্যেন্দ্র-নাথের নেতৃত্বাধীন সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটির মুখপত্র 'গণবাণী' পত্রিকার মাঘ, ১৩৪৮ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২) সংখ্যায় কংগ্রেস, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি ও 'রায়পন্থী' র‍্যাডিক্যাল ডেমো-ক্র্যাটিক পার্টির তীব্র বিরূপ সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকেরও বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল।[৫৩]

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার, দলীয় সদস্য ও কর্মীদের সৌম্যেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের যে রূপরেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, তাতে তিনি খুব পরিষ্কারভাবেই জাপানি প্রচার সম্বন্ধে দলীয় সদস্য ও কর্মী-দের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, জানিয়েছিলেন কোনওরকম বৈদেশিক সাহায্য

ছাড়াই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ তাঁদের লক্ষ্য। সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত বক্তৃতায় স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সবচেয়ে অত্যাচারী, এ কথা ঠিকই, কিন্তু জাপানিরাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে ভাল কিছু নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হয়ে গেলেই গেরিলা কায়দায় জাপানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্ন সামরিক শিবির আক্রমণ করে অস্ত্র সংগ্রহের কাজে লাগবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার ও কাজে লাগাবার উপরও তিনি জোর দিয়েছিলেন।[৫৪]

অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টাকে ঠিক কি চোখে দেখেছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ, ঠিক কি চোখেই বা দেখেছিল তাঁর নেতৃত্বাধীন সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠন আর সি পি আই, তার কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ বর্তমান প্রবন্ধকার সৌম্যেন্দ্রনাথের তৎকালীন কোনও লেখায় বা আর সি পি আই-এর পূর্বোক্ত মূল দলিলে পাননি। তবে ভারতে বামপন্থার উদ্ভব, বিকাশ ও বিভিন্ন রূপ নিয়ে রচিত তাঁর সুবিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ **The Left-Wing in India (1919—47)**-এ প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক এল পি সিন্‌হা এই বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, সৌম্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের শক্তিতে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল। এই দলের বক্তব্য ছিল, এক শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অপর শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না, দুই শত্রুর বিরুদ্ধেই এক সঙ্গে সংগ্রাম করা প্রয়োজন। তাই সৌম্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটি ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকাকে সমর্থন জানিয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রামকেও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল, কিন্তু একই সঙ্গে পরিষ্কার করে জানিয়েছিল, একমাত্র ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামকেই এই দল সমর্থন জানাবে, কোনও বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে সংগ্রামকে নয়। আর তাই নাৎসি জার্মানির সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামের প্রচেষ্টাকে সৌম্যেন্দ্র-নাথের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই অনুমোদন করেনি, বরং এই প্রচেষ্টার বিরোধিতাই করেছিল, বিরোধিতা করেছিল তাঁর ' "collaboration" with

fascism'-এর।[৫৫] এল পি সিন্‌হা অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর সি পি আই-এর কোনও নির্দিষ্ট দলিলের অথবা সৌম্যেন্দ্রনাথের কোনও নির্দিষ্ট লেখার উল্লেখ করেননি, তিনি সাধারণভাবেই এই আলোচনাটি করেছেন।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ কমিউনিস্ট পার্টি ও 'রায়পন্থী' র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি যেমন আর সি পি আই-এর কঠোরতম সমালোচনার শিকার হয়েছিল, তেমনই তীব্রতম সমালোচনার শিকার হয়েছিল এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কংগ্রেস, সি এস পি, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি সব রাজনৈতিক শক্তিই। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই ঐতিহাসিক গণ আন্দোলনের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা'র ও 'সাবোটাজ' এর। সি এস পি, আর এস পি এবং সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক—এই তিন বামপন্থী শক্তিই আর সি পি আই-এর চোখে ছিল কংগ্রেস 'বামপন্থী' দল, এবং সেই কারণে আর সি পি আই-এর চোখে তারা 'মেকি বামপন্থী শক্তি' হিসাবেই পরিচিত ছিল। এই তিন 'মেকি বামপন্থী শক্তি'র বিরুদ্ধেই আর সি পি আই অভিযোগ এনেছিল বুর্জোয়া সংগঠন কংগ্রেসের লেজুড় বৃত্তির, আর সেই কারণেই আর সি পি আই-এর মতে এই দলগুলির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে কোনও ভূমিকাই ছিল না। এটা কখনোই সত্য ছিল না, কিন্তু এটাই ছিল আর সি পি আই-এর অভিমত। সৌম্যেন্দ্রনাথ এবং আর সি পি আই-এর বিশ্লেষণ ও অভিমত অনুযায়ী কংগ্রেস ভারতের জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী শক্তি ছিল না, কংগ্রেস ছিল প্রকৃত-পক্ষে ভারতে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধী শক্তি। তাঁদের মতে এই তিন 'মেকি বামপন্থী শক্তি' সি এস পি, আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসকে ভারতে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী শক্তি হিসাবে দেখে এবং বিপ্লব-বিরোধী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত না করে সবচেয়ে বড় ভুল করেছিল, এবং এইভাবেই তারা তাদের 'মেকি বামপন্থা'র প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছিল। তাঁদের বিশ্লেষণে সি এস পি, আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল বুর্জোয়া সংগঠন কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তি, কারণ এই তিনটি দলই ছিল কংগ্রেস 'বামপন্থী' দল। কিন্তু ভারতে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এদের প্রকৃত ভূমিকা ছিল ঠিক বিপরীত। তাঁদের মূল্যায়নে সি এস পি, আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তি হলেও, তারা দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের বামপন্থী শক্তি ছিল না, ছিল তার দক্ষিণপন্থী শক্তি। আর সি পি আই এই দলগুলিকে প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী মনে করত না। সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে সৌম্যেন্দ্রনাথ

ও আর সি পি আই-এর আলাদা আরও কিছু সমালোচনা ছিল। ফরওয়ার্ড ব্লককে আদৌ একটি দল বলা যায় কিনা, আর বিশেষতঃ ফরওয়ার্ড ব্লককে আদৌ একটি বামপন্থী দল বলা যায় কি না, সেই নিয়েই সৌম্যেন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ ও প্রশ্ন ছিল, আর তা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর লেখায়। তাঁর মতে আদর্শগত এবং সংগ্রামের পদ্ধতিগত দিক দিয়ে কোনও ভাবেই ফরওয়ার্ড ব্লক নিজেকে গান্ধীবাদের চৌহদ্দির বাইরে আনতে পারেনি। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী তদুপরি সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ফরওয়ার্ড ব্লক আর গণসংগঠন তৈরি ও জনগণকে সংগঠিত করার কোনও চেষ্টাই করেনি। আর তারই ফলে সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম সম্পর্কেই তাদের কোনও পরিষ্কার ধারণা ছিল না এবং বিপ্লব-বিরোধী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের সামনে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে নিজেদের 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র ('natural death') পথ সুগম করে তুলেছিল। এই আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে সৌম্যেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র ও ফরওয়ার্ড ব্লককে আলাদা করেই দেখেছিলেন, ফরওয়ার্ড ব্লক সম্বন্ধে বিশ্লেষণের ও অভিমত প্রকাশের ক্ষেত্রে সৌম্যেন্দ্রনাথের কাছে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে ছিল বড় ঘটনা। আর সি পি আই-এর বক্তব্য অনুযায়ী একমাত্র এই দলই একটি সঠিক বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং অসংগঠিত বিপ্লবী জনতাকে সঠিক নেতৃত্ব এবং বৈপ্লবিক সচেতনতা দিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছিল।[৫৬]

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকালীন সি এস পি, আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে সৌম্যেন্দ্রনাথ এবং আর সি পি আই-এর এই তীব্র সমালোচনামূলক নেতিবাচক মূল্যায়ন যুদ্ধ পরবর্তী গণ আন্দোলনের দিন গুলিতেও অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ ছিল,[৫৭] যদিও লড়াইয়ের ময়দানে আর সি পি আই এই বামপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক ও উত্তাল গণ আন্দোলনে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন আর সি পি আই অংশগ্রহণ করেছিল সর্ব শক্তি নিয়ে, এই গণ সংগ্রামে আর সি পি আই-এর অবস্থানও ছিল একেবারে সামনের সারিতে, নেতৃত্বের অন্যতম অংশীদার হিসাবে।

সুভাষচন্দ্র এবং আর এস পি আই

তিরিশের দশকে আন্দামানের সেলুলার জেলে এবং অন্যান্য বিভিন্ন জেলে ও বন্দীশিবিরে অনুশীলন সমিতিভুক্ত যে সমস্ত জাতীয় বিপ্লবীরা তাঁদের মতাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শগত মতপার্থক্যের কারণে জেলে ও বন্দীশিবিরে কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে, এবং বাইরে এসে কমিনটার্নের অনুবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেননি, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কর্মসূচি সংক্রান্ত মত-পার্থক্যের কারণে, তাঁরা অনুশীলন মার্কসবাদী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁদের সামনে বিকল্প পথ খোলা ছিল দুটো। একটি ছিল নতুন এক মার্কস-বাদী পার্টি গঠন করা, এবং অপরটি ছিল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেওয়া। সি এস পি নেতৃত্বের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তার মার্কসবাদে বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত হয়ে ১৯৩৮ সালে অনু-শীলন মার্কসবাদীরা যোগ দিয়েছিলেন সি এস পি-তে। সি এস পি-তে যোগ দিলেও তাঁরা তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেননি। কিন্তু অনুশীলন মার্কসবাদীরা সি এস পি-র মধ্যে একটি পৃথক গ্রুপ হিসাবে কাজ করতেন এবং সেই নামেই পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোশিয়েশন-এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ সদস্যও সি এস পি-তে যোগ দিয়ে এই অনুশীলন মার্কসবাদী গ্রুপটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[৫৮]

প্রথম থেকেই নানা বিষয় নিয়ে সি এস পি নেতৃত্বের সঙ্গে অনুশীলন মার্কসবাদীদের মতপার্থক্য চলতে থাকে। তাঁরা ক্রমশঃই বুঝতে পারেন, সি এস পি-র মার্কসবাদ শুধুই কথার কথা। সি এস পি নেতৃত্ব মুখে মার্কসবাদে বিশ্বাসের কথা বললেও বাস্তবে কাজের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ অনুসরণ করে চলেন না। তাঁদের প্রাণের টান আছে গান্ধী ও গান্ধীবাদের দিকে, তাঁরা বাস্তবে সমর্থন করেন কংগ্রেসের গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে, অসহায় আত্মসমর্পণ করেন গান্ধীর কাছে, সুভাষচন্দ্রকে প্রয়োজনীয় সময়ে সমর্থন দিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। ফলে অনিবার্য হয়ে উঠল বিচ্ছেদ। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন চলার সময় অনুশীলন মার্কস-বাদীরা সি এস পি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং রামগড়েই প্রতিষ্ঠা করেন এক নতুন সমাজতান্ত্রিক দল, যার ভিত্তি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।[৫৯] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় এই দলের নাম ছিল রেভলিউশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট)। পরে নাম কিছুটা পরিবর্তন করে তাঁদের বর্তমান নাম আর এস পি গৃহীত হয় ১৯৫৬ সালে।[৬০]

সি এস পি নেতৃত্বের সঙ্গে অনুশীলন মার্কসবাদীদের মতপার্থক্য প্রথম প্রকাশ্যে আসে ১৯৩৯ সালের মার্চে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে। মত-পার্থক্যটি ছিল সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত পন্থ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সমর্থন-বিরোধিতা—নিরপেক্ষতার প্রশ্নে। সাবজেক্ট্‌স্‌ কমিটিতে কংগ্রেস সমাজ-তন্ত্রীরা পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রকাশ্য অধিবেশনে সি এস পি নেতৃত্ব পন্থ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেন নি সি এস পি-র মধ্যে থাকা অনুশীলন মার্কস-বাদীরা। তাঁরা নেতৃত্বের নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা ও সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন।৬১ ফলে আরও জোরদার হয়ে ওঠে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অনুশীলন মার্কসবাদীদের ঘনিষ্ঠতা।

অনুশীলন মার্কসবাদীরা ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রই প্রকৃত সংগ্রামপন্থী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি সমূহের সঠিক প্রতিনিধি। একমাত্র সুভাষচন্দ্রই কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্বের যাবতীয় দোদুল্যমানতার এবং আপসকামী নীতিসমূহের বলিষ্ঠ বিরোধিতা করে কংগ্রেস ও দেশের সামনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের এক বিকল্প পথ উন্মুক্ত করে দিতে সক্ষম। এই প্রত্যাশা নিয়েই তাঁরা সমর্থন করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে।৬২

কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন এবং ৩ মে গঠন করেন ফরওয়ার্ড ব্লক। অনুশীলন মার্কসবাদীরা সর্বতোভাবে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করলেও এবং তাঁর সহযোগী শক্তি হিসাবে থাকলেও তাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেননি। তার কারণ ছিল অনেক। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রশ্নে ঐক্য থাকলেও তাঁর সঙ্গে অনুশীলন মার্কসবাদীদের মতাদর্শগত মতপার্থক্য ছিল। সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী হলেও তিনি ছিলেন মূলতঃ বামপন্থী জাতীয়তাবাদী। সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক স্লোগান 'জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা' প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সমূহকেই প্রতি-ফলিত করেছিল। কিন্তু অনুশীলন মার্কসবাদীদের কাছে শুধু এটুকুই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় নি। তাঁদের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ছিল আশু লক্ষ্য, কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল শ্রেণীহীন সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। তাই আশু লক্ষ্য পূরণ ছিল সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।৬৩ এই

প্রসঙ্গে আর এস পি আই-এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'He (Bose) wanted to drag us into it, but we had firm faith in an ideology and we were unable to follow that loose path. We were definite that the objective must be crystal clear and the programme too must be commensurate with it. We had full sympathy with Bose but could not join hands with him only because of this fact. He, too, appreciated this.'৬৪ প্রখ্যাত আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরী জানিয়েছেন, সেই সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে এত বেশি রকমের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের এবং বিশেষতঃ অমার্কসবাদী শক্তির উপস্থিতি ছিল যে, তাঁদের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে একসঙ্গে থাকা ও কাজ করা আর এস পি-র পক্ষে তখন সম্ভবপর ছিল না।৬৫ কেন অনুশীলন মার্কসবাদীরা সর্বতোভাবে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন নি, তার আরও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক David M Laushey. তিনি লিখেছেনঃ 'An additional factor may have been that the Forward Bloc was supported mainly by ex-terrorists from Jugantar, Shree Sangha, and the Bengal Volunteers, whereas the R S P members came exclusively from the Anushilan Samiti and the H S R A.'৬৬

ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ না দিলেও অনুশীলন মার্কসবাদীরা সেই যুগে সম্পূর্ণভাবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। ১৯৩৯ সালের ২২ ও ২৩ জুন ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম সম্মেলনের সময় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গড়ে উঠল বামপন্থী সমন্বয় কমিটি (এল সি সি)। এই এল সি সি-তে যোগ দিয়েছিলেন অনুশীলন মার্কসবাদীরা। প্রথমে 'রায়পন্থী'রা, তারপরে সি এস পি এবং সবশেষে সি পি আই একে একে এল সি সি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও অনুশীলন মার্কসবাদীরা শেষ পর্যন্তই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এল সি সি-তে ছিলেন, তাঁকে ছেড়ে যান নি।৬৭

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে অনুশীলন মার্কসবাদীদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল আর এস পি আই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই রাজনৈতিক দলটির ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিল এবং তা আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় এই ঘনিষ্ঠতার রূপটি আরও স্পষ্ট ও আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।৬৮ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আর এস পি আই-এর পূর্ণ সমর্থন

ও অনুমোদন পেয়েছিল। ১৯৪২ সালের অগস্ট মাসের ৯ তারিখ থেকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নামে যে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হল, সেই সম্পর্কে প্রকাশিত আর এস পি-র থিসিসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের সঙ্গেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা, ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত এবং সমস্ত রকমের ফ্যাসিবাদী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন রোখার কথা বলা হলেও৬৯ নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি ও যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে নিয়ে গঠিত অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার কোনও সমালোচনা এই দলিলে কোথাও নেই। বরং সুভাষচন্দ্রের এই সময়কার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমর্থন এবং লেনিনের উদ্ধৃতি সহকারে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ অনুমোদন পাওয়া যায় প্রখ্যাত আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরীর পুস্তিকায়।৭০

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত আর এস পি-র দলিলে তৎকালীন ফরওয়ার্ড ব্লকের সমালোচনা পাওয়া যায়।৭১ আর এস পি-র চোখে তখন ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল একটি পেটি বুর্জোয়া বামপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল, যার কোনও ভিত ছিল না মার্কসবাদ-লেনিনবাদে এবং যে দল সব সময়েই ছিল চারিত্রিক দোদুল্যমানতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতার শিকার। আর এস পি-র বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন অনুযায়ী ফরওয়ার্ড ব্লক ১৯৪৭ যে ১৯৩৮-৩৯ নয়, বাস্তবতার যে এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, এই সরল সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ, এবং সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামের বৈপ্লবিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ। ফরওয়ার্ড ব্লক আঁকড়ে ধরে আছে শুধু 'নেতাজী কাল্ট' কে ('Netaji cult')।৭২

ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে ১৯৪৭ সালে আর এস পি-র এই সমস্ত সমালোচনা থাকলেও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আর এস পি-র মূল্যায়ন ছিল সবসময়েই ইতিবাচক, যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল ত্রিদিব চৌধুরীর পূর্বোল্লিখিত পুস্তিকাটি। 'তেইশে জানুয়ারী' নামে প্রকাশিত এই পুস্তিকায় ত্রিদিব চৌধুরী 'সমাজবাদী দৃষ্টিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ'৭৩-এর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন, যা ছিল আগাগোড়া সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ইতিবাচক। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই পুস্তিকায় ত্রিদিব চৌধুরী লেনিনের বহু উদ্ধৃতি সহকারে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে সুভাষচন্দ্র কোনও ভুল বা অন্যায় করেন নি। ত্রিদিব চৌধুরী লিখেছেন, 'লেনিনবাদী বিচারেও সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র হিসাবেই সার্থক'।[৭৪] তিনি লিখেছেন, 'পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার শত শত বৎসরের পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি-সংগ্রামের ভিতর দিয়া বিশ্বমুক্তি ও বিশ্ববিপ্লবের ভিত্তি-ভূমি আজ রচিত হইতেছে। নেতাজী সুভাষ এবং তাঁহার আজাদ ফৌজের বীর বিপ্লবী সেনাদল এ যুগের ইতিহাসে দেখা দিয়াছেন সেই বিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের এই বিশ্ববৈপ্লবিক তাৎপর্যের কথা আজিকার দিনে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই।'[৭৫] সুভাষচন্দ্রের আগাগোড়া ইতিবাচক মূল্যায়ন করে লেখা ত্রিদিব চৌধুরীর এই পুস্তিকায় আমরা সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্বচ্ছতার অভাবের, তাত্ত্বিক দুর্বলতার এবং তাঁর ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের সমন্বয় তত্ত্বের কোনও উল্লেখ ও আলোচনা পাই না।

সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তির দাবিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগে শুরু হওয়া যে ব্যাপক ও উত্তাল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আর এস পি আই তাতে অংশগ্রহণ করেছিল সর্বশক্তি নিয়ে, এই আন্দোলনের নেতৃত্বেও এই দলের ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।[৭৬]

সুভাষচন্দ্র এবং বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি

১৯৩২ সালে নভেম্বর মাসে গঠিত হয়েছিল বেঙ্গল লেবার পার্টি। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল লেবার পার্টির মধ্যে কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট দ্বন্দ্ব চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ সালে লেবার পার্টি থেকে অকমিউনিস্টরা বিদায় গ্রহণ করেছিলেন এবং লেবার পার্টির উপর কমিউনিস্টদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শগত যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মিলন প্রচেষ্টার পরিণতি হিসাবে ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে লেবার পার্টির সমস্ত কমিউনিস্ট সদস্যই ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বে লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা অর্থাৎ সমগ্র লেবার পাটি গ্রুপটিই কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে গঠন করেন এক নতুন মার্কসবাদী—লেনিনবাদী পার্টি—বলশেভিক পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া। বলশেভিক পার্টির প্রকাশ্য ও আইনসঙ্গত platform ছিল পুরাতন বেঙ্গল লেবার পার্টি। ১৯৪৪ সালের মে মাসে বলশেভিক পার্টির এক অংশ বলশেভিক পার্টিকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন—প্রত্যেকে ব্যক্তি-

গতভাবে। অপর অংশের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির সমান্তরাল একটি পৃথক্ শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে কাজ করতে থাকে।৭৭

বেঙ্গল লেবার পার্টির কমিউনিস্টরাই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে গঠন করেছিলেন বলশেভিক পার্টি। ফলে বেঙ্গল লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল পরবর্তীকালে বলশেভিক পার্টির বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি। বেঙ্গল লেবার পার্টির কমিউনিস্টরা ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও আপসকামী চরিত্রের সমন্বয় স্বীকার করতেন। তথাপি তাঁদের বক্তব্য ছিল, ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর যে অংশটি বৃহৎ বুর্জোয়া, যার রাজনৈতিক প্রতিনিধি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব অর্থাৎ গান্ধী, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ, সেই অংশটি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ত্যাগ করে আপসরফায় আগ্রহী, সুতরাং এই দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে 'যুক্ত ফ্রন্ট' কখনওই সম্ভব নয়। আর বুর্জোয়া শ্রেণীর অপর অংশ, অর্থাৎ প্রগতিশীল অংশ, কংগ্রেসে যে অংশটির প্রতিনিধি মূলতঃ বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এবং প্রধানতঃ সুভাষচন্দ্র বসু (লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের চোখে জওহরলাল নেহরু মতাদর্শগতভাবে বামপন্থী হলেও দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতায় আগ্রহী নন), সেই অংশটির সঙ্গে 'যুক্ত ফ্রন্ট' করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদী কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে লড়তে হবে। বেঙ্গল লেবার পার্টির কমিউনিস্টদের এই অবস্থানই ছিল পরবর্তীকালে বলশেভিক পার্টির অবস্থান। ফলে তাঁদের কাছের লোক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

'যুক্ত ফ্রন্ট' তত্ত্ব গ্রহণের পর থেকেই সি পি আই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিতে থাকে। বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও সি পি আই মূলতঃ জোর দেয় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর। অপরদিকে লেবার পার্টি গ্রুপ্ এবং পরবর্তীকালে বলশেভিক পার্টি (১৯৪১ সাল পর্যন্ত) বিশেষভাবে জোর দেয় বামপন্থী ঐক্যের উপর। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনেই এই পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারা যে ভাষণ দেন তার থেকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, লেবার পার্টি গ্রুপের নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারে ভাষণের সুর ছিল আলাদা। ভরদ্বাজ, আশরফ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলেও শুধুমাত্র বামপন্থী নেতৃত্ব নয়, ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে বিশেষ সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ তাতে কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরতে পারে।৭৮

অপরদিকে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি বামপন্থী ঐক্যের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন।৭৯ দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে আক্রমণ করে এই বক্তৃতার জন্য নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক তীব্র ভাবে সমালোচিত ও ভর্ৎসিত হন। **National Front** পত্রিকার ১৯ মার্চ ১৯৩৯ সংখ্যায় (Vol. II, No. 6) পি সি যোশী ও অজয়কুমার ঘোষের কলমে ত্রিপুরী অধিবেশনে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার জন্য তাঁদের প্রকাশ্য সমালোচনা করা হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে 'বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ'-এর ও 'ঐক্য বিরোধিতা'র অভিযোগ আনা হয়।৮০

১৯৩৯ সালের ৩মে সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি গ্রুপের সদস্যরা ফরওয়ার্ড ব্লককে 'ঐতিহাসিক প্রয়োজন' বলে অভিনন্দন জানান। তাঁরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও কোনও পদ গ্রহণ করেন নি। অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে কংগ্রেসে থেকে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন নি, যদিও একসঙ্গে আন্দোলন করেছেন। এই লেবার পার্টি গ্রুপের সদস্যরা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন এল সি সি-তে যোগ দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি এল সি সি ছেড়ে বেরিয়ে এলেও বলশেভিক পার্টি এল সি সি ত্যাগ করে নি, বরং শেষ পর্যন্ত তাঁরা এল সি সি-তে ছিলেন। ১৯৪০ সালের মার্চে কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র পাল্টা 'Anti-Compromise Conference' বা 'আপস-বিরোধী সম্মেলন' করেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা ও কমিউনিস্টরা মূল কংগ্রেস অধিবেশনেই যোগ দেন। কিন্তু স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, এন জি রঙ্গ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক প্রমুখ কৃষক সভার নেতৃবৃন্দ, অনুশীলন মার্কসবাদীরা এবং নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টির সদস্যবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের 'আপস-বিরোধী সম্মেলনে।' বলশেভিক পার্টি প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছিল সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে বামপন্থী ঐক্যের উপরে। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'-এর যুগে বলশেভিক পার্টি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ প্রভৃতি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'-এর যুগে ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগঠনকে ব্যবহার করেও বলশেভিক পার্টি বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের ও শাখা খোলার চেষ্টা করেছিল। এই যুগে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ও তাঁর নেতৃত্বাধীন

ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে বলশেভিক পার্টির বজায় ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।৮১

১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসি জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পরই যুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন নিয়ে বলশেভিক পার্টির মধ্যে শুরু হয় বিতর্ক। তীব্র অন্তঃ-পার্টি বিতর্কের পরিণতিতে কমিউনিস্ট পার্টির মতই লাইন পাল্টিয়ে প্রায় ছয় মাস পর ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ফ্যাসিবাদ—বিরোধী জনযুদ্ধ'-এর লাইন গ্রহণ করে বলশেভিক পার্টি। পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন প্রধান নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, এবং তাঁর সঙ্গে বীরেশ গুহ ও কিরণ বসাক। 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধ'-এর নতুন লাইন গ্রহণ করতে তাঁরা ছিলেন নারাজ।

'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধ' লাইনের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বলশেভিক পার্টি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, বিরোধিতা করেছিল অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টার। ফলে সুভাষচন্দ্র এবং বলশেভিক পার্টি তখন পরস্পরের বিপরীত শিবিরে। বলশেভিক পার্টির এই সময়কার দলিলে৮২ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সমালোচনা করে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তিনি ফ্যাসিবাদের শিবিরে চলে গিয়েছেন।৮৩ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির দলিলে এই অভিমত প্রকাশ করা হলেও বলশেভিক পার্টি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের যতটা কড়া সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছিল, সুভাষচন্দ্রের সমালোচনার ব্যাপারে বলশেভিক পার্টি ততটা কড়া ও নির্মম ছিল না। সেটা সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে বলশেভিক পার্টির পূর্বের মধুর সম্পর্কের রেশের জন্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বলশেভিক পার্টির দলিলসমূহে৮৪ দেখা যাচ্ছে, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে বলশেভিক পার্টি তার পূর্বের কড়া সমালোচনা অব্যাহত রাখলেও সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কোনও সমালোচনা নেই, নেই অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য। এও সম্ভবতঃ সেই পূর্বের মধুর সম্পর্কেরই রেশ। বলশেভিক পার্টির এই দলিলসমূহে সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঠিত ফরওয়ার্ড ব্লককে একটি বামপন্থী দল হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়ে তার সঙ্গে বলশেভিক পার্টির যৌথভাবে ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ করার আগ্রহ বিশেষভাবেই প্রকাশ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আবার সারা ভারত উত্তাল হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে। 'জনযুদ্ধ' কালীন সংগ্রাম বিমুখতা ত্যাগ করে বলশেভিক পার্টিও নেমে এসেছিল সেই লড়াইয়ের ময়দানে, অংশগ্রহণ করেছিল আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে অনুষ্ঠিত ব্যাপক ও উত্তাল গণ আন্দোলনে।

সুভাষচন্দ্র-কমিউনিস্ট সম্পর্ক

মৈত্রী-সংঘাতের আলোকে সুভাষচন্দ্র-কমিউনিস্ট সম্পর্কের আলোচনা যেন এক বন্ধুর পথ পরিক্রমা।৮৫ এই বন্ধুর পথ পরিক্রমায় আছে চড়াই, আছে উৎরাই। সুভাষচন্দ্র—কমিউনিস্ট সম্পর্ক এক এক যুগে এক এক পরিস্থিতিতে এক এক রূপ নিয়েছে। কখনও তা ছিল তিক্ত, কখনও মধুর। সম্পর্কের তিক্ততার চরম রূপ দেখা গিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ'-কালীন সময়ে। তখন সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন ছিল সবচেয়ে নেতিবাচক, সমালোচনা ছিল সবচেয়ে তীব্র ও বিধ্বংসী। তারপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সুর অনেকাংশেই নরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন ধারার বহু কমিউনিস্টই নিজেদের মত করে সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন করেছেন। সামগ্রিক পর্যালোচনা করে বলা যায় সুভাষচন্দ্রের কর্মপদ্ধতির এবং তাত্ত্বিক অস্বচ্ছতার ও দুর্বলতার সমালোচনা করলেও বর্তমানে বিভিন্ন ধারার কমিউনিস্টদের সুভাষ-মূল্যায়নের পাল্লাটা সুভাষচন্দ্রের ইতিবাচক মূল্যায়নের দিকেই অনেক বেশি ঝুঁকে আছে।

আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃত দার্শনিক বিশ্ববীক্ষার অভাব ছিল। অপরদিকে ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রকৃত জাতীয় বীক্ষার অভাব ছিল। সুভাষচন্দ্র এবং ভারতের কমিউনিস্টরা উভয়েই স্বীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারলে হয়তো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের ইতিহাস অন্য রকম রূপ নিতে পারত, লেখা সম্ভব হত এক অন্য ইতিহাস।

সূত্রনির্দেশ ঃ

(১) অমিতাভ চন্দ্র, "মৈত্রী ও সংঘাত ঃ সুভাষচন্দ্র ও ভারতের কমিউনিস্টরা," 'অনীক', বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৪—৫, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, কলকাতা, পৃঃ ৩০—৬১ (ক্রোড়পত্র ঃ 'সুভাষচন্দ্র')। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্টদের সম্পর্ক এবং সুভাষচন্দ্র

সম্পর্কে বিভিন্ন ধারার কমিউনিস্টদের নানাবিধ মূল্যায়ন এই প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

(২) সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সি এস পি-র সম্পর্ক আলোচনা করে 'পরিচয়' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ঘোষ।

(৩) John Patrick Haithcox, **Communism and Nationalism in India : M. N. Roy and Comintern Policy : 1920—1939**, Princeton University Press, Princeton, New Jersy, and Oxford University Press, Bombay, 1971, p. 133 ; SM Ganguly, **Leftism in India : M.N. Roy and Indian Politics : 1920—1948**, Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd., Calcutta, 1984, p. 99.

(৪) Subhas Chandra Bose, **The Indian Struggle : 1920—1942**, in **Netaji Collected Works**, (hereafter CW : in a multi-volume project), Volume 2, Edited by Sisir K Bose, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1981, pp, 169—70.

(৪) সুধী প্রধান, **সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি**, পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, অগস্ট, ১৯৯৪, পৃঃ ৩২—৩৩।

(৬) বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনার জন্য দেখুন :
Haithcox, op. cit., pp. 132—33, 167—69 ; Ganguly, op. cit., pp. 98—100, 102—04.

(৭) David M. Laushey, **Bengal Terrorism and the Marxist Left : Aspects of Regional Nationalism in India, 1905—42**, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1975, p. 111 ; Haithcox, op. cit.. p, 169 ; Ganguly, op. cit. p. 121.

(৮) Haithcox, op. cit., p. 176 ; Ganguly, op cit., p. 122 ; Laushey, op. cit, p. 111.

(৯) R C Majumdar, **History of the Freedom Movement in India**, Volume III, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1988, p. 313.

(১০) Subhas Chandra Bose, **The Indian Struggle : 1920-1942, in Netaji CW**, Vol. 2, p. 37 ; Haithcox, op. cit., pp. 186—87 ; Ashoke Mustafi, 'M. N. Roy and Subhas Chandra Bose', **Society and Change**, Vol. V, Nos. 2 & 3, January—June, 1988, Calcutta, p. 224.

(১১) Ganguly, op. cit., p. 124 ; Mustafi, op. cit., p. 224 ; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস,' নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৯০ বাংলা সন (বা স), ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৪, "মস্কো—যাত্রা", পৃ ৫৮।

(১২) Home/Poll./F. No. 7/20/1934 and KW, Serial Nos. 1—4 ; Subodh Roy (ed.), **Communism in India : Unpublished Documents**, Volume I (1925—1934), National Book Agency, Calcutta, 1980, pp. 377—78 ; Sukomal Sen, **Working Class of India : History of Emergence and Movement : 1830—1970**, K P Bagchi and Company, Calcutta, 1979, pp. 308—15 ; Prem Sagar Gupta, **A Short History of All-India Trade Union Congress** (1920—1947), AITUC Publication, New Delhi, September, 1980, pp. 183—95 ; VB Karnik, **Indian Trade Unions : A Survey**, Popular Prakashan, Bombay, 1978, pp. 81—82 ; Haithcox, op. cit., pp. 179—84 ; Ganguly, op. cit., pp. 133—35 ; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৫৭—৫৮ ; রণেন সেন, 'বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০—'৪৮)', বিংশ শতাব্দী, কলকাতা, মে, ১৯৮৯, পৃপৃ ৪২—৪৫।

(১৩) Subhas Chandra Bose, op. cit., pp. 35—36, 258.

(১৪) Haithcox, op. cit., p. 196 ; Ganguly, op. cit., p. 124.

(১৫) Haithcox, op. cit., pp. 247, 251 ; Ganguly, op. cit., p. 159.

(১৬) Haithcox, op. cit., p. 247 ; Ganguly, op. cit., pp. 159—60.

(১৭) Subhas Chandra Bose, op. cit., p. 366.

(১৮) **National Front**, Vol. I, No. 51, February 5, 1939, Bombay, p. 1.

(১৯) Jaiprakash Narayan and PC Joshi, 'On Tripuri, **National Front**, Vol. II, No. 6, March 19, 1939, Bombay, p. 89 ; 'Tripuri—A Political Evaluation,' ibid., p. 93 ; 'Tripuri and After—A Letter', in Subhas Chandra Bose, **Crossroads : the works of Subhas Chandra Bose : 1938—1940**, Edited by Sisir K Bose, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1981, p. 144 b.

(২০) বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনার জন্য দেখুন ঃ
Haithcox, op. cit., pp. 283—87 ; Ganguly, op. cit., pp. 185—88.

(২১) Haithcox, op. cit., p. 285.

(২২) Ajoy Kumar Ghosh, 'Calcutta AICC Session,' **National Front**, Vol. II, No. 14, May 14, 1939, Bombay, p. 224.

(২৩) Ibid., pp. 225, 228.

(২৪) LP Sinha, **The Left-Wing in India** (1919—47), New Publishers, Muzaffarpur, April, 1965, p. 462.

(২৫) Subhas Chandra Bose, **The Indian Struggle : 1935—1942**, Chuckervertty, Chatterjee and Company, Limited, Calcutta, 1952, Appendix II, 'Forward Bloc—Its Jnstification (1-1-1941)', pp. 88—89.

(২৬) Haithcox, op. cit., p. 290.

(২৭) Ganguly, op. cit., p. 210.

(২৮) বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনার জন্য দেখুন ঃ
Haithcox, op. cit., pp. 290—98 ; Ganguly, op. cit., pp. 210—12, 221—36, 240—56 ; LP Sinha, op. cit., pp. 508—11, 522—25 ; Lawshey, op. cit., pp. 130—32.

(২৯) Haithcox, op. cit. ; p. 296 ; Ganguly, op. cit., pp. 227—28 ; LP. Sinha, op. cit., pp. 510—11, 522 ; Laushey, op. cit., p. 131.

(৩০) Subhas Chandra Bose, **The Indian Struggle : 1920–1942, in Netaji C W**, Vol. 2, pp. 376, 387.

(৩১) M.N. Roy, **I. N. A. And The August Revoluton**, with Appendices by Kautilya, Renaissance Publishers, Calcutta, May, 1946, pp. 1—73+p. 1(Mimeographed copy) ; Ganguly, op. cit., p. 261.

(৩২) **Historical Development of Communist Movement in India**, (hereafter **Historical Development**), edited and published by the Politbureau, CC, Revolutionary Communist Party of India, Calcutta, December, 1944. p. 22; **Against the Stream : An Anthology of Writings of Saumyendranath Tagore**, Volume I, edited with an introduction by Sudarshan Chattopadhyay, published by Sarojini Hutheesing on behalf of the Saumyendranath Memorial Committee, Calcutta, 1975, 'Introduction', p. XXII ; সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ, ১৩৯১ বা স জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃ ২৭ ; Horace Williamson, **India and Communism**, with an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha, Editions Indian, Calcutta, 1976, p. 231.

(৩৩) **Historical Development**, p. 29 ; **Against the Stream**, Volume I, p. xxiii ; সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃঃ ৩০।

(৩৪) **Historical Development**, pp. 43.—44.

(৩৫) Intelligence Branch, Government of of Bengal (hereafter IB), File No. 1045/1940 ; Home /Poll. / F. Nos. 37/23/1940 and 37/56/1940 ; সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃঃ ৩৭ ।

(৩৬) **Historical Development**, pp. 58—59, 64.

(৩৭) সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ৯৯ ; সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সরকারী ফাইলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জুন, ১৯৭৮, পৃ.পৃ ১৭—১৮ ।

(৩৮) সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সরকারী ফাইলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ.পৃ ১৭—১৮ ।

(৩৯) তদেব, পৃ ১৮ ।

(৪০) Leonard A Gordon, **Brothers Against the Raj : A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose**, Viking, Penguin Books (India) Limited, New Delhi, 1990, p. 309.

(৪১) সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ ৩০ ।

(৪২) তদেব, পৃ.পৃ ৩০—৩২ ।

(৪৩) তদেব, পৃ ৩২ ।

(৪৪) Gordon, op. cit., p. 323.

(৪৫) সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ.পৃ ৩২—৩৩ ।

(৪৬) ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পুস্তিকা **United Front or Betrayal** মুদ্রিত হয়েছে **Against the Stream** নামক বইটির প্রথম খণ্ডে (Volume I), pp. 137—58.

(৪৭) IB, File Nos. 929/1935 and 1045/1940 ; Special Branch, Government of Bengal (hcreafter SB), File Nos. SM 502/1936, SM 501/1938, SR 506/1938 (Part I) and SR 506/1939 (Part I).

(৪৮) সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পুরানো দিনের দু-একটি কথা", (মাঘ, ১৩৬২ বা স, জানুয়ারি—ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬), 'জয়শ্রী সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ',

জয়শ্রী সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৯০ বা.স, এপ্রিল, ১৯৮৩, পৃ. ২৪৯।

(৪৯) তদেব, পৃ.পৃ. ২৪৯—৫০।

(৫০) তদেব, পৃ. ২৫০।

(৫১) **Against the Stream**, Volume I, op. cit., pp. i—xxvi & 1—158; **Against the Stream: An Anthology of Writings of Saumyendranath Tagore**, Volume II, edited with an introduction by Sudarshan Chattopadhyaya, published by Sarojini Hutheesing on behalf of the Saumyendranath Memorial Committee, Shahibag, Ahmedabad, August, 1984, pp. i—xxiii & 1—232.

(৫২) **Historical Development of Communist Movement in India**, op. cit., pp. i—iii+1—67.

(৫৩) সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ.পৃ. ৭৭, ৭৮, ৮৭—৮৮: সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সরকারী ফাইলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ.পৃ. ৪৩, ৪৪, ৫১।

(৫৪) সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ.পৃ. ৮৯, ৯০-৯১; সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'সরকারী ফাইলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ.পৃ. ৫২—৫৩।

(৫৫) LP Sinha, op. cit., pp. 482, 528.

(৫৬) 'Revolution and Quit India', in **Against the Stream**, Volume II, pp. 108—24, especially pp. 114—117, 124; 'Onward From '42', ibid., pp. 125—33, especially p. 128. ' "Quit India" in Retrospect', ibid., pp. 159—69; 'Introduction', ibid, pp. xiii—xviii; **Historical Development**, pp. 53—67; Saumyendranath Tagore, **The Soviet State—Its Character**, edited with an introduction by Binayak Halder, Ganabani Publishing House, Calcutta, October, 1991, 'Introduction, pp. xiii—xx.

(৫৭) 'Post-War World and India,' in **Against the Stream,** Volume II, pp. 176—199, especially pp. 188—90; 'Leftism and Leftist Unity', ibid., pp. 200—04, especially. pp. 202—03.

(৫৮) Jogesh Chandra Chatterjee, **In Search of Freedom,** Firma KL Mukhopadhyay, Calcutta, February, 1967, pp. 503, 513—15; David M. Laushey, op. cit., pp. 124—25; Buddhadeva Bhattacharyya, **Origins of the RSP : From National Revolutionary Politics to Non-Conformist Marxism,** with a foreword by Tridib Chaudhuri, Publicity Concern, Calcutta, November, 1982, pp. 21—22, 37—38, 54.

(৫৯) Chatterji, op. cit., pp. 533—34; Laushey, op. cit., p. 130; Bhattacharyya, op. eit., pp. 48—49.

(৬০) Bhattacharyya, op. cit., pp. 49,56.

(৬১) Chatterji, op. cit., pp. 523—25; Bhattacharyya, op. cit., pp. 39,41, 43—45.

(৬২) Bhattaeharyya, op, cit., p. 46.

(৬৩) Ibid., p. 46.

(৬৪) Chatterji, op. cit., p. 531.

(৬৫) Laushey, op. cit., p. 130; Bhattacharyya, op. cit., p. 47.

(৬৬) Laushey, op. cit., p. 130.

(৬৭) Laushey, op. cit., pp. 128—29; Bhattacharyya, op. cit., p. 46.

(৬৮) Chatterji, op. cit., pp. 531—32, 533—59, passim.

(৬৯) **On National Struggle of August 1942,** Thesis of the RSP, (Adopted by the Central Committee of the R. S. P. I. in 1942), edited and annotated by

Buddhadeva Bhattacharyya, published by the Revolutionary Socialist Party, Calcutta, August, 1992, P. 14.

(৭০) ত্রিদিব কুমার চৌধ্নরী, 'তেইশে জানুয়ারী', পেয়ারে বাছায়ৎ কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৪৭, প্ন:প্ন: ১—২০

(৭১) **Political Situation and Statement of Policy of the R.S.P.I., On the Changed National Political Situation and New Tasks of the Party,** published by the Central Committee of the F PI, place not mentioned, undated (probably 1947), pp. 29—37.

(৭২) Ibid., pp. 35—36.

(৭৩) ত্রিদিব কুমার চৌধ্নরী, প্নর্বোল্লিখিত, প্ন: ৩ ।

(৭৪) তদেব, প্ন: ১৯ ।

(৭৫) তদেব, প্ন:প্ন: ১৯—২০ ।

(৭৬) এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনার জন্য দেখ্নন : ব্নদ্ধদেব ভট্টাচার্য, 'ঐতিহাসিক একুশে নভেম্বর', প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮৫, প্ন:প্ন: ১—২৭ ।

(৭৭) বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনার জন্য দেখ্নন : অমিতাভ চন্দ্র, "বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি : ১৯৩২—১৯৩৯ : সংগঠন ও রাজনীতি" ও "দ্বিতীয় বিশ্বয্নদ্ধ ও বলশেভিক পার্টি : ১৯৩৯—১৯৪৫", 'অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : স্নচনা পর্ব', প্নস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯২, প্ন:প্ন: ১৭৫—২১৭ ।

(৭৮) P C Joshi, 'Tripuri', **National Front**, Vol. II, No. 6, Marcn 19, 1939, Bombay, pp. 96—97.

(৭৯) Ibid., p. 97.

(৮০) P C Joshi, 'Tripuri,' and Ajoy Kumar Ghosh, 'Communists At Tripuri', **National Nront,** Vol. II, No. 6, March 19, 1939, pp. 97,100 (Joshi), and p. 101 (A K Ghosh) ; SB, File No. SR 506/1939 (Part I).

(৮১) বিস্তারিত বিবরণ ও আলোচনার জন্য দেখ্নন : অমিতাভ চন্দ্র, প্নর্বোল্লিখিত, প্ন:প্ন: ১৮৯—৯০, ২০৪—০৫, ২০৭—০৮, ২১২ ।

(৮২) **Indian Politics : 1941—44,** Draft Political Report of the Politbureau of the Bolshevik Party of India, Calcutta, June, 1944, pp. i—ii+1—2+i—iii+1—96.

(৮৩) Ibid., p. 45.

(৮৪) **Imperialism, Indian Fascism and the People,** Central Committee Plenum of the Bolshevik Party of India, Published by the Bolshevik Party of India, Calcutta, November, 1948, pp. i—ii+I-II+1—72+I–XVI+1—4; Biswanath Dubey, **Revolution and India,** Progressive Literature Publishing House, Calcutta, March, 1947, pp. 1—86; বিশ্বনাথ দুবে, 'বিপ্লব ও ভারত', প্রোগ্রেসিভ লিটারেচার পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, তারিখ অনুল্লিখিত (সম্ভবতঃ ১৯৪৭), পৃ.পৃ. ১—৬৮।

(৮৫) অমিতাভ চন্দ্র, "মৈত্রী ও সংঘাত : সুভাষচন্দ্র ও ভারতের কমিউনিস্টরা" 'অনীক', কলকাতা, বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৪—৫, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৫, পৃ.পৃ. ৩০—৬১ (ক্রোড়পত্র : 'সুভাষচন্দ্র')।

সুভাষ, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও কংগ্রেস নেতৃত্ব

সুনীতিকুমার ঘোষ

সুভাষ সম্বন্ধে আমরা দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েছি। এক সুভাষ-প্রশস্তি, সুভাষ-বন্দনা—যার মধ্যে তথ্য ও যুক্তির অভাব পূরণ করা হয়েছে ভক্তির উচ্ছ্বাস দিয়ে। দ্বিতীয়, ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থে সুভাষকে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন সুভাষকে ফ্যাসিস্ত, ফ্যাসিস্তদের দালাল ও দেশদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। সেখানেও যথেষ্ট তথ্যের অভাব।

ত্রিপুরীর পরে ১৯৩৯ সালেই জহরলাল নেহরু সুভাষ ও তাঁর নবগঠিত পার্টি ফরওয়ার্ড ব্লককে ফ্যাসিস্ত ও সুবিধাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর উত্তরে সুভাষ বলেছিলেন ঃ

"I shonld rather label as opportunists those who would run with the hare and hunt with the hound—those who pose as leftists and act as rightists—those who talk in one way when they are inside a room and in quite a different way when they are outside....Are those people tobe called fascists who are fighting fascism within the Congress and without or should they be dubbed as fascists who support the present autocratic 'high command' either by openly joining the present homogeneous Working Committee or by secretly joining in their deliberations and drafting their resolutions ?"

সুভাষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ও গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫-এর বিরুদ্ধে সুভাষের অভিযান গান্ধী জহরলালদের কাছে রুচিকর ছিল না। তাই ১৯৩৯ সালেই ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধী ও জহরলালের

অনুগামীরা সুভাষের জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করতে কি বলেছিলেন তা বোধ হয় এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক হবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রূপে শেঠ গোবিন্দ দাস ঘোষণা করেছিলেন :

"Our Congress organization can be compared and is similar to the Fascist Party of Italy, the Nazi Party of Germany....Mahatma Gandhi occupies the same position among Congressmen as that held by Mussolini among Fascists, Hitler among Nazis..."

আর যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) তখনকার প্রধান মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ যিনি ত্রিপুরী কংগ্রেসে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তিনি প্রস্তাবের উপর বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

"Wherever nations had progressed, they had done so under the leadership of one man. Germany had relied on Hitler. Whether they agreed with Herr Hitler's methods or not, there was no gainsaying the fact that Germany had progressed under Hitler."[৩]

গান্ধী-জহরলালের অনুগামীরা সদর্পেই কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের মঞ্চ থেকে গান্ধীকে হিটলার ও মুসোলিনীর এবং কংগ্রেসকে জার্মানির নাৎসী পার্টি ও ইতালির ফ্যাসিস্ত পার্টির সমপর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। 'সমাজতন্ত্রী' নেহরু তাতে যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই।

১৯৪২-এর ১৪ এপ্রিল সাংবাদিকদের সংগে এক সাক্ষাৎকারে নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন যে, সুভাষের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করবেন যদি সুভাষ তাঁর দল নিয়ে জাপানিদের সংগে ভারতবর্ষে আসেন।[৪] তাঁর সংকল্প কার্যে পরিণত করতে হলে ইংরেজ ও মার্কিনীদের পরিচালনায় তাদের দেওয়া অস্ত্র নিয়েই নেহরুকে তখন সুভাষের বিরুদ্ধে লড়তে হতো। এই ঘোষণার কয়েকদিন আগে ৬ এপ্রিল ১৯৪২-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্নেল লুই জনসনকে নেহেরু বলেছিলেন—প্রকাশ্যে নয়, গোপনে—যে তাঁর বাসনা ভারতবর্ষ ব্রিটেনের বদলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার হবে ("Nehru had then gone on to speak of hitching India'a wagon to America's star and not Britain's")।[৫]

১৯৪২ ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সুভাষকে ফ্যাসিস্তদের দালাল ও দেশদ্রোহী বলে প্রচার করেছিলেন। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত ও জাপানি সাম্রাজ্য-বাদীরা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলি দেশ দ্রুত জয় করে ভারতবর্ষের পূর্ব দ্বারে উপস্থিত। সেদিন সুভাষ জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।

গত তিন দশকে আগে যা অজানা ছিল এমন অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সুভাষের চিঠি-পত্র, অন্যান্য লেখা ও দলিল এবং হিউ টয় (Hugh Toye) অথবা লিওনার্ড গর্ডনের (Leonard Gordon-এর) লেখার মত সুভাষ-সম্পর্কে গবেষণামূলক বইও বেরিয়েছে। প্রাথমিক ও অন্যান্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে আজ এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সুভাষ ফ্যাসিস্ত বা ফ্যাসিস্তদের দালাল বা দেশদ্রোহী ছিলেন না।

সুভাষ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। গান্ধী, জহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতাদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের (পরে, মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদেরও) আওতার মধ্যে ভারতকে স্বশাসিত দেশে পরিণত করা—(এখানকার মুৎসুদ্দি বড় বুর্জোয়াদের যা কামনা ছিল)—সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা নয়। সুভাষের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ রূপে গড়ে তোলা এবং সমাজতন্ত্রের পথে পরিচালিত করা। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন যোদ্ধা ছিলেন। তাই ভাইসরয় আরউইনকে ১৯৩১-এর ফেব্রুআরিতে গান্ধী নিভৃতে জানিয়েছিলেন যে, সুভাষ তাঁর প্রতিপক্ষ ("opponent")[৬] এবং ১৯৪০-এর ২৯ ডিসেম্বর তারিখে সুভাষকে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে এবং তাঁদের লক্ষ্য শুধু আপাতদৃষ্টিতেই মনে হয় যে এক ও অভিন্ন।[৭] প্রকৃতই তাঁদের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন, সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাঁদের মধ্যে এ সম্পর্কে অবশ্যই মৌলিক পার্থক্য ছিল।

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে সুভাষ ফ্যাসিস্তদের সংগে হাত মিলিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্যই তিনি ফ্যাসিস্তদের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ফ্যাসিস্ত মতবাদ ও ফ্যাসিস্তদের আন্তরিক ঘৃণা করতেন। অন্যদিকে, তাঁর ছিল বিপুল আস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর।

আমার অন্য লেখায় সুভাষের আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, গান্ধী জহরলাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের সংগে তাঁর মৌলিক পার্থক্য, ফ্যাসিস্তদের প্রতি ঘৃণা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে অনেক আশা ও আস্থা বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি।[৮] আজ সে আলোচনায় আর প্রবেশ করব না।

এ প্রশ্ন সংগতভাবে উঠতে পারে যে, ফ্যাসিস্ত মতবাদের প্রতি সুভাষের যদি এত ঘৃণা তাহলে তাঁর *The Indian Struggle* গ্রন্থে তিনি কেমন করে কমিউনিজম্ ও ফ্যাসিস্ত মতবাদের সমন্বয়ের কথা বলতে পারলেন? *The Indian Struggle 1920—1934* লেখা হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *Daily Worker*-এর প্রতিনিধি রজনী পাম দত্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পাম দত্তের এক প্রশ্নের উত্তরে সুভাষ বলেছিলেন যে, তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছে; যখন তিনি ঐ সমন্বয়ের কথা লিখেছিলেন তখন ফ্যাসিস্ত ইতালির সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়নি। ইতালি ইথিওপিয়ার উপর আক্রমণ করে ১৯৩৫ সালে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সুভাষ ফ্যাসিস্ত পার্টি বা ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্র বুঝতে অন্তত তখন অক্ষম ছিলেন। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত "The Secret of Abyssinia and its Lesson" প্রবন্ধে তিনি ফ্যাসিস্ত ইতালির ইথিওপিয়া-গ্রাসকে নিন্দা করতে ইতস্তত করেননি। অন্যত্রও ইতালি ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক চরিত্রের নিন্দা করেছেন। নাৎসী জার্মানির 'জাতি-তত্ত্ব' (racism) ও বৈষম্যমূলক বর্বর অত্যাচারকে তিনি ঘৃণা করতেন। এবং তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। এ বিষয়ে জার্মান একাডেমির Dr Thierfelder কে লেখা তাঁর ২৫ মার্চ ১৯৩৬ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।[৯]

এ সব সত্ত্বেও তিনি মনে করতেন যে, ভারতকে মুক্ত করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে অন্য যে সব শক্তির—সে কমিউনিস্ট, ফ্যাসিস্ত বা নাৎসী হোক—দ্বন্দ্ব আছে তার সুযোগ নেওয়া প্রয়োজন। ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারীতে লেখা 'Our Internal and External Policy' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন:

"In the domain of our external policy, our own socio-political views or predilections should not prejudice us

against people or nations holding different views, whose sympathy we may nevertheless be able to acquire. This is a universal cardinal principle in external policy and it is because of this principle that today in Europe a pact between Soviet Russia and Fascist Italy is not only a possibility but an accomplished fact."[১০]

এ কথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩৪ তারিখে তাঁর "Report to the Seventeenth Congress of the Communist Party of the Soviet Union (Bolshevik)"-এ স্তালিন এই চুক্তির উল্লেখ করেছিলেন। এবং নাৎসী জার্মানির সংগে ভাল সম্পর্ক কেন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

"...Fascism is not the issue here, if only for the reason that fascism in Italy, for example, has not prevented the U.S.S.R. from establishing the best relations with that country.…Our orientation in the past and our orientation at the present is towards the U.S.S.R. and towards the U.S.S.R. *alone*."[১১]

এই নীতি ঠিক হোক বা ভুল হোক সুভাষ এই নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন ঃ

"In connection with our foreign policy, the first suggestion that I have to make is that we should not be influenced by the internal policies of any eountry or of the form of its state. ...In this matter we should ake a leaf out of Soviet diplomacy. Though Soviet Russia is a communist state, her diplomats have not hesitated to make alliances with non-socialist states and have not declined sympathy or support coming from any quarter."[১২]

যে সব রাষ্ট্র—সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি—যাদের

সংগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বৈরিতামূলক দ্বন্দ্ব আছে বলে সুভাষ মনে করেছেন ভারতের মুক্তিযুদ্ধে তাদেরই সাহায্য ও সমর্থন পেতে সুভাষ আগ্রহী ছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে ও পরে তিনি তার জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের প্রথমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের উপর সেই যুদ্ধ চাপিয়ে দিল, তখন কংগ্রেস নেতৃত্ব আগেকার যুদ্ধবিরোধী সব প্রস্তাব ও ঘোষণা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে যে নীতি অনুসরণ করলেন তাকে সুভাষ আখ্যা দিয়েছিলেন "a policy of inaction"। শুধু 'inaction'—নিষ্ক্রিয়তা নয়। যখন ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রচার ও সংগ্রাম দমন করার জন্য কঠোরতম আইন-কানুন জারী করেছে এবং তা প্রয়োগ করে কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস ও সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা ইত্যাদিদের হাজার হাজার নেতা ও কর্মীকে জেলে পুরছে, তখন কংগ্রেস-নেতৃত্বের কাজ হল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের সমস্ত প্রচার ও লড়াইয়ের রাশ শক্ত হাতে টেনে ধরে থাকা। ইতিমধ্যে সুভাষ কংগ্রেস থেকে কার্যত বিতাড়িত হয়েছেন। ১৯৪০-এর ২রা জুলাই তিনি কারারুদ্ধ হলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বন্দী না থেকে দেশের বাইরে চলে গিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা তিনি করলেন। কীভাবে ব্রিটিশ সরকারের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে তিনি গোপনে ১৯৪১-এর ২৮ জানুয়ারীতে কাবুলে পেঁছিুলেন সে কথা সকলের জানা আছে। সেখানে পেঁীছে তাঁর সংগী ভগৎরাম তলওয়ারকে সোভিয়েত দূতাবাসে পাঠালেন। তাঁর উদ্দেশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যাওয়া। তখনও সোভিয়েত জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হয়নি। তাদের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি ছিল; ব্রিটেনের সঙ্গে সোভিয়েতের কোন মৈত্রী চুক্তি ছিল না।

সোভিয়েত পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সুভাষ ২রা ফেব্রুয়ারী জার্মান দূতাবাসের সংগে যোগাযোগ করেন। কাবুল তখন বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের গুপ্তচরে ঠাসা। ১৮ই মার্চ মস্কো হয়ে তিনি বার্লিনে যাবার জন্য কাবুল ত্যাগ করেন। Hugh Toye—যিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার রূপে কয়েক বছর দলিল-পত্র ঘেঁটেছেন—লিখছেন:

"The journey from Kabul to Rome or Berlin could only

be by way of Moscow. Even now Bose had no good word for the Axis. He still hoped in the last resort to reach the Soviet rulers on his way through their country. 'I am not altogether happy', he said, 'about going to Berlin or Rome. But there is no choice'."[১৩]

নাৎসীরা যখন সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করল তখন তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। নাৎসীদের ডেরায় থেকে নাৎসীদের এই কাজের বিরূপ সমালোচনা করতে ও তাদের কর্তৃপক্ষকে তা জানাতে তিনি দ্বিধা করেননি। হিটলারেরও তিনি তিক্ত সমালোচনা করেন।[১৪] বার্লিনে নাৎসীদের আশ্রয়ে থেকেও তিনি মাথা উঁচু রেখেছিলেন।

১৯৪১-এর ডিসেম্বরেই তিনি জার্মানি ত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে আসতে চেয়েছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের কাছাকাছি থাকা। এবং তার জন্য জার্মান সরকারের সাহায্য চেয়েছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়েরাও তাঁকে সেখানে আনার জন্য জাপানি সরকারের উপর চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছুতে তাঁর অনেক দেরি হয়। ১৯৪৩-এর জুনের মাঝামাঝি তিনি টোকিওতে আসতে পেরেছিলেন। তখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে।

১৯৪৩-এর জুলাই মাসে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্প্রসারিত হয়। জাপানের হাতে কয়েক সহস্র যুদ্ধবন্দীই নয়, সুভাষের আহ্বানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক ভারতীয় পুরুষ ও নারী আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। ২১শে অক্টোবর সাময়িক স্বাধীন ভারত সরকার (Provisional Government of Free India) সিঙ্গাপুরে তিনি স্থাপন করেন। সুভাষের দেশপ্রেম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনেও সঞ্চারিত হয়। নেহরু মার্চ ১৯৪৬-এ ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্যে মালয় পরিভ্রমণ করেন। সিঙ্গাপুর তখন মালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাউণ্টব্যাটেন সে সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তির সর্বোচ্চ অধিনায়ক। তিনি নেহরুকে এরোপ্লেন ইত্যাদি আশাতীত সাহায্য দিয়ে তাঁর মালয় ভ্রমণকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন। নেহরুও মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশ মেনে চলেছিলেন।[১৫] কংগ্রেস সভাপতির কাছে পাঠানো গোপন রিপোর্টে নেহরু লিখেছিলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ (যার সভাপতি ছিলেন সুভাষ)-এর প্রভাবে মালয়ের অর্ধনগ্ন দরিদ্রতম ভারতীয়ও শিরদাঁড়া সোজা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছিলেন।[১৬]

সুভাষ আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করেননি। আশা করেছিলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও ভারতীয় জনগণের কাছে দেশপ্রেমের যে আবেদন পৌঁছে দেবে তার ফলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লব ঘটে যাবে। তার পরিণতিতে ব্রিটিশ শাসন চূর্ণ হবে।[১৭] এবং যে বিপুল শক্তি জন্মলাভ করবে তা যদি কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ—জার্মানি বা জাপান-ভারত দখল করতে চায় তাকেও সফলভাবে প্রতিহত করবে। তাঁর আশা বোধহয় অতিরিক্ত ছিল।

কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুভাষ কোন ফ্যাসিস্ত বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালাল ছিলেন না।

১৯৪২-এ এপ্রিলে তিনি বার্লিন থেকে রেডিও মারফত ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"I am not an apologist of the Tripartite Powers ; that is not my job. My concern is with India.... . My allegiance and loyalty have ever been and will ever be to India alone, no matter in which part of the world I may live."[১৮]

এ বক্তব্য তিনি আরও অনেকবার ঘোষণা করেছেন[১৯] এবং তা' পরিপূর্ণ সত্য।

লক্ষ্যণীয় যে, তাঁর সংগ্রাম ছিল ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, প্রচার একান্তভাবে এদেরই বিরুদ্ধে ছিল—তা জার্মানি ও জাপানের শত্রু অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে নয়, তা' জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে রত কোন জাতির বিরুদ্ধে নয়।

জার্মানিতে যাবার আগে ও জার্মানি ত্যাগ করার পর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। ১৯৪৪-এর ২০শে নভেম্বর তিনি জাপানে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত জ্যাকব মালিককে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা জানিয়ে একটি চিঠি দেন। সেই চিঠিতে লেখেন, আমরা লড়ছি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নয়। নাৎসী জার্মানি

ও ফ্যাসিস্ত ইতালির তা' জানা আছে। আর সোভিয়েতের প্রতি জাপানের নীতি নিরপেক্ষতার নীতি। যে সমস্ত দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়ছে লেনিন সর্বান্তঃকরণে তাদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। আমার ধারণা, ভারতের মত দেশের প্রতি সোভিয়েতের নীতি তাঁর মৃত্যুর পরেও অপরিবর্তিত আছে। আমি আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আলোচনা করতে চাই কী ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করতে পারে।[২০]

জার্মানিতে তিনি নাৎসীদের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। সেখানে ইতালির হাতে বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে যে ভারতীয় সামরিক বাহিনী (Indian Legion) সংগঠিত করেছিলেন, নাৎসীদের সঙ্গে শর্ত ছিল যে, তাকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ছাড়া অন্য কোন রণাঙ্গণে ব্যবহার করা চলবে না। আজাদ হিন্দ ফৌজকেও ভারতকে মুক্ত করার লড়াই ছাড়া অন্যত্র নিয়োগ করা যাবে না। এই শর্ত ছিল জাপানিদের সঙ্গেও।

হিউ টয় লিখেছেন ঃ

"He [Subhas] maintained a brave independence from the Japanese."[২১]

এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রচুর তথ্যের মধ্যে আমরা এখানে দুটি উল্লেখ করতে চাই।

সুভাষ, টয়ের কথায়, "refused to allow the I.N.A. to be used against the Burmese National Army of Aung San after its revolt from the Japanese on March 25th [1945]."[২২]

বর্মার Anti-Fascist People's Freedom League-এর সভাপতি আউঙ সানও এ কথার উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৪৬-এর ২৪শে জুলাই রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র বসুর সম্বর্ধনা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি বলেন ঃ

"I knew Netaji, as I came into close and frequent contact with him during this recent world war. I knew him and I knew his burning love for his country and his people, and his unflinching determination to fight for the freedom of his country. I knew him also as a sincere friend of

Burma and Burmese people. Between him and myself, there was complete mutual trust ; and although time was against both of us so that we could not come to the stage of joint action for the common objective of the freedom of our respective nations, we did have an understanding in thosedays that, in any event, and whatever happened, the I.N.A. and the B.N.A. [Burmese National Army] should never fight each other. And I am glad to tell you today that both sides did observe the understanding scrupulously on the whole, during the days when we were up in arms against the Japs."[২৩]

আর একটি দৃষ্টান্ত।

হিউ টয় বলছেন, ১৯৪৫-এ মালয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে যে গেরিলারা লড়াই করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের তৃতীয় ডিভিসনের অফিসার ও সৈনিকরা গোপনে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান করছিলেন। গেরিলাদের বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের ব্যবহার করার জন্য জাপানিরা ডিভিসনের সেনাধ্যক্ষের উপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল। তিনি তার কাছে নতি স্বীকার করেননি। সুভাষ সেখানে এসে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন এবং তার ফলে জাপানিদের সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরে।[২৪]

টয়ের এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় কংগ্রেস সভাপতির কাছে মালয় থেকে পাঠানো নেহরুর গোপন রিপোর্টে—যে রিপোর্টের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। নেহরু লিখেছিলেন, মালয়ের চীনা অধিবাসীরা জাপানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না এবং দু'পক্ষের মধ্যে গোপনে যোগাযোগের জন্য কতকগুলি জায়গা ছিল। চীনারা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানিদের সঙ্গে তত সহযোগিতা করছিল না যতটা তারা লড়ছিল ভারতের মুক্তির জন্য, যার প্রতি চীনাদের সহানুভূতি ছিল।[২৫]

মালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনেও নেহরু এই কথার প্রায় পুনরাবৃত্তি করেন।[২৬]

সুভাষ সাম্যবাদের (কমিউনিজম্-এর) চূড়ান্ত জয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।[২৭] ফ্যাসিবাদের প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক ঘৃণা। ১৯৪৫-এর ৭ই মে জার্মানি আত্মসমর্পণ করেছিল। তার জন্য দায়ী করেছিলেন সুভাষ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশ সম্পর্কে জার্মানির পররাষ্ট্র নীতিকে।[২৮] তিনি আশা করেছিলেন জার্মানির পতনের পরে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব তীব্র হবে ও জার্মানির অপেক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আসন্ন ধ্বংস সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন।[২৯]

১৪ই অগাস্ট জাপানের আত্মসমর্পণের পর সুভাষের আশা ও আস্থা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে। তিনি জাপানি কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন যে, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবেন। মাঞ্চুরিয়াতে রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সোভিয়েত ভূমি থেকে ভারতের মুক্তির লড়াই চালিয়ে যাবেন। এক জাপানি অফিসারকে তিনি বলেছিলেন, একমাত্র ওরাই ব্রিটিশকে প্রতিরোধ করতে পারবে। আমার ভাগ্য ওদের সঙ্গে বিজড়িত।[৩০]

এই প্রবন্ধে সুভাষের দুর্বলতা বা তাঁর দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা আলোচনা করিনি, এই প্রবন্ধে তার অবকাশ ছিল না। তবে আমার মনে হয়, এটা ছিল তাঁর গৌণ দিক; তাঁর অনন্যসাধারণ কর্মবহুল জীবনের ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক দিক ভারতের সমকালীন রাজনীতি ও সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। ভারতের দুর্ভাগ্য বলে মনে হয় যে, ত্রিশের দশকে সুভাষের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিপ্লবী সাম্যবাদের ঐক্য গড়ে ওঠেনি, যার একান্ত প্রয়োজন ছিল ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের চূড়ান্ত জয়ের জন্য। তার পরিবর্তে ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ১৯৩৬ সাল থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী, ভারতের মুৎসুদ্দি বড় বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রতিনিধি, গান্ধী জহরলাল প্রমুখ নেতাদের, বিশেষ করে জহরলালের, নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ায় সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।[৩১]

যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার বহু হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী অফিসার ও সৈনিকদের ভারতে নিয়ে এসে খুব আড়ম্বর সহকারে সামরিক আদালতে তাঁদের বিচার শুরু করে। একটা বহু প্রচলিত ধারণা আছে—যে ধারণা কংগ্রেসী প্রচারযন্ত্র ও অনেক ঐতিহাসিক আমাদের মনে সৃষ্টি করেছেন।

জহরলাল নেহরু প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা মধ্যযুগের ইউরোপের নাইটদের মত সেই মুহূর্তে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে বন্দীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। সে সম্বন্ধে কিছু তথ্য কয়েক বছর হ'ল প্রকাশিত হয়েছে। এই তথ্যগুলির কিছু সদ্ব্যবহার ক'রে আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করব।

২

আপাতবিরোধী মনে হলেও পরাজয়ে ও বন্দীত্বের মাঝেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জয়ী হয়েছে। সুভাষ আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করেননি। তাঁর আশা ছিল যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলে নৈতিক শক্তি, তার দেশপ্রেমের আবেদন, ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করবে—এবং ভারতীয় জনগণের উপরেও। সে প্রভাবে তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। সুভাষ বোধহয় জানতে পারেননি যে, তাঁর এই প্রত্যাশা অনেকটা পূর্ণ হয়েছিল ; তবে যখন যেখানে এবং যেভাবে তিনি এটা ঘটবে বলে আশা করেছিলেন সেভাবে ঘটনা ঘটেনি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের হাজার হাজার অফিসার ও সাধারণ সৈন্যকে বন্দী করে ইংরেজরা এ দেশে নিয়ে আসে ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপরাধে কোর্ট মর্শালের জন্যে। তাদের পরিকল্পনা ছিল কিছু বন্দীকে মুক্তি দিয়ে অন্যদের জেলে পাঠানো আর অন্ততঃ ৪০/৫০ জনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া। এই পরিকল্পনার রচয়িতা ভারত সরকারের যুদ্ধ দপ্তরের তদানীন্তন যুগ্ম-সচিব ফিলিপ ম্যাসন লিখেছেন : "it met at first with gratified approval, even from the Congress leaders."[৩২] হিউ টয় বলছেন : "The first Congress reaction was favourable."[৩৩] তৎকালীন বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ক্লড অচিনলেকের জীবনীকার জন কোনেলও এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন।[৩৪]

"কিন্তু", "ম্যাসন লিখছেন", কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব কিছু বদলে গেল। জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের তরঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক বলে অভিনন্দিত হতে লাগলো। নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা যে সব রাজনৈতিক নেতাদের কাছে বড় ছিল তাঁরা কেউই দূরে সরে থাকতে পারলেন না—সবাইকে 'শহীদ'দের সমর্থনে দাঁড়াতে হলো। আজাদ

হিন্দ ফৌজ প্রতিরক্ষা তহবিল, আজাদ হিন্দ ফৌজ পতাকা দিবস ইত্যাদির ছড়াছড়ি পড়ে গেল।...And in the face of this storm of public feeling...at which Congress leaders were secretly as much perturbed as the British...the original plan was changed."[৩৫]

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যরা বন্দিদশায় দেশে ফিরে আসার পর যখন খবর ছড়িয়ে পড়ে যে ঔপনিবেশিক শাসকরা তাঁদের সামরিক আদালতে বিচারের তোড়জোড় করছে, তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা, আজাদ হিন্দ ফৌজের উত্তর-পূর্ব ভারতে সামরিক অভিযান এবং কোহিমায় স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন—এইসব কাহিনী এই উপমহাদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সুভাষের ডাক "চলো দিল্লী" জনগণের হৃদয়ে অনুরণন তোলে, তাঁর "জয় হিন্দ" অভিবাদন দেশের কোণে কোণে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। রজনী পাম দত্ত সঠিকভাবেই লিখেছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের দৃষ্টান্ত এবং "তার নেতাদের পরবর্তীকালে বিচারের উদ্যোগ জঙ্গী দেশপ্রেমের শিখা লেলিহান করে পুরানো অহিংস সংগ্রামের বদলে ক্ষমতা দখলের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারণাকে উজ্জীবিত করে।"[৩৬] পরাজিত হয়েও আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ রাজের প্রতি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর আনুগত্যকে নাড়িয়ে দেয়, তার বড় একটা অংশের দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তর ঘটায়। অচিনলেকের জীবনীকার লিখেছেন: "আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘটনা সারা ভারতে কেবল আবেগকে উদ্বেলিত করেনি, সৈন্যবাহিনীর প্রবীণ ও বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারীদেরও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।"[৩৭]

আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা ও সৈন্যদের শাস্তিদানের জন্যে বৃটিশরাজের পরিকল্পনাকে "সানন্দ অনুমোদন" (gratifd approval) জানিয়েও নেহরু ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের দৃষ্টিভঙ্গি হঠাৎ কেন আজাদ হিন্দ বীরদের প্রতি সোচ্চার সমর্থনে পরিবর্তিত হয়ে গেল? নেহরু অচিনলেককে লিখেছিলেন:

"মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী দেশের দূরতম গ্রামে-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে, আর সবখানেই তাদের প্রতি সপ্রশংস মনোভাব, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ও আশংকা, প্রকাশ পেতে থাকে।

জনগণের মনে এই ঘটনা যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর, কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর ছিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও সাধারণ সেনানীদের বড় একটা অংশের মধ্যে অনুরূপ মনোভাবের প্রকাশ। তাদের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।"৩৮

তার আগেই, ২৬ নভেম্বর ১৯৪৫, অচিনলেক নিজেই বড়লাট ওয়াভেলকে লেখেন: "বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবর থেকে আর প্রধানত আমার নিজের উপলব্ধি থেকে আমার মনে হয়, [বৃটিশ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে] আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সহানুভূতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।"৩৯

তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিঘাতে বেশ কিছু প্রাদেশিক গভর্নরও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ২৬ নভেম্বর-এ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্নর ট্যাইনহ্যাম ওয়াভেলকে পাঠানো রিপোর্টে বলেন: "জনতার উপরে গুলি চালাতে বলা হলে ভারতীয় সৈন্যরা কি মনোভাব নিতে পারে ভেবে আমি যে বেশ অস্বস্তি বোধ করছি সেটা আমি বলতে বাধ্য। একটা উত্তেজনাকর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আকস্মিক মানসিক পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার প্রবণতা খুবই রয়েছে, ঠিক যেমনটা ছিল, আমার মনে হয়, বিদ্রোহের (১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ) কালে।"৪০

ওয়াভেল বলেছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপারটাকে কাজে লাগানোর জন্যে কংগ্রেস নেতারা সঙ্গে সঙ্গেই "তাদের প্রতি সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছেন, কখনো আবার তাদের বীরের মর্যাদায় ভূষিত করছেন।"৪১ ভারতীয় নেতাদের সুবিধাবাদী মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে লিওনার্ড মোসলে লিখেছেন: "যেমন নেহরু, যিনি একান্তে এইসব রেনিগেডদের দলত্যাগীদের সম্পর্কে ধিক্কার, ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করতেন না, তিনিও এই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন অতি দ্রুত।"৪২ নেহরুর আসল রূপ ও বাইরের পোশাকী রূপ—এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত ছিল। তাঁর বাইরের পোষাকী রূপেই এখনও অনেককে বিভ্রান্ত করে।

কংগ্রেস নেতারা তখন প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্যে ডিফেন্স কমিটি গড়েছিলেন। নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দীর্ঘ দিনের সদস্য আসফ আলি এই

কমিটির আহ্বায়ক হন। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের দক্ষ অভিনেতা নেহরু স্বয়ং ব্যারিস্টারের কালো পোশাক গায়ে চড়িয়েছিলেন।

বৃটিশ শাসক ও কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধোত্তর যে গণ-বিক্ষোভের আশংকা করেছিলেন, যুদ্ধ শেষের অল্পদিনের মধ্যেই তার সূচনা হয়। ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর ১৯৪৫, কলকাতা ও শহরতলীতে মানুষের জমে-থাকা ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটে। দাবি ছিল আজাদ হিন্দ্ বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তখন বিচারাধীন কিছু আজাদ হিন্দ বাহিনীর অফিসারদের মুক্তির দাবিতে সংগঠিত ছাত্র মিছিলের উপয় গুলি চালায় পুলিশ, দু'জন ছাত্র নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে শহর ও শহরতলীতে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন, সমস্ত পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায়। পথে পথে গড়ে ওঠে ব্যারিকেড। তখন জনতার সঙ্গে সুরু হয় সশস্ত্র পুলিশ আর সাঁজোয়া বাহিনী সহ সৈন্যদের লড়াই। বহু মানুষ হতাহত হয়। সারা বাংলা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবে জ্বলে ওঠে।

কলকাতায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের এক রিপোর্টে বলা হয়ঃ "এই বিশৃঙ্খলা হল খবরের কাগজে আর জনসভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে অসংযত প্রচারের প্রত্যক্ষ ফল।....শুক্রবার সকালেই পুলিশের মনোবল প্রকৃত উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়েছিল।...জনতার মেজাজ তখন সত্যই খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠে...আর সমগ্র অরাজকতা ১৯৪২ সালের চেয়েও খারাপ রূপ গ্রহণ করে।...ভারতীর সৈন্য বাহিনীকে অরাজকতা দমনে ডাকা হলে, যা তাদের করা যেতেই পারে, তাহলে তাদের আনুগত্যের উপর আস্থা রাখা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়, কারণ আশংকা হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে অনিষ্টকর প্রচার বোধহয় তাদেরও স্পর্শ করেছে।"[৪৩]

কলকাতায় নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীসহ সমগ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই শহরে ছুটে আসেন। বড়লাট ওয়াভেলও তাঁদের অনুসরণ করেন। বাংলার গভর্নর কেসি'র সঙ্গে গান্ধীর পরপর বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎ--কার ঘটে। সাক্ষাৎকার ঘটে নেহরু, প্যাটেল ও আজাদের সঙ্গেও কেসি'র। গভর্নর ও ভাইসরয়কে তাঁদের পক্ষ থেকে যথাযথ আশ্বাসও দেওয়া হয়। আর জনগণের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয় অহিংসা ও শৃঙ্খলা রক্ষার বাণী। নেহরু ছাত্র ও যুব সমাজকে বোঝাতে চেষ্টা করেন জনগণকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ তাঁদের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া দরকার। আর প্যাটেল বলেন "নিস্ফল বিবাদে" নিজেদের শক্তিক্ষয় করা তাদের উচিত নয়।

নভেম্বর অভ্যুত্থানের শিক্ষা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও গ্রহণ করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের বিচার সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনা তখনই বদলে ফেলা হয়। মাস শেষ হওয়ার আগেই এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সব বন্দীদের বিচারের জন্যে পাঠানো হবে তাদের সংখ্যা "কুড়িজনের বেশি হবে না" এবং যাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগ আছে কেবল তাদেরই বিচার করা হবে।[৪৪] রাজদ্রোহের অভিযোগ বাতিল করে দেওয়া হয়।

কংগ্রেস নেতাদের বাণী উপেক্ষা করে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা আবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এবারেও প্রতিবাদী ছাত্র মিছিল সংগঠিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের আবদুর রশিদের বিরুদ্ধে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়ার জন্যে। এবারে বিক্ষোভের আগুন নভেম্বর মাসের চেয়েও বড় আকার ধারণ করে।

দেশের নিয়মিত প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপরে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিঘাত বৃটিশ রাজের চোখে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ হয়েছিল। বৃটিশ গোয়েন্দা অফিসার টয় লিখেছেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য বাহিনী আর আজাদ হিন্দ সৈন্যদের মধ্যে "ব্যাপক মেলামেশার ফল হয়েছিল" রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসার যা ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে আগে কখনও ছিল না—তারা এদের মনে করে একদল নিপীড়িত বীর। আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী অসামরিক ভারতীয়রা, যারা অতিথিপরায়ণ ও রাজনৈতিকভাবে পূর্ণ সচেতন ছিল, তাদের স্বাধীন ভারতীয় সরকার ও বোসের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে অনেক গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী বলার ছিল। তাদের কথাও ভারতীয় সৈন্য শুনতে থাকে গভীর আগ্রহে।....এইভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী ক্রমেই আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে দেশে সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সংশয়ের অনকাশ খুব কমই আছে যে, ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে গুরুত্বপূর্ণ নৌ-বিদ্রোহ এবং সৈন্যবাহিনীর অন্য দুটি অংশে যে ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয় তার পিছনেও এই প্রভাব কিছুটা কাজ করেছিল। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই নতুন মনোভাবকে স্বীকার না করে পারেন নি; ১৫ মার্চ ১৯৪৬-এ মিঃ অ্যাটলী বলেন, এখন জাতীয়তা-বোধের প্রসার ঘটেছে....এমন কি সেই সব সৈন্যদের মধ্যেও কম নয় যারা যুদ্ধের সময় চমৎকার ও প্রশংসনীয় নানা কাজ করেছে।"[৪৫]

১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ তারিখে বোম্বাইয়ে বৃটিশ ভারতীয় নৌবাহিনীর সৈন্যরা বিদ্রোহ শুরু করেন, তারপর একে একে বিদ্রোহ ছড়ায় করাচি, কলকাতা, মাদ্রাজ ও অন্য জায়গায়। সংগ্রামে কুড়ি হাজারের বেশি নাবিক অংশগ্রহণ করেছিলেন। বোম্বাইয়ে বৃটিশ ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক হাজার জনের বেশি সৈনিকরা নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে ধর্মঘট করেন। কলকাতা, মাদ্রাজ, আম্বালাতেও বিমানবাহিনীর সৈন্যরা ধর্মঘট করেন তাঁদের সমর্থনে। বোম্বাই ও করাচিতে নৌ-বিদ্রোহীদের উপর গুলি চালানোর হুকুম দেওয়া হলে সৈন্যরা হুকুম অমান্য করেন। সশস্ত্র বাহিনীকে সাধারণ মানুষদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি ভেঙে পড়তে থাকে। নৌ-ধর্মঘটীদের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে ২২ ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের শ্রমিক শ্রেণী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উচ্চতম নেতাদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হয়। পথে পথে ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয় এবং দুদিন ধরে জনতা আর সশস্ত্র পুলিশ এবং বৃটিশ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলে। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এস. কে. পাতিল বোম্বাইয়ের গভর্নর জন কোলভিলের সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা জনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজশক্তির সেবায় পুলিশকে সাহায্য করার জন্য 'স্বেচ্ছাসেবক' বাহিনী পাঠিয়ে দেন।[৪৬]

সরকার নৌ-বিদ্রোহ তদন্ত কমিশন গঠন করলে তার রিপোর্টে বলা হয়:—
"Politics and political influence had a very great effect in unsettling men's loyalty and in preparing the ground for the mutiny and in the prolongation and spread of the mutiny after it had started. The glorification of the I.N.A had undoubtedly a most unsettling effect on the morale of the men of the services."[৪৭]

কেবল নাবিকরা নয়, বিমানবাহিনী এবং স্থলবাহিনীর সেনারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ করেন, যদিও সেটা ব্যাপক আকার নেয়নি। পুলিশের মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছিল। যুদ্ধোত্তর গণ-সংগ্রাম ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অংশ শামিল হন। আক্ষেপ করে ওয়াভেল বলেন: "এ এক

দুর্ভাগ্য ও নিবুদ্ধিতার দুঃখজনক কাহিনী। সম্ভবতঃ এগুলিকে দেখার সবচেয়ে ভাল উপায় হল যে মনে করা ভারতবর্ষ নতুন এক ব্যবস্থার জন্ম দিতে চলেছে। এ সেই জন্ম-যন্ত্রণা (India is in the birthpangs of a new order)।"[৪৮]

১৯৪৫-৪৬ সালের সেই শীতকালে, পেন্ডারেল মুনের ভাষায় ভারত 'আগ্নেয়গিরির কিনারায়' এসে দাঁড়িয়েছিল। এই অভ্যুত্থানের কারণ নিঃসন্দেহে ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা ও ক্ষোভ। যুদ্ধের বছরগুলিতে সেটা তীব্রতর হয়ে ওঠে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের যে আগুন সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে তাকে প্রজ্বলিত করতে অনুপস্থিত সুভাষ ও পরাজিত আজাদ হিন্দ ফৌজের একটা বড় ভূমিকা ছিল। তখন কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের কাজ হয় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে নিভিয়ে ফেলতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো।

নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টায় বৃটিশ মন্ত্রিসভা, কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা আপসে আসার জন্যে তিন সদস্যের এক মন্ত্রী-মিশন পাঠান, যাতে ছিলেন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ ও এ. ভি. আলেকজাণ্ডার। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতে পৌঁছে মন্ত্রী মিশন বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের সঙ্গে প্রথম বৈঠক করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে এডোয়ার্ড বেন্থল জানান ঃ

"পরিষদ এ ব্যাপারে একমত যে কেন্দ্রে সরকারের একটা পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে।···ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের আচরণে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দেশের নিরাপত্তা এবং সরকারের প্রতি সমর্থন পাওয়ার জন্য যাদের উপরে ভবিষ্যতে নির্ভর করতে হবে সেই সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের উপর পরিষদ আস্থা রাখতে পারছে না।"[৪৯]

ইংরাজ শাসকরা তখন উপলব্ধি করে যে ভারতীয় জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের উপরে আর নির্ভর করা যাবে না। তাই তাদের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান ঘটিয়ে 'বন্ধুভাবাপন্ন' এবং নির্ভরযোগ্য' ভারতীয়দের হাতে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং রণনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বহু বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের কথার তখন থেকেই এটা ধুয়া হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৫৬ সালে ক্লিমেণ্ট অ্যাটলী কলকাতায় এসে রাজভবনে কয়েকদিন ছিলেন। তখন পশ্চিমবাংলার অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কেন ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত ছেড়ে চলে যান তার কিছু কারণ উল্লেখ করেছিলেন। ভারতে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটানোর সময় যিনি মূল হোতা ছিলেন, সেই প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী বলেন, অনেক কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সুভাষ বোসের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ অভিঘাতে "ইংরাজ সরকারের প্রতি ভারতের স্থল ও নৌ বাহিনীর আনুগত্যের বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে যাওয়া"। গান্ধীর কার্যাবলীর জন্যে ইংরাজদের সিদ্ধান্ত কতটা প্রভাবিত হয়েছিল জিজ্ঞাসা করা হলে অ্যাটলী অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে উত্তর দেন। "minimal"।৫০

আগেই বলা হয়েছে, জনগণের মনোভাবের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের সবিশেষ পরিচয় ছিল বলেই তাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের দেশপ্রেমিক ভূমিকার কথা বারবার সপ্রশংস ভাবে উল্লেখ করতেন। এটা ছিল তাঁদের জনগণের মুখ চেয়ে বলা কথা, লোক দেখানো চেহারা। কিন্তু তাঁদের আসল চেহারা ছিল ভিন্ন। স্মরণ করা দরকার, এইসব নেতারা আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের সামরিক আদালতে বিচার ও শাস্তিদানের জন্যে ইংরেজদের মূল পরিকল্পনাকে 'সানন্দ অনুমোদন' ("gratified opproval") জানিয়েছিলেন। ১৮ অক্টোবর ১৯৪৫, আজাদ হিন্দ ফৌজ ডিফেন্স কমিটির আহ্বায়ক আসফ আলি, এই কমিটি গঠিত হওয়ার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই, জনৈক ক্যাপ্টেন হরি বুধওয়ারের সঙ্গে সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। আসফ আলি তখন বলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে জনগণের "প্রজ্বলিত ভাবাবেগ কংগ্রেস যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে সেটা নিতে বাধ্য করেছে". এবং কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় থাকত তাহলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত লোকজনকে সৈন্যবাহিনী থেকে বরখাস্ত, এমন কি তাদের কয়েক জনকে কোর্ট মার্শাল করতেও কংগ্রেস দ্বিধা করত না।" আসফ আলি আরও বলেন যে, "সরকার (ইংরেজরা) যদি এখন এই বিচার স্থগিত রাখেন, তাহলে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করবে। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কংগ্রেস নেতারা সরকারিভাবে এই ঘোষণা করবে কিনা, তখন তিনি বলেন সেটা করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও মহামান্য প্রধান সেনাপতিকে বিষয়টি জানিয়ে রাখতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই।"৫১ এই সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট নয়াদিল্লীর কর্তৃপক্ষ ও ভারত সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা, যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস

প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব, সেখানকার গভর্নর জি. কানিংহামকে বলেন ঃ "যদি তাদের (আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাদের) রেঙ্গুন কিংবা সিঙ্গাপুরেই গুলি করে মারা হত, তাহলে সবাই খুশি হত।"৫২

নেহরু ওয়াভেলকে বলেছিলেন, "আজাদ হিন্দ ফৌজীদের মাহাত্ম্য কীর্তনে তাঁরা বড় বাড়াবাড়ি করেছিলেন, এখন ঝোঁক অন্যদিকে ঘুরছে।" তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত যে, সৈন্য বাহিনীর মধ্যে রাজনীতি ঢুকতে দেওয়ার "ফল মারাত্মক" হবে এবং সরকারের অধীনে কর্মরত মানুষদের "চলতি সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার" প্রতি আনুগত্য ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া কোনমতে উচিত হবে না। "সরকারের প্রতি যারা একবার বিশ্বস্ততা হারিয়েছে তাদের বদলে যারা অবিচল আনুগত্য দেখিয়েছে, সৈন্যবাহিনীর সেই সব লোকজনদেরই" পুলিশে নিয়োগ করা উচিত হবে; অর্থাৎ নেহরুর কথায় আজাদ হিন্দ ফৌজীরা বিদেশী শাসকদের পক্ষ ত্যাগ করে দেশের প্রতি আনুগত্যশীল হয়েছিল বলেই পুলিশে তাদের নিয়োগ অযোগ্য বিবেচিত হবে।৫৩

১৯৪৬ সালে কংগ্রেস যখন বোম্বাইয়ে সরকার গঠন করে তখন মন্ত্রিসভা প্রাক্তন আজাদ হিন্দ ফৌজীদের পুলিশে পর্যন্ত নিয়োগ নিষিদ্ধ করে দেয়।৫৪ নেহরুর নির্দেশে যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রিসভাও বোম্বাইয়ের সরকারকে অনুসরণ করে।৫৫

একদিকে কংগ্রেস নেতারা প্রাক্তন আজাদ হিন্দ ফৌজী এবং ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে নৌবিদ্রোহে অংশ-গ্রহণকারী সেনানীদের সৈন্যবাহিনী ও পুলিশে কাজ করতে দেননি; অন্যদিকে তাঁরা বৃটিশ গভর্নর-জেনারেল, গভর্নর এবং অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের 'স্বাধীন' ভারতে নিজের নিজের পদে বহাল থাকতে আবেদন করেছিলেন এবং 'স্বাধীন' ভারতের সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যদের বেশি মাইনে দিতে চেয়েছিলেন।৫৬

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কংগ্রেস ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদে যোগ দেয়, যার একটা নাম ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং নেহরু যার সহসভাপতি হন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজী অফিসার ও সৈন্যরা বন্দিদশায় ছিলেন।৫৭ যদিও সেই সময় দেশের সর্বত্র ব্যাপক জনসাধারণ তাঁদের মুক্তির দাবি করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য

সব সদস্যের সমর্থনে তাঁদের অবিলম্বে মুক্তিদানের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, তবুও বৃটিশ প্রধান সেনাপতির মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নেহরুরা তাঁদের মুক্তি দেননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের এক পক্ষ কালেরও কম সময় পূর্বে, ২ অগাস্ট ১৯৪৭, নেহরু বড়লাট মাউণ্টব্যাটনের সঙ্গে একমত হন যে, যে সব আজাদ হিন্দ ফৌজীরা তখনও 'কারাগারে আবদ্ধ' আছেন "প্রধান সেনাপতি তাদের দণ্ডাদেশ এমন ভাবে কমিয়ে দেবেন যাতে তারা সার্বিক বন্দিমুক্তির সুবিধা পেতে পারে" এবং "আজাদ হিন্দ ফৌজীদের মুক্তি যেন কোন মতেই কোন খবর হয়ে বিশেষ প্রচারের সুযোগ না পায়।"[৫৮]

তথ্যসূত্র :

1. S, Gopal et al (eds.), **Selected Works of Jawaharlal Nehru,** Vols I—XV (1st Series), Vols. I—III (Second Series), New Delhi, 1972—1985 (to be cited hereafter as **SWN**) ; Vol. IX, p. 595, fn. 2.
2. N. Mitra (ed.), **Indian Aunual Register,** 1939, Vol I,p. 324.
3. Ibid, p. 335.
4. **SWN**, Vol. XII, p. 261—3
5. N. Mansergh (editor-in-chief), **Constitutional Relations between Britain and India : The Transfer of Power 1942—7,** Vol. I—XII, London, 1971—1983 (cited hereafter as **TOP**), Vol. I, p. 665 ; SWN, Vol. XII, pp. 194—5.
6. **Collected Works of Mahatma Gandhi,** Vols I—XC, New Delhi, 1958—1984 (hereafter cited as **CWG**) ; Vol. XLV, p. 200.
7. Subhas Chandra Bose, **Crossroads,** Calcutta, 2nd edn., 1981, p. 406.
8. "The Stormy Petrel of Indian Revolution", **Visva-Bharati Quarterly** Subhas birth centenary number

(forthcoming); "The Patriot of Patriots", Netaji Subhas Centenary Celebrations Committee (Maharashtra)'s Subhas Centenary Commemoration volume (forthcoming).

9. **Netaji Collected Works**, Vol. VIII (ed. by S.K. Bose and S. Bose), Calcutta, 1994, pp. 165-8.
10. Subhas Chandra Bose, **The Indian Struggle, 1920—1942**, Bombay, 1964, p. 380.
11. J. Stalin, **Problems of Leninism**, Moscow, 1954, pp. 591, 592—emphas is added.
12. Bose, **Crossroads**, pp. 24-5.
13. Hugh Toye, **Subhash Chandra Bose (The Springing Tiger)**, Bombay, 1962, p. 65.
14. Bose, **The Indian Struggle**, pp, 438-9; Leonard Gordon, **Brothers against the** Raj, New Delhi, 1990, pp. 450—1.
15. **Wavell the Viceroy's Journal**, ed. by Penderel Moon, Delhi, 1977, p. 222; **SWN**, Vol. XV, pp. 56-8; H.V. Hodson, **The Great Divide**, London, 1969, pp. 205, 253-4; **Personal Diary of Admiral the Lord Louis Mountbatten, 1943—1946.** ed. by Philip Ziegler, London, 1988, p. 304.
16. **SWN**, Vol. XV, 59-60, 62-3, 77
17. **Selected Speeches of Subhas Chandra** Bose, Go I, Publications Division, Delhi, 1962, pp. 185, 186—7, 207.
18. Ibid, p. 140.
19. Ibid, pp. 144, 145, 154, 180; see also pp. 148, 155-6.
20. Subhas Chandra Bose to Jacob Malik (Soviet Ambassador to Japan), 20.11.44. Professor Purabi Roy, who visited Russia recently as a member of a team on behalf of the Asiatic Society, traced the Russian taanslation of this letter in the Russian Archives.

21. Toye, op cit p. 194.
22. Ibid, pp. 159-60.
23. See **Sarat Chandra Bose Commemoration Volume,** ed. by N.C. Bhattacharyya et al, Calcutta, 1982, p. 57.
24. Toye, op cit p. 178.
25. **SWN**, Vol. XV, pp. 59-60, 62-3.
26. Ibid, p. 72
27. Toye, op cit, pp. 169-71.
28. **Selected Speeches of Subhas Chandra Bose**, pp. 230-1.
29. Ibid, pp. 228—9.
30. Gordon, op cit, pp. 538, 539 ; S.A. Ayer, "Biographical Introduction" to **Selected Speeches of Subhas Chandra Bose**, p. 27.
31. See Suniti Kumar Ghosh, **India and the Raj : Glory, Shame and Bondage**, Vol. II, Bombay, 1995, especially Chaps. 4, 6, 10.
32. Philip Mason, 'Foreword", in Toye, op cit, p, ix.
33. Toye, ibid, p. 188.
34. John Connell, **Auchinleck**, London, 1959, p. 799.
35. Mason. op cit, pp. ix-x—emphasis added ; see also Hodson, op cit, p. 249.
36. R. Palme Dutt, **Freedom for India**, London, 1946, p. 8 ; see also Stephen P. Cohen, **The Indian Army**, Berkeley, 1971, p. 147.
37. Connell, op cit, 803.
38. **SWN**, Vol. XV, p. 92.
39. **TOP**, Vol. VI, pp. 382-3.
40. Ibid, pp. 542-3 ; see also ibid, pp. 507-8. 530-3. 536, 807.
41. Ibid, p. 305.

42. Leonard Mosley, **The Last Days of the British Raj**, Bombay, 1966, p. 152.
43. Home Dept. Poll File 21/16/45—Poll (1); quoted in Amiya Nath Bose, "Bose Brothers and the Indian Struggle", Sarat Bose Academy Annual Publication 1983, Calcutta.
44. **TOP**, Vol. VI, p. 588.
45. Toye, op cit, pp. 186-7.
46. Bombay Governor Colville's report to Wavell, 27 Feb. 1946, **TOP**, Vol. VI, pp. 1079-84.
47. **Hindusthan Standard** (Calcutta), 21 Jan. 1947.
48. **TOP**, Vol. VI, p. 1233.
49. Ibid, Vol. VII, p. 7.
50. R.C. Majumdar, **History of the Freedom Movement in India**, Vol. III, Calcutta, 1977, pp. 609-10.
51. **TOP**, Vol. VI, p. 387.
52. Ibid, p. 546 ; see also **Wavell the Viceroy's Journal**, p. 188.
53. **SWN**, Vol. XV, pp. 96—7 ; see also **ibid**, Second series Vol. I, pp. 353, 357-8, 360, 361.
54. **TOP**, Vol. VIII, p. 229.
55. Ibid, p. 535.
56. See Ghosh, **India and the Raj**, Vol. II, p. 318.
57. SWN, Second series, Vol. I, p. 357 and fra. 2.
58. See ibid p. 357, fns. 3 and 5 ; pp. 358 360-3 ; Second Series, Vol. II, p. 343, fns. 2 and 3 ; pp. 343-4, 347-50, 351-9 ; Second series, Vol. III, p. 31 and frn. 3 ; Hodson, op cit, p. 255.

———

ত্রিশের দশকে স্বাধীনতার সংগ্রাম : সুভাষচন্দ্র ও দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব

গিরিশচন্দ্র মাইতি

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিশের দশক বিশেষ অনুধাবন দাবি করে এই কারণে যে, এই দশকে বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী মতাদর্শগত বিরোধ একটা স্পষ্ট আকার নেয়। এই বিরোধ শুধু সংগ্রামের লক্ষ্য ও রণকৌশল নিয়ে নয়, এর সাথে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নও যুক্ত ছিল। সুভাষচন্দ্র বসু এবং জওহরলাল নেহরুর মতো সুপরিচিত র‍্যাডিক্যাল ও সমাজতন্ত্রবাদী নেতারা ছাড়া বামপন্থী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা, কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা, কমিউনিস্টরা, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীরা এবং স্বামী সহজানন্দের নেতৃত্বাধীন কিষাণ সভার কর্মীরা। দক্ষিণপন্থী শিবিরের প্রধান নেতা ছিলেন গান্ধী। আর তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। নানাভাবে তাঁদের শক্তি যোগাতেন জে. বি. কৃপালনি, আবুল কালাম আজাদ, আবদুল গফফর খান, সরোজিনী নাইডু, যমনালাল বাজাজ, জে. বি. দৌলতরাম প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা। বামপন্থীদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় দক্ষিণপন্থীরা অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন। গান্ধীর সর্বব্যাপী প্রভাব ছাড়াও তাঁদের বড় সুবিধা ছিল তাঁরা বামপন্থীদের মতো বহুধা বিভক্ত ছিলেন না। তাঁরা যেমন নিজেদের সুসংহত শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, বামপন্থীরা তা পারেন নি। তাই ত্রিশ দশকের শেষ প্রান্তে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে বামপন্থীরা প্রাথমিক বিজয়ের পর শেষ পর্যন্ত পরাজয়ই বরণ করেন। ফলে জাতীয় আন্দোলনের ওপর দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের পথে দেশকে পরিচালিত করার বামপন্থী প্রয়াস ব্যর্থ হয়। দক্ষিণপন্থীদের চিরাচরিত আপসপন্থাই বহাল থাকে। যদিও পরের দশকে জনগণ দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের আপসকামী রাজনীতিকে অগ্রাহ্য করে একাধিকবার স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশবিরোধী অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছেন এবং বামপন্থীরা তাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন, ত্রিশের

দশকে বামপন্থীদের ব্যর্থতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। বর্তমান আলোচনা আমরা এই দশকে বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী বিরোধে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা বিচার বিশ্লেষণের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখব।

॥ ১ ॥

ত্রিশের দশকে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে বিরোধ তার সূত্রপাত হয় বিশের দশকের একেবারে প্রথমে যখন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীযুগের শুরু এবং সুভাষচন্দ্রেরও জনজীবনের সূচনা। পুরো বিশের দশক ধরে এই বিরোধ বিকশিত হয়ে ত্রিশের দশকে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়ার পর্যায়ে পৌঁছয়। তাই ত্রিশের দশকের ঘটনাবলীকে সঠিকভাবে বোঝার প্রয়োজনে আমরা প্রথমে তার পটভূমিটা উপস্থাপিত করব।

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামে অহিংসার অপরিহার্যতা বিষয়ে গান্ধীর বিশ্বাস এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণা প্রথম থেকেই নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারেন নি। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে ১৯২১-এর ১৬ই জুলাই ইংল্যাণ্ড থেকে বোম্বাই পৌঁছে ঐ দিনই সুভাষ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। পরে তিনি ঐ সাক্ষাৎকার বিষয়ে লিখেছেন: 'মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ প্রার্থনার আমার উদ্দেশ্য ছিল, যে আন্দোলনে আমি যোগ দিতে যাচ্ছি, তার নেতার কাছ থেকে তাঁর কর্মসূচী সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করা। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিপ্লবী নেতৃবর্গ যে সব পদ্ধতি ও কৌশল কাজে লাগিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমি গত কয়েক বছর কিছু পড়াশুনা করেছিলাম, এবং ঐ জ্ঞানের আলোকেই আমি মহাত্মার মন ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলামাম। ...এক ঘণ্টার আলোচনায় যে জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলাম তার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সেই সময়ে যদিও আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, আমার নিশ্চয়ই বুদ্ধির অভাব আছে, তবু বারে বারেই যুক্তির দ্বারা স্পষ্ট অনুধাবন করেছিলাম, মহাত্মা যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তার মধ্যে স্পষ্টতার শোচনীয় অভাব আছে, এবং যে আন্দোলনের দ্বারা ভারত তার অভীস্ট স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছবে, তার একের পর এক ধাপগুলি সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই'।[১] শুধু সংগ্রামের পদ্ধতি ও কৌশল নয়, সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্যও ছিল গান্ধীর থেকে পৃথক।

সুভাষচন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সময় থেকেই দেখা যাচ্ছে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে। ১৯১৪ সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি বুঝেছেন, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবিভাজ্য এবং এর দ্বারা বৈদেশিক শাসন ও অধীনতামুক্ত পূর্ণ স্বরাজ বোঝায়'।[২] ১৯২৮-এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধী কর্তৃক উত্থাপিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব এনে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন ঃ 'বাঙলার প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, আপনারা অবহিত আছেন যে, এখানে জাতীয় আন্দোলনের উষাকাল থেকে সর্বদাই আমাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে আমরা কখনও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন রূপে ব্যাখ্যা করি নি'।[৩] শুরু থেকেই তিনি জাতীয় আন্দোলনকে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য তাদের সংগঠিত করার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।[৪] জওহরলালের রচনা থেকে অসহযোগ আন্দোলনকালে জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য সম্বন্ধে গান্ধী ও তাঁর অনুবর্তী নেতাদের ধ্যানধারণার পরিচয় আমরা পাই। জওহরলাল লিখেছেন ঃ 'কিন্তু আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখন অবাক হয়ে ভাবি, তখন আমাদের আন্দোলনের কী তত্ত্বের দিক, কী দার্শনিক দিক কিংবা আমাদের নিশ্চিত লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা কেন করি নি। অবশ্য আমরা সবাই মিলে উচ্চকণ্ঠে স্বরাজের কথা বলতাম, কিন্তু প্রত্যেকে নিজের মতো করে তার ব্যাখ্যা করতাম। আন্দোলনের তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিরা একে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী বলে মনে করতেন এবং আমরা জনসভায় তাই বলতাম। আমরা অনেকে ভাবতাম এর ফলে কৃষক ও শ্রমিকদের বোঝা অনেকাংশে লাঘব হবে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ নেতা স্বরাজ বলতে স্বাধীনতা অপেক্ষা অনেক কম কিছু বুঝতেন। গান্ধীজি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে রাখতেন এবং এ বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু সব সময়ই তিনি, অস্পষ্ট হলেও নিশ্চিতভাবে, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর সুখ সুবিধার কথা বলতেন বলে আমরা স্বস্তি বোধ করতাম, অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি ধনীদেরও যথোচিত আশ্বাস দিতেন'।[৫]

লক্ষ্য ও রণকৌশল নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে ধ্যানধারণার পার্থক্য সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনকে সেই সংকট মুহূর্তে ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে মনে করেছিলেন। কারণ, ইতিপূর্বে নিয়মতান্ত্রিকতা অচল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টাও ব্যর্থ। রাজনৈতিক ভারতবর্ষ

তখন আরও সংগ্রামী কর্মপন্থার জন্য উন্মুখ। গান্ধী সেই সময়ের দাবিকেই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে রূপ দিয়েছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্র একে প্রগতিশীল পদক্ষেপ হিসাবে দেখেছিলেন।[৬] বাঙলায় অসহযোগ কর্মসূচীকে সফল করার কাজে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমশ সারা দেশে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল। এমন সময় ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনার পর গান্ধী তা প্রত্যাহার করে নিলেন। ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্রের তখন মনে হয়েছিল, 'জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পেঁছিতে চলেছে ঠিক তখনই পশ্চাদপসরণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় থেকে কম কিছু নয়'।[৭] আন্দোলন প্রত্যাহার করে কংগ্রেস কর্মীদের শুধু গঠনমূলক কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার গান্ধীর কর্মসূচীর প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু ব্রিটিশবিরোধিতাকে আইনসভার মধ্যে প্রবাহিত করে তাকে অচল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন স্বরাজ্য দল গঠন করেন সুভাষচন্দ্র তখন সেই কর্মসূচীকে সফল করার কাজেও সোৎসাহে এগিয়ে আসেন। সীমিত ক্ষেত্রে হলেও জাতীয়তাবাদী কর্মধারা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরি বলে তিনি মনে করেছিলেন। এই পর্যায়ে অসহযোগ ও স্বরাজ্যপন্থী ক্রিয়াকলাপের সাথে সাথে বাঙলার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সে সময় বাঙলার বিপ্লবীরা চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যস্থতায় গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন। তখন থেকেই তাঁরা বিপ্লববাদী সংগঠন ও কর্মসূচী পরিত্যাগ না করেও কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন। কংগ্রেসের জাতীয় নেতাদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকেই ঐ সব বিপ্লবীরা তাঁদের সব থেকে কাছের মানুষ বলে মনে করতেন।[৮] স্বাধীনতা লাভের পক্ষে বিপ্লবীদের ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি অপেক্ষা গণচেতনার উন্মেষ ঘটানো সুভাষচন্দ্র অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে করলেও বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল স্পষ্ট।[৯] ভবিষ্যতে কোনও উপযুক্ত সময়ে সশস্ত্র গণ-সংগ্রামে এঁদের ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে—সুভাষচন্দ্রের এই ধারণাই ছিল তাঁর সঙ্গে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মূল ভিত্তি।[১০] এই সময় কমিউনিস্টদের সঙ্গেও তাঁর সদ্ভাব গড়ে ওঠে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষে গোপনে বিদেশ থেকে আসা অবনী মুখার্জি ও নলিনী গুপ্তের নিরাপদ আশ্রয় ও সর্বপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা তিনি করে দেন।[১১] সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী মতাদর্শের কথা বিবেচনা করে

১৯২২-এ অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগদানের আমন্ত্রণ তাঁকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি বা অন্য আমন্ত্রিতরা কেউই যাতে ঐ কংগ্রেসে যোগ দিতে না পারেন তার পথ ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল।[১২] বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই যোগাযোগের জন্য সরকার অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁকে ১৯২৪-এর অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার করে আড়াই বছরের বেশি বিনা বিচারে আটকে রাখে। সমসাময়িক গোপন সরকারি নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে : তিনি বাঙলায় বিপ্লবী আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক এবং বিদেশের অন্যান্যদের ও বলশেভিক প্রচারকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে ; তিনি বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ষড়যন্ত্রে গভীরভাবে লিপ্ত ; তিনি একজন 'বিশিষ্ট কংগ্রেস কমিউনিস্ট বিক্ষোভকারী' ইত্যাদি।[১৩] বিপ্লবীদের কর্মধারার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্যক পরিচয় থাকলেও এবং গান্ধীপন্থার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে স্বাধীনতার সংগ্রামকে সফল করতে শেষ পর্যন্ত গণআন্দোলনের সাথে সাথে হিংসাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য মনে করলেও এই পর্বে সম্ভবত তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। গণ-আন্দোলনকে আরও প্রসারিত, তীক্ষ্ন ও গতিময় করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর স্বরাজ্যপন্থী কার্যকলাপে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। জাতীয় আন্দোলনে যেটুকু গতিবেগ ছিল তাও স্তব্ধ হয়ে যায়। গান্ধী তাঁর গঠনমূলক কর্মসূচি ও খাদি প্রচারে ব্যস্ত। মান্দালয় জেলে বন্দি সুভাষচন্দ্র তখন জাতীয় সংগ্রামে নতুন প্রাণ সঞ্চারে ব্রতী হন। জেলে বসেই তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন শ্রমিক-কৃষক, যুবক ও ছাত্রদের সংগঠিত করে জাতীয় সংগ্রামে তাদের ব্যাপকভাবে সামিল করবেন।[১৪] ১৯২৭-এ কারামুক্তির পর তিনি সেই মতো কাজও শুরু করে দেন। একই সময় জওহরলালের মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসে। প্রায় দু'বছর ইউরোপে থাকার সময় তিনি ১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রাসেলস-এ ঔপনিবেশিক পীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন এবং সেই উপলক্ষ্যে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিদের বিশেষ করে ইউরোপের মার্কসবাদী ও র‍্যাডিক্যাল চিন্তাভাবনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। তাঁদের প্রভাবে জওহরলালের চিন্তাজগতে একটা আলোড়ন আসে। ঐ বছর নভেম্বর মাসে

সোভিয়েত বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি বিশেষ আমন্ত্রণে স্বল্প কয়েকদিনের জন্য সপরিবারে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। তাঁর নবজাগ্রত বিপ্লবী চেতনা তার ফলে আরও সমৃদ্ধ হয়। ডিসেম্বর মাসে যখন তিনি দেশে ফেরেন তখন তিনি বিপ্লবী ভাবনায় উদ্দীপিত এক নতুন মানুষ। তিনি আর আগের মতো নিবেদিত প্রাণ গান্ধী-শিষ্য নন। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অসুস্থতার জন্য সুভাষচন্দ্র এই অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি, একটা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। গান্ধী মাদ্রাজে উপস্থিত থেকেও অধিবেশনে যোগ দেননি, যদিও প্রকাশ্য অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন। জওহরলাল মাদ্রাজ কংগ্রেসে জাতির লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বাঙলায় এই ধরণের পদক্ষেপ আগেই নেওয়া হয়েছিল। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯২৭-এ সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বাঙলার বিপ্লবীরা তাঁর সঙ্গে মিলে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের ভিত্তিতে ওয়াকার্স লিগ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন এবং তাঁরাই মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপনে জওহরলালকে প্ররোচিত করেন।[১৫] বাঙলার বিপ্লবীরা ছাড়া কমিউনিস্টরা ও অন্যান্য বামপন্থীরা এই উদ্যোগের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন। প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। লক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃত হলেও পূর্ণ স্বাধীনতা কিন্তু কংগ্রেসের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হল না। তাছাড়া প্রস্তাবে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা হিসাবে যা বলা হয়েছিল—প্রতিরক্ষা, অর্থ, অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতির ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং ব্রিটিশ দখলদার সৈন্যবাহিনীর অপসারণ—সে সব বাদ দেওয়া হল গান্ধীর বিশ্বস্ত অনুগামীদের তৎপরতায়।[১৬] স্বাধীনতা প্রস্তাবের সাথে সাথে সাইমন কমিশন বয়কট নিয়ে আলোচনার সময় ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড-এর চ্যালেঞ্জের জবাব হিসাবে ভারতের একটি সর্বসম্মত সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই ধরণের সম্মেলন যে পূর্ণ স্বাধীনতা সুপারিশ করবে না জানাই ছিল। এইভাবে স্বাধীনতার প্রস্তাবকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হল। যা কিছু হল তা গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করেই।[১৭] নিজে অনুপস্থিত থেকেও বিশ্বস্ত অনুগামীদের মাধ্যমে গান্ধী রাশটা ধরে রেখেছিলেন। তবে বামপন্থীদের চাপ পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নি। তাঁদের কয়েকজনকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হল এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র ও সাহেব কুরেশী। সামগ্রিক বিচারে

মাদ্রাজ অধিবেশন বামপন্থার দিকে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

বামপন্থীদের এই প্রভাব বৃদ্ধি গান্ধীর কাছে দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের নিন্দা করে ৫ জানুয়ারি, ১৯২৮-এ তিনি 'ইয়ং ইন্ডিয়া'তে লিখলেন, 'তাড়াহুড়ো করে এই প্রস্তাব রচিত হয়েছে' ও 'চিন্তাভাবনা ছাড়াই পাশ করা হয়েছে' এবং 'কংগ্রেস স্কুল ছাত্রদের বিতর্ক সভায় পরিণত হয়েছে'।[১৮] ৪ জানুয়ারি জওহরলালকে সতর্ক করে দিয়ে লেখেন, 'তুমি বড় দ্রুত চলছ'।[১৯] জওহরলাল এসব সমালোচনার কড়া জবাব দেন। এ নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রে বাদানুবাদ চলে। আদর্শের স্বার্থে গান্ধী জওহরলালকে ত্যাগ করতে চাইলেন।[২০] কিন্তু জওহরলাল নিজের আদর্শকে গান্ধীর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ২৩ জানুয়ারি তিনি গান্ধীকে লেখেন ঃ 'বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজনীতিতে আমি কি আপনার সন্তান নই, যদিও হয়তো পলাতক বা ভ্রান্ত সন্তান?...আপনি হয়তো ভেবেছেন আমি আপনার মতাদর্শের বিরুদ্ধে কোনও অভিযান শুরু করতে যাচ্ছি...আমার তেমন কোনও উদ্দেশ্য নেই এবং আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যদি কোনও কিছু সমালোচনা বা সমর্থন করি তা হবে নিতান্তই তাৎক্ষণিক'।[২১] এরপরও বামপন্থী জওহরলাল মাঝে মাঝে গান্ধীপন্থার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু গান্ধী জানতেন এসব 'নিতান্তই তাৎক্ষণিক'।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং এই সম্মেলন ভারতের সর্বসম্মত সংবিধান প্রণয়নের জন্য মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি হিসাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সুপারিশ করে। সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রমুখ বামপন্থীরা সম্মেলনের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে দেশের মধ্যে সক্রিয় প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে ১৯২৮-এর আগস্ট মাসে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লিগ গঠন করেন। লিগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং সম্পাদক করা হল সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালকে। ঘোষণা করা হল, লিগের লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠন ও সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ। একে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লিগের সঙ্গে যুক্ত করা হল এবং আশু কর্মসূচী হিসাবে শ্রমিক, কৃষক ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষদের সংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব

আরোপ করা হল। বলা হল লিগকে দেশের মধ্যে ও কংগ্রেসের মধ্যে যে সব বামপন্থীরা আছেন তাঁদের সবার সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা হবে এবং কংগ্রেস যাতে লিগের আদর্শ গ্রহণ করে সেই লক্ষ্যে কাজ করা হবে।[২২] ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধী মাদ্রাজ কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশ সহ মতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্ট পুরোপুরি গ্রহণ করার এবং ডিসেম্বর ১৯২৯-এর মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে না নিলে আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সমর্থনে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং জওহরলাল তা সমর্থন করেন। পরে জওহরলাল স্বীকার করেছেন গান্ধীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও তা ছিল 'দ্বিধা সঙ্কুচিত', কারণ 'দেশের যা অবস্থা ছিল গান্ধীজির নেতৃত্ব ছাড়া কোনও আন্দোলন ফলপ্রসূ হত না।'[২৩] ভোটাভুটিতে সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী পরাস্ত হয়। পক্ষে ভোট পড়েছিল ৯৭৩, আর বিপক্ষে ১৩৫০। ৪৮ জন প্রতিনিধি কোনও পক্ষে ভোট দেননি। পরাজয় সত্ত্বেও বামপন্থীদের প্রভাব যে কম নয় বোঝা গেল।

জওহরলাল গান্ধী নেতৃত্বের অপরিহার্যতার কথা বললেও ব্রিটিশ সরকারের কাছে কলকাতা কংগ্রেসের ঘটনাবলী ভিন্ন অর্থ বহন করে এনেছিল। এক গোপন নির্দেশনামায় ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারি ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯-এ সমস্ত স্থানীয় সরকারগুলিকে জানান: 'কলকাতা কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা যদি কোনও কিছু পথ নির্দেশ করে তা হল, ভবিষ্যৎ নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রায় সবটাই যুবকদের বিশেষকরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও বাবু সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর নির্ভর করছে এবং তাঁদের ইচ্ছা ও কার্যকলাপের ওপর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী অনেকটা নির্ভর করবে'।[২৪] প্রকৃতপক্ষে সে সময় দেশের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের এক অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। পুরো ১৯২৮ সাল ও পরের বছর জনগণের অভূপূর্ব সংগ্রামী চেতনার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে মুক্তির পর যুবক ও ছাত্রদের কর্মবাদের ভিত্তিতে এবং শ্রমিক ও কৃষকদের তাঁদের নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে সংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য যুব-ছাত্র সম্মেলনে তাঁর ভাষণে সুভাষচন্দ্র তাঁদের কুসংস্কারমুক্ত বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে আহ্বান জানান এবং জাতীয় মুক্তির জন্য আত্মত্যাগে ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি

সংকল্পবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেন।[২৫] মহিলাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করা, তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা এবং বিপ্লবী মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন মূর্ত প্রেরণা।[২৬] সুভাষচন্দ্রের মতো জওহরলালও যুবক ও ছাত্রদের একইভাবে সংগঠিত করার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তিনিও দেশের নানা স্থানে যুব-ছাত্র সমাবেশে তাঁর ভাষণে তাঁদের সংগ্রামী চেতনায় ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন।[২৭] ফলে যুব-সমাজের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দেয়। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। বহুস্থানে জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে। এই ধরণের এক সংঘর্ষের ফলে লালা লাজপত রাই-এর মৃত্যু হয়। লক্ষ্ণৌতে জওহরলালও প্রহৃত হন। এসব কিছুর পরিণতিতে দেশের সর্বত্র ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তীব্র হয়। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দেয়। জামশেদপুরে টাটা কারখানায়, লিলুয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের কারখানায়, কলকাতার কাছাকাছি পাটকল গুলিতে, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে এবং দেশের অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। কমিউনিস্টরা এইসব ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক মিছিল করে আসেন এবং কংগ্রেস মণ্ডপে সভা করে পূর্ণস্বাধীনতার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব নেন। ১৯২৮-এ বরদোলির কৃষকরা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেন। বিপ্লবীরাও তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন এবং উত্তর ভারতে তাঁদের গোপন কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯২৯-এর জুন মাসে সরকারের কাছে পেশ করা রিপোর্টে গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা বলেন ঃ 'এই দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে প্রায় বিশ বছরের যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি বর্তমানে ভারত সরকার সর্বাপেক্ষা গুরুতর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে।'[২৮] সব মিলিয়ে ১৯২৮ ও ১৯২৯ সাল ছিল আন্দোলন শুরু করার উপযুক্ত সময়। সুভাষচন্দ্র তাই ভেবেছিলেন।[২৯] কিন্তু গান্ধীর ভাবনা ছিল অন্যরকম। তিনি আরও এক বছর অপেক্ষা করতে চাইলেন। ততদিনে অবস্থার অনেক অবনতি ঘটেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, 'কালের গতিকে পিছনে ঠেলে দেওয়া ছিল কলকাতা কংগ্রেসের মোট ফলাফল'।[৩০]

বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ গান্ধী সময়ের ইঙ্গিত ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কংগ্রেসে এবং জাতীয় অন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৭ জানুয়ারি, ১৯২৯-এ কংগ্রেস সভাপতি মতিলালকে তিনি লেখন, 'আমাদের

ভিতরে এবং বাইরে দু'দিক থেকেই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'[৩১] ভিতরের লড়াই হল কংগ্রেসের বামপন্থীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাঁদের দুর্বল করা, আর বাইরের লড়াই হল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। পরবর্তী লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি স্থির করার প্রশ্ন যখন দেখা দিল গান্ধী জওহরলালকে মনোনীত করলেন। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলির মধ্যে দশটি চেয়েছিল গান্ধীকে, পাঁচটি চেয়েছিল বল্লভভাই প্যাটেলকে, তিনটি চেয়েছিল জওহরলালকে। গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের স্বার্থে সবাইকে বোঝালেন, তিনি নিজে সভাপতি হওয়া যা জওহরলালের হওয়াও তাই।[৩২] জরহরলাল নিজে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এভাবে 'পেছনের দরজা' দিয়ে ঢুকতে চাননি। তাতে তিনি 'বিরক্ত ও অপমানিত' বোধ করেছিলেন।[৩৩] তবুও গান্ধীর ইচ্ছাই শিরোধার্য করে নেন এবং ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেন এইভাবে: 'আমি নিজের কাছে খুব স্পষ্ট যে সভাপতি হওয়ায় আমার কার্যকারিতা অনেক দিক থেকে কমে যাবে, কিন্তু নিয়তির ইচ্ছা অন্যরকম এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও আমি মনে করি আমরা কিছুটা নিয়তির হাতে পুতুল'।[৩৪] জওহরলালের এই রাজনৈতিক অভিষেক সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: 'তাঁর (গান্ধীর) পক্ষে এটা ছিল একটা সুবিবেচনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত কিন্তু বামপন্থী কংগ্রেসীদের কাছে তা দুর্ভাগ্যজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ সেই ঘটনার দ্বারা মহাত্মার সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক মিলন ও তার ফলস্বরূপ বামপন্থী কংগ্রেসীদের সঙ্গে বিচ্ছেদের সূচনা দেখা গিয়েছিল। ...বিরোধী বামপন্থী দলকে পরাস্ত করে কংগ্রেসের ওপর আগেকার অবিসম্বাদী আধিপত্য ফিরিয়ে আনতে হলে মহাত্মার পক্ষে প্রয়োজন ছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তাঁর দলে টেনে নেওয়া। তাঁদের সবচেয়ে বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে কেউ যে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করবেন এই প্রস্তাবটা বামপন্থীরা ভাল চোখে দেখেন নি; কারণ স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে, কংগ্রেসে মহাত্মারই প্রাধান্য ঘটবে এবং সভাপতি শুধু সাক্ষীগোপাল থাকবেন।...সভাপতি পদে জওহরলালের নির্বাচনের দ্বারা তাঁর জনজীবনে নতুন একটা অধ্যায়ের উন্মোচন হল। সেই থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মহাত্মার একজন দৃঢ় ও অবিচল সমর্থক'।[৩৫] জওহরলালের জীবনীকার সর্বপল্লী গোপালের বিশ্লেষণও সুভাষচন্দ্রের অনুরূপ: 'জওহরলাল ছিলেন বামপন্থী গোষ্ঠী ও সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সর্বোৎকৃষ্ট ঢাল্।[৩৬] কলকাতা কংগ্রেসের পর থেকেই গান্ধী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

শুরু করে দেন। তিনি নিজে, মতিলাল ও তাঁদের সহযোগীরা এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে শলাপরামর্শ চালিয়ে যান। ৩১ অক্টোবর, ১৯২৯-এ বড়লাট আরউইন ঘোষণা করেন, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আলোচনার জন্য লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হবে। গান্ধী, মতিলাল, জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু ও আরও অনেকে তড়িঘড়ি করে পরের দিনই দিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে একটি ইস্তাহার প্রচার করেন। এর বিরোধিতা করে সুভাষচন্দ্র, সৈফুদ্দিন কিচলু ও আবদুল বারি একত্রে পৃথক ইস্তাহার প্রচার করেন। লাহোর কংগ্রেসের প্রায় পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত গান্ধী চেষ্টা করেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে কিছু নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আদায় করতে। এই উদ্দেশ্যে গান্ধী, মতিলাল ও অন্যরা ২৩ ডিসেম্বর বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে লাহোর কংগ্রেসে গান্ধী নিজে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব পাশ হল। কিন্তু স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছবার কোনও কর্মসূচীর কথা গান্ধী বললেন না। সুভাষচন্দ্র একটি কর্মসূচী পেশ করে সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা, সর্বাত্মক বয়কট, শ্রমিক, কৃষক, অনুন্নত সম্প্রদায় ও যুবকদের সংগঠিত করার কথা বললেন।[৩৭] তা আগ্রাহ্য হল। শুধু তাই নয়, সুভাষচন্দ্র বা অন্য বামপন্থীদের কাউকেই ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান দেওয়া হল না। যুক্তি দেখানো হল সমমতাবলম্বীদের নিয়ে কমিটি হলে কাজের সুবিধা হবে। গোটা ব্যাপারটাতে জওহরলালের কোনও ভূমিকা ছিল না। গান্ধীই ছিলেন সর্বেসর্বা। তবুও ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে লাহোর কংগ্রেসের গুরুত্ব কম নয়। বামপন্থীদের বিভক্ত ও দুর্বল করার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯২৭-এর মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে তা জয়যুক্ত হল।

॥ ২ ॥

ত্রিশের দশক শুরু হল এই আশা নিয়ে যে বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতার সংগ্রাম শীঘ্রই শুরু হবে। কিন্তু গান্ধী সংগ্রামের পরিবর্তে ব্রিটিশের কাছে আপসের প্রস্তাব রাখলেন। স্বাধীনতার প্রস্তাবে ভারতীয় পুঁজিপতিরা ভয় পেয়েছিলেন। তাঁদের আশ্বস্ত করার দরকার ছিল এবং সরকারকেও বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল তিনি প্রকৃতপক্ষে আপসই চান। ৩১ জানুয়ারি, ১৯৩০-এ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'

পত্রিকায় গান্ধী ঘোষণা করলেন মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ, স্টার্লিং-এর সঙ্গে টাকার আনুপাতিক হার হ্রাস, ভূমিরাজস্ব হ্রাস, লবন কর রদ, বিদেশী বস্ত্রের ওপর আমদানী শুল্ক ধার্য, উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইন প্রবর্তন ইত্যাদি এগারটি প্রস্তাব যদি সরকার গ্রহণ করে 'তাহলে তিনি আর আইন অমান্যের কোনও কথাই শুনবেন না।'[৩৮] এই এগার দফা প্রস্তাবকে তিনি বললেন 'স্বাধীনতার মর্ম'। এর মধ্যে স্বাধীনতা তো দূরের কথা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথাও ছিল না। তবুও সরকারের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। অনির্দিষ্টকাল চুপচাপ বসে থাকলে জনসাধারণের কাছে নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না। তাছাড়া লর্ড আরউইনের চাইতে হিংসায় বিশ্বাসীদের তিনি বেশি ভয় পাচ্ছিলেন।[৩৯] অতএব ১২ মার্চ ডাণ্ডী অভিযানের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। তার আগে ২ মার্চ বড়লাটকে লেখা চিঠিতে বললেন, 'যদি আপনার ঘোষনায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কথাটা এর স্বীকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে স্বাধীনতার প্রস্তাবটিতে কোনও ভয়ের কারণ নেই।'[৪০] সংগ্রামের সাথে সাথে আপসের দরজাটিও খোলা রাখা হল। প্রায় এক বছর ধরে আন্দোলন চলার পর লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য ৪ মার্চ, ১৯৩১-এ বড়লাট আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করে তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। সরকারের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসার জন্য ভারতীয় পুঁজিপতিরা গান্ধীর ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। তাঁরা খুশি হলেন। বাধ্য সভাপতি ও ততোধিক বাধ্য ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন পেতেও অসুবিধা হল না। সেই জন্য সমমনস্ক ওয়াকিং কমিটির প্রয়োজন ছিল গান্ধীর। জওহরলাল লিখেছেন গান্ধী চুক্তি করে আসার পর তাঁদের আর করার কিছু ছিল না: 'যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমাদের নেতা কথা দিয়ে এসেছেন। এখন আমরা তাঁর সঙ্গে ভিন্ন মত হয়ে কী করতে পারি'?[৪১] গোল টেবিল বৈঠক থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে গান্ধী ১৯৩২-এ আবার অন্দোলন শুরু করেন এবং ১৯৩৩-এ তা প্রত্যাহার করেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আন্দোলন নামেমাত্র যেটুকু টিকে ছিল তাও ১৯৩৪-এ তিনি পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেন।

গান্ধীর নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পুরো এক দশকের অভিজ্ঞতার ফলে ত্রিশের দশকের গোড়া থেকেই বিশেষকরে ১৯৩১-এ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর থেকে সুভাষচন্দ্র নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে, ঐ নীতি-পদ্ধতির পরিবর্তন না করে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। ২৭ মার্চ, ১৯৩১-এ করাচিতে

সারা ভারত নওজওয়ান ভারত সভার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি স্পষ্ট বলেন ঃ 'কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীর মৌলিক ত্রুটি হল, এ বিষয়ে নেতাদের ধারণা খুব অস্পষ্ট এবং তাঁদের মনে বেশ দ্বিধা রয়েছে। তাঁদের কর্মসূচীর ভিত্তি কোনও মৌলিক পরিবর্তন-সাধনের চিন্তা নয়, কেবল আপস করা—ভূস্বামী ও প্রজা, পুঁজিপতি ও শ্রমজীবি, তথাকথিত উচ্চশ্রেণী এবং তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়, পুরুষ ও নারীর মধ্যে আপস। কংগ্রেসের কর্মপন্থা অনুসরণ করে ভারতে স্বাধীনতা আসবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। যে কর্মপন্থায় তা আসবে বলে আমার বিশ্বাস, তা হল ঃ (১) সমাজতান্ত্রিক কর্মপন্থায় কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন ; (২) যুবশক্তিকে নিয়মশৃঙ্খলায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হিসাবে সংগঠন ; (৩) জাতিভেদ প্রথা বিলোপ এবং সব রকম সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ ; (৪) নতুন কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা কাজে রূপায়ণে ব্রতী হওয়ার জন্য নানা প্রকার নারী সমিতি গঠন ; (৫) ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কটের জন্য তীব্র প্রচার ; (৬) নতুন নীতি, ও কর্মসূচী প্রচারের জন্য নতুনভাবে সাহিত্য সৃষ্টি।' এই ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি চাই ভারতবর্ষে একটি সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র'[৪২] ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যেও দেখি তাঁর একই উপলব্ধির অকপট প্রকাশ। ১৯৩৯-এ বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন ঃ 'বাস্তবিকই সত্যের খাতিরে আমাকে বলতেই হবে যে বর্তমান কর্মপন্ধতির দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির কোনও আশা নেই।' এই চিঠিতে তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি ও সাম্যবাদের ভিত্তিতে নতুন সমাজ গড়ার কথা বলেন।[৪৩] ১৯৩২-এ ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়াম থেকে সুভাষচন্দ্র আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে গান্ধী ও ভবিষ্যৎ আন্দোলন প্রসঙ্গে লেখেন ঃ 'সবচেয়ে বড় দুঃখ আমার হচ্ছে এই যে একটা বিরাট জাতীয় আন্দোলন যেন একজনের পকেটের মধ্যে ঢুকেছে। সত্যেনবাবু! এ আন্দোলন কখনও জয়যুক্ত হতে পারে না। জয়যুক্ত হবে সেইদিন—যেদিন সমগ্র জাতি তার চৈতন্য ফিরে পাবে নিজের মধ্যে। ...ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি প্রচন্ড বিশ্বাসী। তবে আপাততঃ কিছুকাল ধরে অনেক দুঃখ দৈন্য কপালে আছে—আমাদের সকলেরই। মুক্তির আন্দোলন একটা বাস্তব সত্য—an objective reality। একজনের কৃপার উপর এর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এ আন্দোলন নিজের গতিতে এবং বিধাতৃ নির্দিষ্ট নিয়মে চলবেই চলবে। আপনি আমি যোগদান না করলেও আন্দোলন থামবে না। যে সব কারণের দরুণ অন্য দেশে বিপ্লব হয়ে থাকে—সে

সব কারণ ভারতবর্ষে বিদ্যমান—সুতরাং ভারতবর্ষে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় আন্দোলনের দুর্বলতার একটা প্রধান কারণ—একজনের উপর আত্যন্তিক নির্ভর-শীলতা।...আমি এই বৎসরের সাধনার ফলে যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি তার মধ্যে একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, জাতিকে শেখাতে হবে যে মুক্তির আন্দোলন একটা **objective reality**—এর একটা বাস্তব সত্তা আছে—একজনের মনঃকল্পিত বস্তু নয়। ডাক্তার রোগীকে চিকিৎসা করে না—**nature leads herself**—ডাক্তার শুধু আরোগ্যের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। আমরা বিপ্লব করি না। ...আমরা যারা কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে থাকি, আমরা শুধু অনুকূল অবস্থা বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করি যাতে বিপ্লবের স্রোত বাধাহীনভাবে অবিরাম গতিতে ছুটতে পারে।' এই চিঠিতে তিনি সমকালীন রাজনীতিকে খোলনলচে বদলে ফেলে একেবারে নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে লেখেন: 'সর্বোপরি এই দৃঢ় সংকল্প করেছি যে সাম্যবাদের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নতুন করে কাজ আরম্ভ করব। যদি একজন সহকর্মীও গোড়ায় আমি না পাই, তাতে পশ্চাৎপদ বা ভীত হব না। সত্যের জয় হবেই হবে—আর আমি যখন অর্থ বা যশঃ চাই না—তখন আমার ভাবনার কোনও হেতু নেই।'[৪৪] একই দৃঢ় প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেন গান্ধীর দ্বিতীয়বার আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর ১৯৩৩-এর মে মাসে ভিয়েনা থেকে প্রচারিত বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে যৌথ ইস্তাহারে: 'আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত—রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজি ব্যর্থ হয়েছেন। সতরাং নতুন পন্থায় কংগ্রেসের আমূল সংস্কারের সময় এসেছে। এই পুনর্গঠনে প্রয়োজন নেতৃত্বের পরিবর্তন।...সর্বোত্তম পথ হচ্ছে আজ সমগ্র কংগ্রেসের রূপান্তর, যদি তা সম্ভব না হয় তবে সংস্কারকামী সমস্ত উপাদানগুলি সংঘবদ্ধ করে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নতুন দল গঠন করা। অসহযোগ বর্জন করা চলবে না, বরং অসহযোগের রূপ পরিবর্তন করে তাকে আরও আক্রমণাত্মক করতে হবে ও সমস্ত রণক্ষেত্রেই স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে হবে।'[৪৫]

এই পর্বে সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তি সংগ্রামে তাঁর মতাদর্শ ও কর্মসূচী বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন ১৯৩৩-এর ১০ জুন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে। ব্রিটিশ সরকারের বাধা থাকায় সম্মেলনে অনুপস্থিত সুভাষচন্দ্রের ভাষণ পাঠ করেছিলেন সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা তৎকালীন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য

ভারতীয় বংশোদ্ভূত শাপুরজি সাকলাতওয়ালা। সুভাষচন্দ্র এই ভাষণে বলেন, 'যতদিন না আমরা পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারি ততদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রাম অনির্বান রাখতে হবে; স্বাধীনতার পথে আপসের কোনও প্রশ্ন নেই'। তিনি স্পষ্ট বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুক্তিকামী ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও আপস সম্ভব নয়। এই আপস কেন সম্ভব নয় তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন: 'রাজনৈতিক আপস বা বোঝাপড়া তখনই সম্ভব যখন সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ বিদ্যমান। ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও বিষয়ে স্বার্থের মিল নেই যাতে উভয় দেশের মধ্যে আপস সম্ভব বা বাঞ্ছনীয়।' এই ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে বলেন: 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে আজ ব্রিটিশ সরকারের অবস্থা যেন একটি সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত দুর্গের মতো যার চারপাশের সমস্ত অঞ্চল হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তখন, দুর্গ যতই সুরক্ষিত হোক না কেন তার নিরাপত্তার জন্য আশেপাশে এবং চারিদিকে অন্তত কিছু বন্ধুভাবাপন্ন নাগরিক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তারা যদি শত্রু ভাবাপন্নও হয় তবু যতক্ষণ এর চারধারের লোক-জন দুর্গ অবরোধে সক্রিয় উদ্যোগ না করে ততক্ষণ পযন্ত ভয়ের কিছু নেই। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ অধিকৃত এই দুর্গ অধিকার করা। এই উদ্দেশ্যে দুর্গের চারদিক ও আশেপাশের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন কংগ্রেস লাভ করেছে। ভারতবর্ষের দিক থেকে এই হচ্ছে সংগ্রামের প্রথম পর্যায়। এখন সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে নীচের যে কোনও একটি পথ অবলম্বন করতে হবে: (১) দুর্গের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধ। এতে দুর্গের সৈন্যদল অনশনের ফলে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পন করবে। (২) বলপূর্বক দুর্গ অধিকার করার আয়োজন।' কংগ্রেসের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বলেন: 'আইনের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক বছর যে সকল শান্তিপূর্ণ সভা, শোভা-যাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে একটা আইন অমান্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে এবং সরকারের কিছুটা বিরক্তিও উৎপাদন করেছে—কিন্তু এগুলি সরকারের অস্তিত্ব ভয়াবহভাবে বিঘ্নিত করে তোলে নি। ...সরকার বুক ফুলিয়ে বলতে পারে যে, ভারতের জনগণের নিষ্ক্রিয় বিরোধিতায় তাদের কিছুই যায় আসে না। অস্ত্রের দ্বারা অথবা অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা যতক্ষণ না জনগন সরকারকে অতিষ্ঠ করতে সক্ষম হচ্ছে ততক্ষণ আমরা যতই অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন করি না কেন, বর্তমান সরকার অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতে

থাকবে। গত দশকে ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব জনজাগরণ দেখা দিয়েছে।…ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতি ভারতবর্ষের শুভেচ্ছার আর কোনও প্রশ্ন নেই। ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক ভিত্তি ধসে পড়েছে; এর অস্তিত্ব এখন কেবল তরবারির উপর নির্ভরশীল।' লণ্ডনের প্রকাশ্য সভায় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সশস্ত্র পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের কথা ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। তা বিপ্লবী কর্মপদ্ধতিও নয়। তাই তিনি সে প্রশ্ন বাতিল করে দেন এই যুক্তিতে যে, 'কংগ্রেস অহিংসায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' দীর্ঘ এই ভাষণে তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যৎ সংগ্রামের প্রয়োজনে উপযুক্ত নেতা সৃষ্টি করতে হবে এবং একটি সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় দল গঠন করতে হবে যার নাম তিনি দেন 'সাম্যবাদী সংঘ'। তিনি ভারতীয় সগ্রামকে দুটি পর্বে ভাগ করেন। প্রথম পর্বে সংগ্রাম হবে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম যার নেতৃত্ব দেবে জনগণের রাজনৈতিক দল। ভারতের শ্রমিক ও সংগ্রামরত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবে এই দল। সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্বে সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধা, পার্থক্য ও কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটবে।[৪৬]

পরে ১৯৩৪-এ লেখা 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র তাঁর সাম্যবাদকে কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে একটি সমন্বয় হিসাবে তুলে ধরেন।[৪৭] এর ফলে বামপন্থী রাজনৈতিক মহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ওঠে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৮-এর জানুয়ারি মাসে লণ্ডনে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রজনী পাম দত্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর আগের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেন: 'আমি সত্যি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, ভারতে আমরা চাই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং তা লাভ করার পর সমাজতন্ত্রের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সমন্বয়ের উল্লেখ করে এই কথাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম'।[৪৮] পরবর্তীকালে ১৯৪৪-এর নভেম্বর মাসে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ভাষণে সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদ বা জাতীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়ের পুনরাবৃত্তি করেন এবং তা ব্যাখ্যা করেন একই ভাবে: 'ভারতবর্ষে আমরা চাই একটি প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা যা সমগ্র জনগণের সামাজিক প্রয়োজন পূর্ণ করবে এবং তা জাতীয় ভাবাবেগকে ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, তা হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয়।'[৪৯]

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের পর থেকে কংগ্রেসের মধ্যে এবং সামগ্রিক-

ভাবে দেশের মধ্যে গান্ধীর নীতি ও কার্যক্রমের প্রতি বিরোধিতা ক্রমশ বাড়ছিল। নরেন্দ্রদেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রামমোহন লোহিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের মধ্যেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা তারই প্রকাশ। ১৯৩২ থেকে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৫-এর মার্চ মাসে ভিয়েনা থেকে এক বিবৃতিতে এই দলের উদ্ভবকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানান।[৫০] শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র সব শ্রেণীর মধ্যে একটা নতুন জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত সাংগঠনিক রূপ নেয়। এই প্রথম নিখিল ভারত কিষাণ সভা নামে কেন্দ্রীভূত একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেও বাম ও দক্ষিণপন্থী উভয় গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রগতিশীল লেখকরাও সংগঠিত হন। বামপন্থীদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য জওহরলালের ওপর গান্ধী অনেকটা নির্ভর করতেন। তিনিও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রমের কঠোর সমালোচনা করে ১৩ আগস্ট, ১৯৩৪-এ তিনি গান্ধীকে চিঠি লেখেন। তাঁকে নানা আশ্বাস দিয়ে গান্ধী চিঠির জবাব দেন।[৫১] কিন্তু গান্ধী বুঝেছিলেন তাঁকে নতুন কৌশল নিতে হবে। সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪-এ তিনি প্যাটেলকে (তখন কংগ্রেস সভাপতি) লেখেন, অনেক চিন্তাভাবনার পর তিনি স্থির করেছেন কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ত্যাগ করবেন, কারণ তিনি থাকলে ভালর চেয়ে মন্দই বেশি হবে। এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে তিনি আরও লেখেন, 'আমার প্রতি জওহরলালের ভালবাসা আমাকে কংগ্রেসে রাখতে চায়, কিন্তু তার যুক্তি কংগ্রেস ত্যাগ করাই সমর্থন করে। যেহেতু বিশাল সংগঠন ভালবাসা দিয়ে চলতে পারে না, ঠান্ডা যুক্তি দিয়েই চলে, তাই যুক্তির পথরোধ না করে সরে যাওয়াই ভাল।...আমার এবং অনেক কংগ্রেস কর্মীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির গুরুতর পার্থক্য বাড়ছে। আমার উপস্থিতি বুদ্ধিজীবীদের কংগ্রেস থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। · সমাজতন্ত্রীদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাচ্ছে। জওহরলাল তাদের অবিসংবাদী নেতা।...গুরুতর মতপার্থক্য সত্ত্বেও কংগ্রেসের ওপর কর্তৃত্ব করা এক প্রকার হিংসা যা থেকে আমাকে বিরত হতেই হবে।... চিন্তায়, কথায় ও কাজে যারা আমার প্রতি সর্বান্তকরণে অনুগত তাদের সরে আসার দরকার নেই। যতদিন কংগ্রেসের প্রয়োজন ততদিন তারা কংগ্রেসে থাকবে এবং যে সব সার্বজনীন আদর্শ তারা আত্মীকরণ করেছে তা কার্যকর করবে'।[৫২] সেইমতো তিনি অক্টোবর, ১৯৩৪-এ কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে সংগঠনের সঙ্গে

আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং ঘোষণা করেন এরপর থেকে তিনি কংগ্রেস সংগঠনের ওপর দূর থেকে নজর রাখবেন। এর ফলে প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেসের ওপর তাঁর কর্তৃত্বের কোনও তারতম্য ঘটেনি। তাঁর সমালোচক ও বিরোধীদের নতুন পদ্ধতিতে মোকাবিলা করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য।

একদিকে বামপন্থী শক্তিগুলি চাইছিল সংগ্রামী কর্মপন্থা অনুসরণ করতে আর অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীরা চাইছিলেন ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে নিয়মতান্ত্রিক পথে চলতে। এই পরিস্থিতিতে গান্ধী ১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে জওহরলালকে সভাপতি করতে চাইলেন। লাহোর কংগ্রেসে যে প্রয়োজন ছিল লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেও সেই একই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। জওহরলাল সম্মত হওয়ায় গান্ধী খুশি হয়ে তাঁকে লেখেনঃ 'লাহোরে তুমি সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলে, কিন্তু লক্ষ্ণৌতে সভাপতিত্বের সঙ্গে তার কোনও তুলনা হয় না। আমার বিবেচনায় লাহোরে কোনও ব্যাপারেই তেমন কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয় নি। লক্ষ্ণৌতে কিন্তু কোনও ব্যাপারে তা হবে না। কিন্তু অবস্থা যাই হোক, তার সঙ্গে এঁটে ওঠার ক্ষমতা তোমার চাইতে কারও বেশি আছে বলে আমি মনে করি না'।[৫৩] জওহরলাল সভাপতি মনোনীত হওয়ায় বামপন্থীরা খুবই আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন ইউরোপে। দীর্ঘকাল তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের কোনও সুযোগ পান নি। ১৯৩২-এ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯৩৩-এ তাঁকে জেল থেকে সোজা ইউরোপে যেতে হয় চিকিৎসার জন্য। তা ছিল কার্যত নির্বাসন। ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে জওহরলাল ইউরোপে গেলে সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। দুজনে আলোচনা করে স্থির করেন তাঁরা একসঙ্গে কাজ করবেন। সুভাষচন্দ্র আশা করেছিলেন, জওহরলাল সভাপতি হিসাবে কংগ্রেসকে প্রগতিশীল পথে পরিচালিত করবেন। এই সময় এক চিঠিতে তাঁকে লেখেনঃ 'আমাদের সর্বশেষ আলোচনায় তোমাকে জানিয়েছি তোমার আশু কর্তব্য হবে দুটি—(১) দপ্তর গ্রহণকে সর্বতোভাবে বাধা দিতে হবে এবং (২) ওয়ার্কিং কমিটির সংগঠনকে প্রশস্ত ও উদার করে তুলতে হবে।'[৫৪] লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেশে ফেরেন ১৯৩৬-এর ৮ এপ্রিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জওহরলালের সব বামপন্থী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দক্ষিণপন্থীদের বিজয় ঘোষিত হল লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে। শিল্পপতি ঘনশ্যামদাস বিড়লার একটি চিঠি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০ এপ্রিল,

১৯৩৬-এ বিড়লা আর এক শিল্পপতি পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে লেখেন : 'মহাত্মাজি তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন এবং একটিও কথা না বলে তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে নতুন কোনও অঙ্গীকার করা না হয়। এক দিক থেকে জওহরলালজির বক্তৃতা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, কারণ যে সব প্রস্তাব পাশ হয়েছে তা সবই তাঁর বক্তৃতার মূল নীতির বিরুদ্ধে।...তিনি পদত্যাগ করে একটা ভাঙন আনতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি। জওহরলালজি ঠিক ইংরেজ গণতন্ত্রবাদীর মতন, যিনি পরাজয়কে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর মতাদর্শ তুলে ধরতে উদগ্রীব, কিন্তু উপলব্ধী করতে পারেন যে সেই অনুযায়ী কাজ সম্ভব নয় এবং সেজন্য চাপও দেন না'।[৫৫] জওহরলালকে পরের বছরের জন্য আবার সভাপতি করা হল এবং তাঁর সভাপতিত্বকালেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল।

গান্ধী মনে করতেন স্বাধীনতা আসবে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো বোঝাপড়ার মাধ্যমে।[৫৬] তাই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ তাঁর রণকৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। 'কংগ্রেস মন্ত্রিসভা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন, এইভাবে দু'পক্ষ—কংগ্রেস মন্ত্রীরা ও ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা—নিজের নিজের ইতিহাস, শিক্ষাদীক্ষা ও লক্ষ্যের কথা মনে রেখে একে অপরকে রূপান্তরিত করবে। যদি ইংরেজরা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারে তাহলে এক বিন্দুও রক্ত না ঝরিয়ে স্বাধীনতা এসে যাবে।[৫৭] এ ব্যাপারে ইংরেজ দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল গান্ধীর মতোই। বড়লাট হিসাবে কার্যভার নেওয়ার আগে লিনলিথগো ২ জুলাই, ১৯৩৫-এ লণ্ডনে বিড়লাকে বলেছিলেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও বন্ধুত্বের পথ অথবা দীর্ঘকালীন গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথ যা বিপর্যয়করও হতে পারে—এই দুটির মধ্যে যে কোনও একটি গান্ধীকে বেছে নিতে হবে। বিড়লা জবাবে বলেছিলেন তাঁর মতো গান্ধীও দ্বিতীয় পথটি নিতে চান। প্রমাণ হিসাবে আগাথা হ্যারিসনকে লেখা গান্ধীর একটি চিঠিও তিনি দেখান।[৫৮] কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পরে ১৯৩৭-এর ২২ জুলাই চার্চিল লণ্ডনে বিড়লাকে বলেন, যে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে তা যদি ভারতীয়রা সফল করে তুলতে পারে তাহলে তারা আপনাআপনি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।[৫৯]

পর পর দু'বছর জওহরলাল সভাপতি থাকার পর গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী ১৯৩৮-এ কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের জন্য সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করা হল। জওহরলালকে লেখা গান্ধীর ১ অক্টোবর, ১৯৩৭-এর চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে

পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে পট্টভি সীতারামায়াই তাঁর পছন্দ।[৬০] কিন্তু পরে তিনি মত পরিবর্তন করেন। ১৯৩৭-এর অক্টোবর মাসের শেষ দিকে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে মহীশূর রাজ্যে দমন পীড়নের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সব রাজবন্দীদের মুক্তি না দেওয়ায় কয়েকজন বামপন্থী সদস্য মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী রাজাগোপালচারীর কঠোর সমালোচনা করেন। বিশেষ করে মহীশূর সংক্রান্ত প্রস্তাবের জন্য গান্ধী সভাপতি জওহরলালের ওপর ক্রুদ্ধ হন। তাঁর রক্তচাপ ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে যায়।[৬১] ১৩ নভেম্বর 'হরিজন' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে গান্ধী এই বিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সমালোচনা করেন।[৬২] তারপর কিছুদিন জওহরলাল ও গান্ধীর পক্ষে তাঁর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাইর মধ্যে এই বিষয় নিয়ে চিঠিপত্রে বাদানুবাদ চলে।[৬৩] গান্ধী জওহরলালের ওপর এতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি ১ নভেম্বর, ১৯৩৭-এ প্যাটেলকে গুজরাটি ভাষায় একটি নোটে লেখেন ঃ 'আমি সিদ্ধান্তে এসেছি যে সব থেকে ভাল হয় তোমরা সবাই যদি পদত্যাগ কর। যদি অন্যরা নাও করে তোমার করা উচিত।...আমি লক্ষ্য করেছি যে সুভাষ মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। যাইহোক সে ছাড়া আর কেউ নেই যে সভাপতি হতে পারে।...পদত্যাগের কারণ স্পষ্ট। মহীশূর সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং ক্রমবর্ধমান মতপার্থক্য।...তোমার স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া উচিত এই রকম মত পার্থক্য নিয়ে তুমি কমিটিতে থাকতে পার না। নিজে গোটা ব্যাপারটা মন দিয়ে চিন্তা কর। কারোর উপদেশ এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবে না,... আমার পরামর্শ, তোমাদের সবার পদত্যাগ করা উচিত।...এত অসত্য যখন প্রবেশ করেছে তোমাদের থেকে কী লাভ?'[৬৪] এই নোট থেকে মনে হয় সুভাষচন্দ্রের মনোনয়নের পেছনে জওহরলালকে শিক্ষা দেওয়া গান্ধীর একটি উদ্দেশ্য ছিল। সুভাষচন্দ্রকে তিনি প্রথম থেকেই ভালভাবে জানতেন। ১৯৩১-এ আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করার সময় কথাবার্তায় গান্ধী স্বীকার করেন সুভাষ তাঁর 'প্রতিপক্ষ'।[৬৫] তবুও তিনি সুভাষকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিলেন, ক্ষমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তাঁকে পোষ মানানো যায় কিনা। জওহরলালের সভাপতিত্বকালে ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশটি কার্যকর করা হয়েছে। গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক শর্তে এই আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি কার্যকর করতে চাইছিলেন। তা যদি সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি রেখে করা যায় তাহলে আর তেমন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। হয়তো সুভাষচন্দ্রকে

তুলে ধরে গান্ধী সরকারের সঙ্গে দরকষাকষিতে নিজের শক্তি বাড়াতে চেয়েছিলেন।' গান্ধীর দিক থেকে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি করে তিনি যে একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন তা তো নিজের কথাতেই স্পষ্ট।

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ নানা দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম নয়, সর্বক্ষেত্রে তিনি যে জাতিকে যথার্থ প্রগতিশীল পথে পরিচালিত করতে চান তা তাঁর ভাষণে পরিস্ফুট। দীর্ঘ এই ভাষণে তিনি বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও অসঙ্গতি এবং বাইরে থেকে চারদিকের চাপে ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। লেনিনের উক্তি—'কয়েকটি জাতির দাসত্ব গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করছে'—উদ্ধৃত করে বলেন, ভারতের সংগ্রাম ব্রিটিশ জনগণের মুক্তির জন্যও সংগ্রাম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভেদ ও শাসন নীতি সম্বন্ধে বলেন, যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যাত হলেও 'আমার কিন্তু সন্দেহ নেই, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ কূটবুদ্ধি ভারত বিভাগ করতে এবং এই উপায়ে ভারতবাসীর কাছে হস্তান্তরিত ক্ষমতা অকার্যকর করতে শাসনতান্ত্রিক অন্য কোনও কৌশল আবিষ্কার করবেই।' পরবর্তী ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে অবাক হতে হয় কী অসামান্য দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে বলেন, 'অর্থনীতিতে বা রাজনীতিতে আমাদের যা সাধারণ স্বার্থ কেবলমাত্র তার ওপর জোর দিয়েই আমরা সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধকে এড়িয়ে যেতে পারি।' ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রশ্নে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'এই প্রশ্নে কংগ্রেসের নীতি "বাঁচো ও বাঁচতে দাও"—বিবেক, ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি, সেই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষাগুলের জন্য সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের নীতি।' তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীগুলি যে সব সামাজিক ও ধর্মীয় শৃঙ্খলে পঙ্গু সেই সব শৃঙ্খল মোচন করতে কংগ্রেসের পূর্ব প্রচেষ্টার উল্লেখ করে বলেন, 'সেদিন সুদূর নয় যখন এই সব শৃঙ্খল অতীতের ঘটনা বলে পরিগণিত হবে।' আগামী জাতীয় সংগ্রামের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন, 'সত্যাগ্রহ আমি যতটা বুঝি কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, তা সক্রিয় প্রতিরোধও, যদিও সেই সক্রিয়তাকে অবশ্যই অহিংস হতে হবে।' তিনি অহিংস সত্যাগ্রহকে বুলেটের মতো আক্রমনাত্মক করতে চেয়েছিলেন। প্রস্তাবিত যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিকগুলি বিশ্লেষণ করে বলেন, এই ব্যবস্থা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার 'তীব্র বিরোধিতায় আমদের আর একটি বিরাট আইন অমান্য আন্দোলনে নামতে হতে পারে, এমন সম্ভাবনা

যথেষ্ট আছে।' ভবিষ্যৎ সামাজিক পুনর্গঠনে কোন নীতি অনুসৃত হবে সে প্রসঙ্গে বলেন, 'দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূর করা সম্পর্কে, সেই সঙ্গে বিজ্ঞান-সম্মত উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে আমাদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিকে সমাজ-তান্ত্রিক উপায়েই যে কার্যতঃ সমাধান করা যেতে পারে এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।' এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে পুনর্গঠনের ব্যাপক এক পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা' এবং 'পরিকল্পনা কমিশনের উপদেশ অনুযায়ী উৎপাদন ও উপযোজনের ক্ষেত্রে সমগ্র কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে সমাজীকরণের জন্য সর্বাত্মক এক কর্মসূচী রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে।' স্বাধীনতার পর কংগ্রেস দলের প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণ করার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। এই সঙ্গে তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বজায় রাখা ও কংগ্রেস দলের গণতান্ত্রিক ভিত্তি সুনিশ্চিত করার কথা বলেন যা নাৎসি দলের 'একনায়ক নীতির' ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। ভারতের ভবিষ্যৎ সরকারি কাঠামোর কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে দেশকে একতাবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশগুলি, সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে সেজন্য সাংস্কৃতিক ও সরকারি ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে।' কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের বামপন্থীদের সংহত করার জন্য এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশকে সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করার স্বার্থে কংগ্রেসের মধ্যে 'সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সমাজতন্ত্রের জন্য কৃতসঙ্কল্প' কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মতো পার্টির প্রয়োজনীয়তাকে তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভার মতো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে যুক্ত করার প্রশ্নে মতভেদের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'যাই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে যুক্ত করার প্রশ্ন বাদ দিলেও জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা উচিত এবং এই লক্ষ্য সফল হবে যদি শেষোক্ত সংগঠনগুলি প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করে।' বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তিনি পরামর্শ দেন, 'কোনও দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি দ্বারা বা তার রাষ্ট্রের কী রূপ তার দ্বারা আমরা যেন প্রভাবিত না হই' এবং এ বিষয়ে সোভিয়েত কূটনীতির কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত মনে করে বলেন, 'সোভিয়েত রাশিয়া যদিও কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, অসমাজতান্ত্রিক

রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে তার কূটনীতিবিদরা দ্বিধা করেন নি এবং সহানুভূতি বা সমর্থন যেখান থেকেই আসুক না কেন ফিরিয়ে দেন নি।' অনেকদিন থেকেই তিনি এসব কথা বলে আসছিলেন। বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'আমার বিশ্বাস আগামী কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতে আমাদের সংগ্রামকে সহায়তা করবে।'

ভাষণের শেষদিকে তিনি সবার প্রতি আবেদন জানান: 'কংগ্রেস আজ গণ সংগ্রামের মোক্ষম হাতিয়ার। এতে দক্ষিণপন্থী ব্লক, বামপন্থী ব্লক থাকতে পারে—তা সত্ত্বেও ভারতের মুক্তি প্রয়াসী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যত সংগঠন আছে তাদের সবার সাধারণ মঞ্চ কংগ্রেসই থাকবে। অতএব আসুন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে সারা দেশকে সমবেত করি।' এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মনোভাবে তাঁর উৎসাহ ব্যক্ত করে দেশের বামপন্থী দলগুলির কাছে বিশেষ আবেদন জানান, 'কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে এবং ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভিত্তিতে পুনঃসংগঠিত করতে তাঁরা যেন যথাশক্তি ও যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করেন।' ভাষণ শেষ করেন এই বলে: 'আমাদের যে সংগ্রাম তা কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই নয়, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও, যার প্রধান স্তম্ভ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। আমরা তাই একমাত্র ভারতের জন্য সংগ্রাম করছি না, বিশ্বমানবতার জন্যও আমাদের সংগ্রাম।'[৬৬] সঙ্গত কারণে বামপন্থী শক্তিগুলির কাছে এই ভাষণ খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. জোশী উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, এমনটি আর আগে কখনও হয় নি ('the best ever')।[৬৭]

সভাপতি হয়ে সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই তাঁর চিন্তাভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে উদ্যোগী হন। পরিকল্পিত উন্নয়নের রূপরেখা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক আলোচনার জন্য তিনি মে মাসে কংগ্রেস প্রধান মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। জওহরলাল সহ ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যও তাতে অংশ নেন। এ বিষয়ে আরও বৈঠকের পর ডিসেম্বর মাসে তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তাঁর অনুরোধে জওহরলাল এই কমিটির সভাপতি হন। সুভাষচন্দ্রের এই কাজ গান্ধী পছন্দ করেন নি। তাঁর সঙ্গে মত পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে গান্ধী তাঁকে পরে লেখেন:

'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কী উপায়ে আমরা মিলিত হতে পারি ? ঐ ক্ষেত্রে মত পার্থক্য আমাদের মেনে নেওয়া উচিত এবং আমরা সামাজিক, নৈতিক ও পৌরক্ষেত্রে মিলিত হতে পারি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র আমি যোগ করতে পারলাম না, কারণ সে ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে যে মতভেদ আছে তা আমরা আবিষ্কার করেছি।'[৬৮] সুভাষচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল জাপানের দ্বারা আক্রান্ত চীনের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জানিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেখানে একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠানো। হরিপুরা কংগ্রেসে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব নেওয়া হয়। সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র তা নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়িত করেন। চীন-জাপানের এই সংঘর্ষে তাঁর সহানুভূতি চিরদিনই চীনের প্রতি ছিল। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় অক্টোবর, ১৯৩৭-এ প্রকাশিত 'দূর প্রাচ্যে জাপানের ভূমিকা' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে তিনি জাপানের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার নিন্দা করে এবং চীনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে লেখেন : 'আজ চীনের এই চরম পরীক্ষার দিনে আমাদের অন্তরের সব সমর্থন চীনেরই দিকে, তার নিজের জন্য আর মানবতার জন্যও চীনকে এখন বেঁচে থাকতে হবে। এই সংঘর্ষের চিতাভস্ম থেকেই সে আবার ফিনিক্সের মতো জেগে উঠবে অতীতের আরও অনেক বারের মতো।'[৬৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে কর্মব্যস্ত অবস্থায়ও তিনি এই সংঘর্ষ অবসানের সতর্ক প্রয়াস চালিয়েছিলেন।[৭০]

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের বিরোধ সবচেয়ে বড় করে দেখা দেয় জাতীয় আন্দোলন শুরু করার প্রশ্ন নিয়ে। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন কংগ্রেসকে আপসের পথ থেকে সরিয়ে এনে সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে। কংগ্রেস সভাপতির কার্যভার গ্রহণের আগেই তিনি প্রকাশ্য বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, প্রস্তাবিত যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রতিরোধে তিনি সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেবেন, প্রয়োজনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনেরও আশ্রয় নেবেন।[৭১] তাঁর সভাপতির ভাষণেও এই বিরোধিতার কথা বলেন। কংগ্রেসও আপসহীন বিরোধিতার প্রস্তাব নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও গান্ধী ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীরা তা শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে গোপন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এ এ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র ৯ জুলাই, ১৯৩৮-এ এই প্রচেষ্টার প্রবল বিরোধিতা করে বিবৃতিতে বলেন, এই সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে 'তা ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে।' এই বিবৃতির সমালোচনার জবাবে আবার ১৫ জুলাই তিনি একই

রকম বিবৃতি প্রচার করে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার কথা বলেন।[৭২] সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক চুক্তির পর তাঁর দৃঢ় ধারণা হয় ইউরোপে যুদ্ধ আসন্ন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগ্রাম যাতে শুরু করা যায় সেই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরম পত্রের আকারে ভারতের দাবি পেশ করার কথা বলেন। সারা দেশে তিনি এ নিয়ে প্রচারও শুরু করেন এবং তা দেশের মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গান্ধী তখন সংগ্রাম অপেক্ষা বোঝাপড়ায় বেশি আগ্রহী। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৮-এ তিনি সুভাষচন্দ্রকে লেখেন ঃ 'যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও চরমপত্র নিয়ে তোমার অবিরাম ভীতি প্রদর্শন আমি পছন্দ করছি না।'[৭৩]

সুভাষচন্দ্র মনে করতেন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে না পারলে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করা যাবে না। এ ব্যাপারে জিন্নার সঙ্গে তাঁর আলোচনা ব্যর্থ হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাঙলা, সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মতো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম লিগ বহির্ভূত গোষ্ঠী ও দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব গান্ধীর কাছে রাখেন। তাঁর উদ্যোগে আসামে এই ধরনের সরকার গঠিত হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন এই প্রচেষ্টার সাথে সাথে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে এবং কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখবে। তার ফলে যুক্তিবাদী মুসলমানরা সন্তুষ্ট হবেন। তাঁরা উপলব্ধি করবেন কংগ্রেস তাঁদের অভিযোগগুলি বুঝতে এবং যতটা সম্ভব প্রতিকার করতে যথেষ্ট আগ্রহী। এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী কংগ্রেসে সরকারের কাছে স্বাধীনতার দাবি পেশ করলে তা অনেক বেশি জোরদার হবে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংকট যখন ঘনীভূত হচ্ছে। সুভাষচন্দ্রের এই প্রস্তাবকে গান্ধী কোনও গুরুত্ব দেন নি। এমনকি বাঙলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যাপারে গান্ধী প্রথমে রাজি হয়েও পরে বিড়লা, নলিনীরঞ্জন সরকার ও আবুল কালাম আজাদের পরামর্শে পিছিয়ে যান। নলিনীরঞ্জন সরকার বিড়লা ও আজাদের সঙ্গে মিলে গান্ধীকে এই পরামর্শ দেওয়ার কয়েকদিন আগে সুভাষচন্দ্রকে কথা দিয়েছিলেন তিনি হক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করবেন।[৭৪] পরে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। মুসলিম লিগের সঙ্গে হকের কোয়ালিশন সরকারই বহাল থাকে। ফলে বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিরোধ আরও তীব্র হয় যা

১৯৪৭-এ বাঙলা বিভাজনে পরিণতি লাভ করে। বিড়লা তাঁর বাণিজ্যিক স্বার্থে হক-লিগ মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখতে চাইছিলেন। তাছাড়া তিনি মনে করতেন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতা কোনও দিনই সম্ভব নয়। ১১ জানুয়ারি, ১৯৩৮-এ তিনি মহাদেব দেশাইকে লিখেছিলেন : 'আমি বুঝতে পারছি না দু'টি যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব নয় কেন—একটি মুসলমানদের, আর একটি হিন্দুদের। দুই তৃতীয়াংশ মুসলমান অধ্যুসিত প্রদেশগুলি অথবা তাদের অংশ বিশেষ এবং কাশ্মীরের মতো ভারতীয় রাজ্য নিয়ে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র হতে পারে।...যদি কোনও কিছু আমাদের অগ্রগতি রোধ করে তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন—ইংরেজরা নয়, বরং আমাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ।'[৭৫] স্বাভাবিক কারণে তিনি বাঙলায় কৃষক প্রজা পার্টি-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠনের বিরুদ্ধেই গান্ধীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। গান্ধীর কাছে চিরকালই বিড়লার পরামর্শ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার একটা বিশেষ মূল্য ছিল। জওহরলালও বাঙলায় কোয়ালিশন সরকার গড়ার বিরোধী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার সমালোচনা করে পরে তাঁকে লেখেন : 'বাঙলায় তোমার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের ইচ্ছা নিয়মতান্ত্রিকতার পথে যাওয়ার বিরুদ্ধে তোমার প্রতিবাদের সঙ্গে খাপ খায় না। সাধারণভাবে এটা দক্ষিণপন্থী নীতি বলেই মনে হবে, পরিস্থিতি যখন দ্রুত ঘোরালো হয়ে উঠছে তখন তো আরও হবে।'[৭৬] জবাবে সুভাষচন্দ্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন : 'যদি সারা দেশের পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণের নীতিকে তুমি নাকচ কর, আমি তাতে স্বাগত জানাব। কিন্তু কংগ্রেস পার্টি যদি সাতটি প্রদেশের শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে নেয়, তাহলে অন্যান্য অংশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতেই হবে।...হক মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই প্রদেশে কী ঘটেছে কখনও কি তা জানতে চেয়েছ? যদি জানতে তাহলে রাজনীতির মতান্ধের মতো কথা বলতে না। তাহলে আমার সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করতে যে প্রদেশটিকে যদি বাঁচাতে হয়, হক মন্ত্রিসভাকে বিদায় নিতেই হবে এবং বর্তমান অবস্থায় যে সরকার সবচেয়ে ভাল অর্থাৎ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, তাই প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কিন্তু এসব কথা বলার সময় আমি এটুকুও বলে রাখতে চাই যে, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার কথা উঠছে যেহেতু পূর্ণ স্বরাজের জন্য সক্রিয় সংগ্রাম স্থগিত রাখা হয়েছে। কাল এই সংগ্রাম শুরু কর, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সব কথা শূন্যে মিলিয়ে যাবে।'[৭৭]

আরও নানা প্রশ্নে কংগ্রেসে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ

তখন তীব্র হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক সংগ্রামের প্রতি কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির নীতি ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি দক্ষিণপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি বামপন্থীদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এ সবের প্রতিবাদে ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নরেন্দ্র দেবের নেতৃত্বে বামপন্থীরা সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। গান্ধী এতে খুবই বিরক্ত হন। এই ঘটনার সময় সুভাষচন্দ্রের মনোভাব তিনি ও তাঁর অনুগামীরা সুনজরে দেখেন নি। কারণ, সমাজতন্ত্রীদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন। বামপন্থীদের এই আচরণের সমালোচনা করে অক্টোবর মাসে 'হরিজন'-এ গান্ধী লেখেন, ১৯২০ সাল থেকে কংগ্রেস এক ইচ্ছাশক্তি, এক নীতি, এক লক্ষ্য এবং যথাযথ শৃঙ্খলা মেনে চলছে। এই সব নীতির বিরোধীদের তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করতে বলেন এবং সতর্ক করে দেন, 'বিশৃঙ্খলা যদি রোধ করতে হয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা যথা সময়ে নিতে হবে।'[৭৮] গান্ধী বুঝেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে তিনি যেভাবে চান সেভাবে কাজ হবে না। প্যাটেলের মেয়ে মনিবেনের চিঠির জবাবে ২৮ অক্টোবর গান্ধী তাঁকে লেখেন: 'সুভাষবাবুকে নিয়ে যা ঘটছে তা আমার চিন্তার বাইরে নেই।...কিন্তু বাবার (প্যাটেল) মত, জওহরলালের ফিরে আসা (ইউরোপ থেকে) পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত, সুতরাং আমি নীরব আছি। সভাপতি নির্বাচনে এবার কিছু বাধা আসতে বাধ্য।'[৭৯] গান্ধী বামপন্থীদের দিক থেকে বাধা আশঙ্কা করছিলেন এবং জওহরলালকে সঙ্গে পেতে চাইছিলেন।

সুভাষচন্দ্র যে পথে কংগ্রেসকে পরিচালিত করতে চাইছিলেন তা বামপন্থীদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। তাঁরা চাইলেন সুভাষচন্দ্রই পরের বছরের জন্য কংগ্রেস সভাপতি থাকুন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রতিরোধে ও আগামী জাতীয় সংগ্রামের স্বার্থে তাঁরা সুভাষচন্দ্রকেই এই পদে উপযুক্ত মনে করেছিলেন। সে সময়ের এক বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তিত্ব ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ লিখেছেন: 'বামপন্থী কংগ্রেসিরা ব্যাপকভাবে এই মত পোষণ করতেন যে, গান্ধী এবং অন্য দক্ষিণপন্থী নেতারা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যথেষ্ট দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নন। কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আপস করার ব্যাপারে বিড়লার মতো নেতৃস্থানীয় পুঁজিপতিরা পর্দার আড়ালে যে সব চেষ্টা করছিলেন তা ভালভাবেই জানা ছিল। এটা ব্যাপকভাবে মনে করা হোত যে এইসব প্রচেষ্টাকে আটকাতে হলে সভাপতি পদে বসুর থাকা উচিত। নেহরুর

মতো না হয়ে, বসু দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরোধিতায় কঠোর ছিলেন, যে জন্য বামপন্থীরা তাঁর পেছনে সমবেত হয়েছিলেন।'[৮০] কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এ ১৯৩৮-এর ১৬ অক্টোবর সংখ্যায় প্রথম এই দাবি জানানো হয়। কয়েকটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও তাঁকে পরের বছরের জন্য সভাপতি করার সুপারিশ করে। এই সময় রবীন্দ্রনাথও তাঁর পুনর্নির্বাচন সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য জওহরলালকে শান্তিনিকেতনে আসার অনুরোধ জানিয়ে কবি তাঁকে দু'খানি চিঠি লেখেন। কবির সচিব অনিল চন্দও একই অনুরোধ জানিয়ে তাঁকে চিঠি দেন। বাঙলার সঙ্কটজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ জানিয়ে কবি বিশেষ দূত মারফত গান্ধীর কাছে চিঠি পাঠান। তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। জওহরলাল শান্তিনিকেতনে আসেননি। গান্ধী জানিয়ে দেন, 'বাঙলার দূষিত আবহাওয়া দূর করতে হলে সভাপতিত্বের কাজ থেকে তাকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।' সেই সঙ্গে জওহরলালকে জানিয়ে রাখেন তিনি কবিকে কী লিখেছেন এবং পরামর্শ দেন তিনি যেন নিজের মত কবিকে জানান।[৮১]

গান্ধী ও তাঁর অনুগামী নেতারা যথাসময়ে সভাপতির সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে স্থির করেন পরের বছরের জন্য আবুল কালাম আজাদকে সভাপতি করবেন। তিনি রাজি না হলে তাঁদের পরবর্তী পছন্দ পট্টভি সীতারামায়া। এই আলোচনায় জওহরলালও উপস্থিত ছিলেন। প্যাটেল পরে ব্যাখ্যা করে বলেন, এই ঘরোয়া আলোচনা হয় 'পূর্ব নির্দিষ্ট ক্রমে নয়, দৈবাৎ'।[৮২] আজাদ নাম প্রত্যাহার করে নেন। সুভাষচন্দ্র তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করে বলেন, এটা কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নয়, নীতি ও কার্যক্রমের বিষয়। তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেন—কংগ্রেস দলের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রশ্ন এবং প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরোধিতার প্রশ্ন।[৮৩] এর পেছনে যে কোনও ব্যক্তিগত আকাঙ্খা নেই তা ব্যাখ্যা করে তিনি পরে এক বিবৃতিতে বলেন: 'আমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধবদের জানিয়েছিলাম, এই বছর বামপক্ষ থেকে নতুন একজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো উচিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তা হল না এবং কয়েকটি প্রদেশ থেকে আমার নাম প্রস্তাব করা হল। দেরিতে হলেও এখনও আমি নির্বাচনদ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সত্যকার বিরোধী আচার্য নরেন্দ্র দেবের মতো কাউকে আগামী বছরে সভাপতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।'[৮৪] ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণপন্থী সদস্যরা

যৌথভাবে এবং প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ পৃথকভাবে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন। বলা হল, যে পদ্ধতিতে পট্টভিকে মনোনীত করা হয়েছে সেই পদ্ধতি ১৯২০ সাল থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটিতে কোনও মতবিরোধ নেই। প্যাটেল আরও বলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চান এমন কোনও সদস্যের কথা তাঁর জানা নেই।[৮৫] জওহরলালও আলাদা বিবৃতিতে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনও মতবিরোধের কথা তিনি জানেন না। তিনি কোনও প্রার্থীর সপক্ষে বা বিপক্ষে বিবৃতি দিচ্ছেন না জানিয়ে আরও বলেন, সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনে দাঁড়ানো উচিত হয় নি। কারণ, পদ গ্রহণ করলে তাঁর মতো সুভাষচন্দ্রেরও কার্যকর কিছু করার সামর্থ্য হ্রাস পাবে।[৮৬] প্রকারান্তরে তিনি সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতাই করেন। সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি ও রায়পন্থীরা প্রচার অভিযান চালান। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে প্যাটেল, জওহরলাল ও অন্যান্যদের বিবৃতির প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র পাল্টা বিবৃতিতে অভিযোগ করেন ঃ 'যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেস প্রস্তাবে আপসহীন বিরোধিতার কথা বলা আছে, তবুও কিছু কিছু প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা যে গোপনে ও প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে চলেছেন তা না বললেও চলে।... সাধারণের এমনও বিশ্বাস যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কেবিনেটে যাঁরা মন্ত্রী হবেন তাঁদের নামের তালিকাও স্থির হয়ে গেছে।'[৮৭] এই বিবৃতির জন্য সুভাষচন্দ্রকে পরে অভিযুক্ত করা হয় এই বলে যে, তিনি সহকর্মীদের নামে 'অপবাদ' দিয়েছেন। গান্ধী বলেন, 'আমি মনে করি সহকর্মীদের সম্পর্কে তাঁর উক্তি অন্যায় ও অসঙ্গত'।[৮৮] জওহরলাল একে 'কাগুজে গুজব আর বাজারের কথা' বলে বর্ণনা করে সুভাষচন্দ্রকে লেখেন ঃ 'তুমি তোমার বিবৃতিতে যা বলেছ সেটা সম্পূর্ণ অন্যায় কথা।...এই ধরণের বিবৃতি গান্ধীজি এবং তোমার মধ্যে কোনও সহযোগিতার পক্ষে এক কার্যকর অন্তরায়, কেননা অন্যরা তো একরকম গান্ধীজির প্রতিনিধিত্ব করছেন।'[৮৯]

পরবর্তীকালে প্রকাশিত নথিপত্র ও গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্রের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল না। গান্ধী ১৯৩৮-এর জানুয়ারি মাসে সেবাগ্রাম আশ্রমে লর্ড লোথিয়ানের সঙ্গে আলোচনায় শর্তাধীনে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন এবং বড়লাটকে লোথিয়ান সে কথা জানান। পরে ১৬

এপ্রিল গান্ধী বড়লাট লিনলিথগোর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে জানান যে, তিনি লোথিয়ানাক দেওয়া ফরমুলার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৯০] সাক্ষাতের আগে ৪ এপ্রিল গান্ধী বড়লাটকে লেখেন : 'আমি কি পি. এস. ভি-কে (বড়লাটের একান্ত সচিব) তারবার্তায় প্রেরকের নাম না দিয়ে শুধু আমার দিল্লী পেঁছবার দিনটা জানাতে পারি ?...এখন গোপনীয়তা সম্বন্ধে বলি, আমি যা করছি সে সম্বন্ধে কয়েকজন বন্ধুকে আমি জানাতে বাধ্য।...আমি অবশ্য দেখব যাতে সংবাদপত্র কিছু জানতে না পারে। যত কম লোককে সম্ভব বলা হবে। আমি ধরেই নিচ্ছি আমাদের সাক্ষাতের আগে আপনি গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। সাক্ষাতের পর গোপনীয়তা কি অসম্ভব নয়'?[৯১] ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮-এ লণ্ডন থেকে ওয়ার্কিং কমিটির জন্য জওহরলালের পাঠানো এক নোট থেকে জানা যাচ্ছে, গান্ধী ইঙ্গিত দেন কিছু পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব এবং এভাবে সংঘর্ষ এড়িয়ে নিজেদের শক্তিশালী করা যেতে পারে যদি কিছু শর্ত পূরণ করা হয়। এ সম্পর্কে জওহরলাল নিজের অভিমত জানিয়ে লেখেন, এই শর্তগুলি সন্তোষজনক নয়, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিকল্প হিসাবে সংঘর্ষও সময়োপযোগী নয় যদি এগুলি কার্যকর করা হয়।[৯২] দেখা যাচ্ছে শুধু গান্ধী নন, জওহরলালও শর্তাধীনে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। গান্ধী ছাড়াও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ভুলাভাই দেশাই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার ব্যাপারে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছিলেন। বিড়লা বিভিন্ন বিষয়ে যেমন ব্রিটিশ সরকার ও গান্ধীর মাধ্য যোগাযোগ রাখতেন, এ ব্যাপারেও তেমনি একই ভূমিকা পালন করেছিলেন। গোটা ব্যাপারটা ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীর বিশ্বস্ত অনুগামীরা সবাই জানতেন এবং সমর্থনও করতেন।[৯৩] জওহরলাল যে এসব একেবারেই জানতেন না তা নয়। ..

সভাপতি নির্বাচনের ঠিক আগের দিন ২৮ জানুয়ারি, ১৯৩৯-এ গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন : 'কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থায় আমি দেশের সামনে অরাজকতা ও লাল সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না। ত্রিপুরিতে আমরা কি সেই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হব ?'[৯৪] তাঁর ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। তবুও স্বচ্ছন্দ গরিষ্ঠতায় সুভাষচন্দ্র জয়ী হন। তিনি পান ১৫৮০টি ভোট, আর পট্টভি পান ১৩৭৫টি। ৩১ জানুয়ারি গান্ধী নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তাঁর বিবৃতিতে বলেন : 'যেহেতু পট্টভিকে প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম প্রত্যাহার না করার জন্য আমিই উদ্যোগী হয়ে রাজি করিয়েছিলাম, এই পরাজয়

তাঁর চেয়ে আমারই বেশি।...আমি পরাজয়ে উল্লসিত...যতই হোক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য দুঃখভোগ করেছেন। তাঁর মতে তাঁর নীতি ও কার্যক্রম সবচেয়ে অগ্রগামী ও দুঃসাহসিক। সংখ্যালঘুরা শুধু এর সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করতে পারেন। তাঁরা যদি এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারেন তাঁদের কংগ্রেস ত্যাগ করে আসতে হবে।...কোনও কারণে সংখ্যালঘুরা যেন বাধা সৃষ্টি না করেন। যখন তাঁরা সহযোগিতা করতে পারবেন না, তাঁরা যেন বিরত থাকেন'।[৯৫] গান্ধীর এই বিবৃতি কংগ্রেসকে বিভক্ত করারই আহ্বান ছিল। ১৯৩৪-এ তিনি নিজে কংগ্রেস থেকে সরে এসেছিলেন। কারণ, গুরুতর মত পার্থক্য সত্ত্বেও কংগ্রেসের ওপর কর্তৃত্ব করা এক প্রকার হিংসা বলেই তিনি মনে করতেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীদের কংগ্রেসে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯৩৯-এ তিনি তাঁর অনুগামীদের প্রয়োজনে কংগ্রেস ত্যাগ করে আসার পরামর্শ দিলেন। ১৯৩৪-এ বামপন্থীদের দ্বারা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব দখল ছিল একটি সম্ভাবনা। ১৯৩৯-এ তা বাস্তব রূপ নিয়েছিল। গান্ধীর অনুগামীদের অবশ্য কংগ্রেস ত্যাগ করতে হয় নি। কারণ সংখ্যালঘুরা পরে সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠেন। কংগ্রেসে গান্ধীর কর্তৃত্বই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গান্ধীর বিবৃতি পড়ে মানবেন্দ্রনাথ রায় ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে অত্যন্ত সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: 'আমি একে যুদ্ধ ঘোষণা বলে মনে করছি যা সত্যকার গান্ধীবাদী রীতিতে পরিচালিত হবে, যেমন অসহযোগ...গান্ধীজির বিবৃতির স্পষ্ট তাৎপর্য হচ্ছে, কংগ্রেস নেতৃত্বে আপনার এবং যাঁরা আপনার নির্বাচনে বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের একত্রে স্থান নেই; একজনকে যেতেই হবে'।[৯৬] শুরু হয় নির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে গান্ধীর নেতৃত্বে তাঁর অনুগামী কংগ্রেসীদের অসহযোগ। ৫ ফেব্রুয়ারি গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে লেখেন: মৌলানা সাহেব তার করে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তাঁর এবং অন্যদের সরে আসার প্রস্তাব দিয়েছেন। রাজেনবাবুও একই প্রস্তাব দিয়ে চিঠি লিখেছেন। 'আমি যতটা বুঝি পুরনো সহকর্মীরা, যাঁদের তুমি দক্ষিণপন্থী মনে কর, তোমার কেবিনেটে থাকবেন না'।[৯৭] সুভাষচন্দ্র সেবাগ্রামে গিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেন, তাঁর পরামর্শ চান। সুভাষচন্দ্রের কর্মপন্থায় গান্ধী সম্মত হলেন না। তাঁর মতে 'দেশে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাতে মধ্যপন্থার স্থান নেই।' তিনি আরও জানান প্যাটেল ও অন্যরা একই কমিটিতে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না। সুভাষচন্দ্র বলেন ২২ তারিখে ওয়ার্কিং

কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা করবেন যাতে তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।[৯৮] গায়ে জ্বর নিয়ে তিনি কলকাতায় ফেরেন ১৭ ফেব্রুয়ারি। তারপর গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় নির্দিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ত্রিপুরি কংগ্রেস পর্যন্ত স্থগিত রাখার জন্য গান্ধী ও প্যাটেলকে তিনি ২১ তারিখে তার করেন। প্যাটেলকে তার বার্তায় বলেন : 'মহাত্মাজীকে করা আমার তার দয়া করে দেখবেন। দুঃখের সঙ্গে বোধ করছি ওয়ার্কিং কমিটিকে কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতুবি রাখতে হবে। সহকর্মীদের পরামর্শ নিয়ে তার করে মতামত জানাতে অনুরোধ করি।'[৯৯] এর ব্যাখ্যা করা হল, সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটিতে সহকর্মীদের যোগদান চান না, এমনকি দৈনন্দিন কাজ করতে দিতেও চান না।[১০০] তাই প্যাটেল, প্রসাদ, আজাদ প্রমুখ ১২ জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য একযোগে পদত্যাগ পত্র পাঠান। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন আগামী কংগ্রেসের জন্য প্রস্তাবগুলি তাঁর অনুপস্থিতিতে যেন গৃহীত না হয়। দৈনন্দিন কাজ চালাতে তিনি বাধা দেন দি। সহকর্মীদের মতামতও জানাতে বলেছিলেন। আসলে তাঁরা যে পদত্যাগ করবেন সে তো আগেই ঠিক ছিল। পদত্যাগপত্রে বলা হয় : 'আমরা মনে করি, সময় এসেছে যখন দেশের একটা দ্ব্যর্থহীন নীতি নেওয়া উচিত যা কংগ্রেসে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আপসের ভিত্তিতে তৈরি হবে না। অতএব এটিই সঠিক যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি সমমতাবলম্বী কেবিনেট গঠন করা আপনার উচিত।'[১০১] গান্ধীই এর খসড়া করেছিলেন।[১০২] জওহরলালকেও একযোগে পদত্যাগ করতে জোর চাপ দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা না করে একটি পৃথক বিবৃতি দেন যার অর্থ দাঁড়ায় তিনিও পদত্যাগ করছেন। তাঁর বিবৃতির অর্থ পদত্যাগ কিনা এ সম্বন্ধে পরে তিনি মন্তব্য করেন, 'পুরোটা ঠিক নয়, তবে অনেকটাই ঠিক'।[১০৩]

৭ মার্চ ত্রিপুরি কংগ্রেস শুরু হওয়ার কথা। ৩ ফেব্রুয়ারি জওহরলালকে চিঠি লিখে গান্ধী জানিয়ে দেন, 'নির্বাচনে যেভাবে লড়াই হল, তার পরে আমি অনুভব করছি যে, আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে অনুপস্থিত থেকে দেশের সেবা করব।'[১০৪] তারও আগে ২৭ জানুয়ারি মহাদেব দেশাই বিড়লাকে লিখেছিলেন, পট্টভি যদি জেতেন গান্ধী ত্রিপুরি কংগ্রেসে যোগ দেবেন, সুভাষচন্দ্র জিতলে যোগ নাও দিতে পারেন।[১০৫] ২৭ ফেব্রুয়ারি গান্ধী রাজকোট রওনা হয়ে যান। ৬ মার্চ ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরি পৌঁছন। ৮ মার্চ বিষয় নির্বাচনী সভায় গোবিন্দ বল্লভ পন্থ গান্ধীর নীতি ও কার্যক্রমের প্রতি আনুগত্য

জানিয়ে, গত বছরের ওয়ার্কিং কমিটির কাজে আস্থা প্রকাশ করে এবং এই কমিটির কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাতে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে বলা হয়ঃ 'কংগ্রেসের কার্যনির্বাহিক অঙ্গ তাঁর (গান্ধীর) সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হওয়া দরকার এবং সভাপতিকে অনুরোধ জানাচ্ছে তিনি যেন গান্ধীজির ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করেন।'[১০৬] প্রস্তাবটির প্রধান রচয়িতা ছিলেন রাজাগোপালাচারী।[১০৭] কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা, মানবেন্দ্রনাথ রায়, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার প্রমুখ বামপন্থীরা সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। দু'দিন ধরে বিতর্ক চলে। ৯ তারিখে ২১৮—১৩৫ ভোটের ব্যবধানে সংশোধনীগুলি পরাজিত হয় এবং পন্থ প্রস্তাব পাশ হয়।[১০৮]

১০ মার্চ প্রকাশ্য অধিবেশনের শুরুতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস তাঁর ভাষণে বলেন, 'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান'।[১০৯] 'মহাত্মাজী কী জয়। হিন্দুস্থান কী হিটলার কী জয়' বলে জয়ধ্বনিও দেওয়া হয়।[১১০] রবীন্দ্রনাথ এসবে খুবই ব্যথিত হন। ১৭ মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে এক খোলা চিঠিতে তিনি লেখেনঃ 'অবশেষে আজ, এমন কি, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির নিঃসংকোচ জয় ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।...ডান হাত দিয়ে নেশনের টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোঁক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষেরই অধিকারায়ত্ত এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা করে রাখবার উপায়।'[১১১] প্রকাশ্য অধিবেশনে অসুস্থ সভাপতির ভাষণ পাঠ করেন শরৎ বসু। এই ভাষণে সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মপন্থা পেশ করে বলেনঃ 'আমার মতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আমাদের জাতীয় দাবি চরমপত্রের আকারে পেশ করা উচিত, সেই সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া থাকবে যার মধ্যে উত্তর প্রত্যাশা করা হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোনও জবাব না পাওয়া যায়, অথবা সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের জাতীয় দাবি বলবৎ করার জন্য যে সব অনুমোদিত পন্থা আমাদের আছে আমরা তার আশ্রয় নেব। আমাদের অনুমোদিত পন্থা আপাততঃ ব্যাপক আইন অমান্য অথবা সত্যাগ্রহ। দীর্ঘকালের জন্য সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহের মতো একটা বৃহৎ সংঘর্ষের সম্মুখীন

হওয়ার মতো অবস্থা ব্রিটিশ সরকারের আজ আর নেই।...নাগরিক স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল সরকারের জন্য রাজ্যগুলির গণ আন্দোলনকে ব্যাপক ও নিয়মিতভাবে পরিচালিত করার দায়িত্ব ওয়ার্কিং কমিটির নেওয়া উচিত। এতদিন যে কাজ হয়েছে তা হয়েছে খাপছাড়াভাবে।...দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন-গুলির সঙ্গে বিশেষকরে কিষাণ আন্দোলন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। দেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও পারস্পরিক একতা বজায় রেখে কাজ করে যেতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সব সংগঠনের প্রয়াসকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার লক্ষ্যে চালিত করতে হবে'।[১১২] সুভাষচন্দ্রের এই কর্মপন্থা অগ্রাহ্য করা হয়। অথচ তিনিই ব্রিটিশের দুর্বলতম সময়টা ঠিক ধরেছিলেন। জওহরলালের মুসাবিদা করা জাতীয় দাবির ওপর প্রস্তাব উত্থাপন করেন জয়প্রকাশ। আর তা সমর্থন করেন জওহরলাল। প্রস্তাবে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যদি কার্যকর করা হয় তাহলে তা প্রতিরোধ করতে আন্দোলন করা হবে। যদি সরকার তা মুলতুবি রাখে এবং আগের আইনেই কাজ চালিয়ে যায় তাহলে কী করা হবে বলা হল না। শরৎ বসু এই প্রস্তাবের সমালোচনা করে বলেন: 'শুধুই কথা, কথা, কথা, অকেজো কথা, প্রাণহীন কথা।'[১১৩]

প্রকাশ্য অধিবেশনে শেষদিনে পন্থ-প্রস্তাব অনুমোদের জন্য পেশ করা হয়। পন্থ তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন: যে সব জাতি এগিয়ে গেছে তারা একজনের নেতৃত্বে তা পেরেছে। যেমন হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি, মুসোলিনির নেতৃত্বে ইটালি এবং লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া। 'আমাদের গান্ধী আছেন। ...তাহলে কেন আমরা এর সুযোগ নেব না?'[১১৪] সবচেয়ে বেশি আবেদন সৃষ্টি করে রাজাগোপালাচারীর বক্তৃতা। তিনি একটি রূপক-কাহিনী শোনান: একটি নদীতে দু'টি নৌকা আছে। একটি পুরনো কিন্তু বড়, যার চালক মহাত্মা গান্ধী। আর একজনের নৌকাটি নতুন, আকর্ষনীয়ভাবে রঙ করা এবং পতাকা লাগানো। মহাত্মা গান্ধী একজন পরীক্ষিত নাবিক যিনি আপনাদের নিরাপদে পেঁৗছে দিতে পারেন। আপনারা যদি অন্য নৌকাটিতে ওঠেন, আমি জানি যা ফুটো, সবাই ডুববেন এবং নর্মদা নদী সত্যি খুব গভীর। নতুন নাবিক বলছে: 'যদি আপনারা আমার নৌকায় না ওঠেন তাহলে অন্তত আপনাদের নৌকার সঙ্গে একে বেঁধে দিন।' তাও অসম্ভব, আমরা একটা ভাল নৌকার সঙ্গে ফুটো নৌকাকে

বেঁধে দিয়ে নিজেদের ডুবে যাওয়ার বিপদ ডেকে আনতে পারি না। আমরা বিশ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধীকে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট। তিনি যা বলেন তাই করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন কম কিন্তু করেন বেশি। ভাববেন না, 'আমরা কিছু সময়ের জন্য নতুন নৌকায় উঠে বসব এবং তারপর পুরনো নৌকায় ফিরে আসব।' আপনারা পুরনো নৌকায় ফিরে আসার জন্য বেঁচে নাও থাকতে পারেন, কারণ আমি বলেছি, নতুন নৌকাটি ফুটো।[১১৫] প্রাচীন পন্থীরা খুব উপভোগ করেন এ কাহিনী। আর যাঁরা দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন তাঁরা পন্থ-প্রস্তাবের পক্ষে চলে আসেন।[১১৬] রূপকের মাধ্যমে প্রস্তাব-রচয়িতা প্রস্তাবের উদ্দেশ্যটাও ভারি সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বিষয়নির্বাচনী সভায় পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রকাশ্য সভায় 'কংগ্রেসে ঐক্য বজায় রাখার' যুক্তিতে নিরপেক্ষ থাকে। দলের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কিছু সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও রায়পন্থীরা যথারীতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় নেতৃত্বের কথা ভেবে কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো প্রথমে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রধানত বাঙলার প্রতিনিধিদের চাপে কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী বৈঠকে পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত বাতিল করে পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পন্থ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা যে সব বক্তৃতা দেন তাতে পার্টির ভেতরের এই মতবিরোধের প্রতিফলন ঘটেছিল। ভোটাভুটিতে তা প্রতিফলিত হয়েছিল কিনা সঠিকভাবে জানা নেই।[১১৭] প্রকাশ্য অধিবেশনে পন্থ-প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের নিরপেক্ষতাই প্রধানত এর জন্য দায়ী। ফলে অন্যান্য বামপন্থীদের তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় তাঁদের। কলকাতা থেকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জয়প্রকাশের কাছে তার পাঠিয়ে বিদ্রূপ করেন: 'অভিনন্দন, পার্টি জওহরলাল নেহরুর পশ্চাৎবর্তী হওয়ার কথা ভাবছে' (Congratulations Party contemplating posterior of Jawaharlal Nehru)।[১১৮] বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিকে ব্যঙ্গ করে গান বাঁধেন: 'মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল / লাল বুলি আওড়ান আমাদের ছল/কাজে মোরা কংগ্রেসী পাণ্ডা/ জওহরলালের ধরি ঝাণ্ডা… ।'[১১৯]

সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা ব্যাপারটাতে জওহরলাল নিজেকে নিরপেক্ষ হিসাবে তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু কার্যত তিনি

সুভাষচন্দ্রের বিরোধীদেরই সমর্থন করেছিলেন। বিদায়ী সভাপতি হিসাবে হরিপুরা কংগ্রেসে পেশ করা তাঁর রিপোর্টে তিনি অভিযোগ করেছিলেন দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের দমন করার চেষ্টা করছেন। ৯ জানুয়ারি, ১৯৩৮-এ সুভাষচন্দ্রকে লেখা চিঠিতেও তিনি একই কথা বলেন এবং তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাসও দেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর সভাপতিত্বকালে বার বারই জওহরলালের সহযোগিতা ও পরামর্শ চেয়েছেন। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে কোনও জবাব দেননি। যা বলেছেন তার অর্থ হ্যাঁ-ও হয় না-ও হয়। পরে সুভাষচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে জওহরলাল স্বীকার করেছেন, গান্ধী ও তাঁর গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করতেন। কারণ তাতে বিভেদ দেখা দিত। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, 'বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যই লক্ষ্য নয়, তা উপায় মাত্র। যতদিন তা প্রগতির অনুকূল ততদিনই তা কাম্য। যখনই তা প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায়, তখনই তা ক্ষতিকর'। তাই সুভাষচন্দ্র অভিযোগ করেছেন : ত্রিপুরি সঙ্কটের সময় জওহরলালই বামপন্থীদের আদর্শের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন। 'তিনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকতেন আমরাই সংখ্যায় বেশি হতে পারতাম।'[১২০] ইউরোপের ইতিহাসের এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনবদ্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন ত্রিপুরি কংগ্রেসে জওহরলালের ভূমিকা : 'ইতিহাসের ছাত্রদের মনে পড়বে পোল্যাণ্ডের প্রথম পার্টিশন-এর সময় (১৭৭২) অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী মারিয়া তেরেসা পোলদের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন অথচ ভাগের অংশ নিতে কুণ্ঠিত হন নি যাতে প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক বিদ্রুপ করে বলেন : "Elle pleurait, mais elle tenait" (তিনি কাঁদলেন কিন্তু ভাগটি ঠিক নিলেনও)'[১২১]

ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর অসুস্থ সুভাষচন্দ্র পন্থ-প্রস্তাবের নির্দেশ অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। তিনি গান্ধীর কাছে প্রস্তাব রাখেন কংগ্রেসের দু'টি প্রধান গোষ্ঠীর সমান সমান প্রতিনিধিত্ব রাখাই ন্যায়সঙ্গত হবে। তাছাড়া এ প্রস্তাবও রাখেন গান্ধী যদি আবার সংগ্রাম শুরু করেন তাহলে তিনি নিজেকে 'সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে প্রস্তুত'। ২ এপ্রিলের চিঠিতে গান্ধী সংগ্রাম শুরু করার প্রশ্ন বাতিল করে দেন। কারণ অহিংস আন্দোলনের পরিবেশ তিনি দেখছেন না। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য এবং কংগ্রেসে দুর্নীতি বাড়ছে। অতএব সংগ্রাম সম্ভব নয়। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে তিনি পরামর্শ

দেন: 'সব দিক বিবেচনার পর আমার এইমত, তুমি পুরোপুরি তোমার মতাবলম্বীদের নিয়ে অবিলম্বে তোমার নিজস্ব কেবিনেট গঠন কর, সুস্পষ্ট-ভাবে তোমার কার্যক্রম স্থির কর এবং আসন্ন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপস্থাপিত কর। কমিটি যদি তোমার কার্যক্রম গ্রহণ করে, তাহলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে...অপর পক্ষে তোমার কার্যক্রম যদি গৃহীত না হয়, তখন তোমাকে পদত্যাগ করতে হবে...পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের কথা বাদ দিয়েই আমি তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি।' সুভাষচন্দ্র তখন ৬ এপ্রিল গান্ধীর কাছে প্রশ্ন রাখেন: 'আপনি যদি এক মতাবলম্বী কেবিনেটের উপদেশ দেন এবং তেমন কেবিনেট গঠিত হয় তাহলে হয়তো একথা বলা যেতে পারে যে তা "আপনার ইচ্ছানুযায়ী" গঠিত হয়েছে। কিন্তু তাকে আপনার আস্থাভাজন বলে কি দাবি করা যেতে পারে?...পন্থ-প্রস্তাবকে আপনি যদি স্বীকৃতি দেন নতুন ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কে আপনার মনোগত ইচ্ছাই শুধু জানালে হবে না, সেই সঙ্গে এমন একটি কমিটি গঠনের জন্য আপনাকে উপদেশ দিতে হবে যা আপনার আস্থাভাজন হবে'। ১০ এপ্রিল গান্ধী জবাবে লেখেন: 'পন্ডিত পন্থের প্রস্তাব আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। যতই তা পড়ছি ততই তা খারাপ লাগছে। ...তোমার কেবিনেটকে এবং নীতিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন করবে এমন নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি না।' পন্থ-প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধী যা খুশি মনে করতে পারতেন বা বলতে পারতেন। তাঁর কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। কেননা তিনি কংগ্রেসের সদস্য নন। কংগ্রেস সভাপতি হয়ে কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী কোনও কাজ করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ১৩ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র গান্ধীকে জানান: 'আপনার উপদেশ কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যায়। সেই প্রস্তাবে বলা আছে ওয়ার্কিং কমিটিকে আপনার সম্পূর্ণ আস্থাভজন হতে হবে।'[১২২]

ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামের স্বার্থে সব ধরণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে এমন এক মিশ্র ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের যথাসাধ্য চেষ্টা সুভাষচন্দ্র করেছিলেন। সুকৌশলে রচিত পন্থ-প্রস্তাব এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান্ধীর ভূমিকা-দুয়েরই উদ্দেশ্য ছিল এক অচলাবস্থা সৃষ্টি করা যাতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে না পারেন এবং পদত্যাগে বাধ্য হন। গান্ধী চেয়েছিলেন তাঁর নিঃশর্ত পদত্যাগ। দেখা যাচ্ছে গান্ধী

তাঁর চিঠিতে সুভাষচন্দ্রকে বার বার বলছেন, নিজের পছন্দ মতো কমিটি গড়তে আর তা অনুমোদিত না হলে পদত্যাগ করতে। ৫ মে, ১৯৩৯-এ বৃন্দাবনে গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশনে এক প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী বলেন, তিনি ওয়ার্ধায় তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন, 'যদি তাঁদের সাহস থাকে তাঁদের উচিত সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা।'[১২৩] গান্ধী তাঁর নীতি ও কার্যপদ্ধতির প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোনও প্রকার আপস করতে চান নি। এতকাল তাঁর নেতৃত্ব মেনে কংগ্রেস চলেছে। তাঁরই স্থির করে দেওয়া দিনক্ষণ অনুযায়ী আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং তা প্রত্যাহৃত হয়েছে। রাশ তাঁর হাতেই থেকেছে। তার অন্যথা তিনি চান নি। ত্রিপুরির পর জওহরলাল গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মিটমাটের কিছু চেষ্টা করেন। সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি হিসাবে মেনে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ১৭ এপ্রিল তিনি গান্ধীকে লেখেন: 'তাকে অপসারণের প্রয়াস আমার মনে হয় অতিমাত্রায় ভ্রান্ত পথ। ...আমাদের মনে রাখতেই হবে যে সমমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলেই কংগ্রেস সমমতাবলম্বী হয়ে উঠবে না।'[১২৪] গান্ধীর কাজে এ সব কথার কোনও মূল্য ছিল না বিশেষকরে পন্থ প্রস্তাব-পাশ হয়ে যাওয়ার পর। দরকার ছিল পন্থ-প্রস্তাবের বলিষ্ঠ বিরোধিতার।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে ব্যর্থ হয়ে সুভাষচন্দ্র সভাপতি পদে ইস্তফা দেন ২৯ এপ্রিল এবং তারপরে কংগ্রেসের মধ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি দল গড়েন। ফরওয়ার্ড ব্লকের লক্ষ্য ছিল বামপন্থীদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলা, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠদের জয় করে আনা এবং জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা।[১২৫] বামপন্থী দলগুলি সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত হলেও ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিতে রাজি না হওয়ায় তিনি এই লক্ষ্যগুলি সামনে রেখে জুন মাসে বামসংহতি কমিটি গঠন করেন। তাতে ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, কিষান সভা এবং এম. এন. রায়ের গোষ্ঠী যোগ দেয়। সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীদের কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি জুন মাসে দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। একটি হল, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি ছাড়া কোনও কংগ্রেস কর্মী সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারবে না। আর একটি হল, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার কাজকর্মে কোনও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাম সংহতি কমিটি এই প্রস্তাব দু'টির বিরুদ্ধে ৯ জুলাই দেশ জুড়ে

প্রতিবাদ দিবস পাপন করে। তার আগে ৫ জুলাই প্যাটেল একটি চিঠিতে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে সতর্ক করে দেন, আগামী নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীরা কংগ্রেস সংগঠন ও সভাপতির পদ দখল করার চূড়ান্ত উদ্যোগ নিচ্ছে এবং সব প্রদেশে তাদের জাল বিস্তার করেছে।[১২৬] কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালনের জন্য শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে সুভাষচন্দ্রকে আগস্ট মাসে কংগ্রেস থেকে তিন বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেন গান্ধী। কমিটির বৈঠকে সদস্য না হয়েও উপস্থিত জওহরলাল 'কার্যত নির্লিপ্ত' ছিলেন। আজাদ এত কড়া ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না।[১২৭] আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলছিল। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়। কংগ্রেস ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের কোনও উদ্যোগ না নিয়ে সরকারের কাছ থেকে যুদ্ধের পর স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আদায়ে ব্যস্ত থাকে। এদিকে বাম সংহতি কমিটি থেকে রায়পন্থীরা জুলাই মাসেই বিদায় নিয়েছিলেন, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি চলে যায় অক্টোবর মাসে, আর কমিউনিস্ট পার্টি ডিসেম্বর মাসে। শুধু ফরওয়ার্ড ব্লক ও স্বামী সহজানন্দের কিষাণ সভা টিকে ছিল। তবুও সংগ্রাম শুরু করার অনুকূলে সুভাষচন্দ্রের অবিরাম প্রচার জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী উত্তাপ ক্রমশই বাড়িয়ে তুলছিল। সুভাষচন্দ্রের দাবি দশ মাসে তিনি প্রায় এক হাজার জনসভায় বক্তৃতা করেছেন, এমন কি গান্ধীও মন্তব্য করেছিলেন কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করার পর তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।[১২৮] বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ সভা ছাড়া কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রামের দাবি জানাতে থাকে। কিন্তু শেষোক্ত দুই দল কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সংগ্রাম চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ সভার যৌথ উদ্যোগে ১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলনে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এপ্রিলে আন্দোলন শুরু হয়। আইন অমান্য কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে জুলাই মাসে কলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের ঠিক আগে সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে দেশের মধ্যে তাঁর দ্বারা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়ে।

আর একটি বিষয়ও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ভারতের স্বাধীনতা

বলতে সুভাষচন্দ্র অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতাই বুঝতেন। তিনি মনে করতেন সংগ্রামী কর্মসূচী অনুসরণ না করে আপস রফার পথে চললে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য সরকার আরও বেশি করে মুসলিম লিগকে তোষণ করছিল। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে নানাভাবে ইন্ধন জুগিয়ে যাওয়া ছিল ব্রিটিশ কূটনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেখা যাচ্ছে ১৯৪০-এর মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লিগ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণের ছ' সপ্তাহ আগে ৬ ফেব্রুয়ারি বড়লাট লিনলিথগো জিন্নাকে পরামর্শ দেন: 'যদি তিনি ও তাঁর বন্ধুরা চান যে মুসলমানদের দাবি যুক্তরাজ্যে অবহেলিত না হোক, তাহলে সত্যিই যা অপরিহার্য-তা হল অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা।'[১২৯] মুসলিম লিগের লাহোর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্র ১৯৪০-এর জুন মাসে জিন্নার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনার পর তাঁর ধারণা হয়েছিল জিন্না ব্রিটিশের সাহায্যে তাঁর ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ভাবনায় কেবল ব্যস্ত। কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে তাঁর আগ্রহ নেই, যদিও সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'এরূপ সংগ্রাম হলে শ্রীযুক্ত জিন্নাই স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন।'[১৩০] ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই প্রেক্ষাপটে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১-এর ১৬ জানুয়ারি মধ্যরাত্রে নতুন পথের সন্ধানে দেশ ত্যাগ করেন। ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর থেকে দেশ ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি চেয়েছিলেন বিদেশে আন্দোলন সংগঠিত করে এবং সেই আন্দোলনের স্রোত ভারতের মধ্যে প্রবাহিত করে এক গণ-অভ্যুত্থান ঘটাতে। তিনি বুঝেছিলেন দেশের মানুষ তার জন্য প্রস্তুত। এইভাবে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের আপসকামী প্রচেষ্টা, জিন্নার ভারত ভাগের পরিকল্পনা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব বলে তাঁর মনে হয়েছিল।[১৩১]

ত্রিশের দশকে সমস্ত প্রচেষ্ঠা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র যে সংগ্রাম পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারেন নি চল্লিশের দশকে তাঁর বৈদেশিক কার্যকলাপের অভিঘাতে তাই সম্ভব হয়েছিল। জনমতের প্রবল চাপে ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে গান্ধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন যা সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন

১৯৩৯-এ। আন্দোলনকারীরা সুভাষচন্দ্রের সংগ্রাম পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। তাঁর বৈদেশিক কর্মকাণ্ড এই সংগ্রামকে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল।[১৩২] বড়লাট লিনলিথগো একে '১৮৫৭-এর পর সবচেয়ে মারাত্মক বিদ্রোহ' বলে বর্ণনা করেন।[১৩৩] আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে ১৯৪৫-৪৬-এর গণ-অভ্যুত্থানও তাঁরই অবদান। উভয় ক্ষেত্রেই বামপন্থীরা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার আদর্শের প্রতি আনুগত্যের কারণে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। রায়পন্থীরাও তাই করেছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিলপত্রে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশরা এই দুটি অভ্যুত্থানকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল। ১৯৪৫-৪৬-এর বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিশেষকরে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযানের ফলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তার সামরিক বাহিনীর আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাওয়ায় ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়।[১৩৪] কিন্তু সে সময় উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে ভারতীয় জনগণের দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি। আপসে দেশভাগ মেনে নিয়ে যে স্বাধীনতা আসে তা আসলে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের আওতায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।

সূত্র নির্দেশ ও প্রসঙ্গ কথা

১। **সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,** সম্পাদনাঃ শিশিরকুমার বসু (আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, ১৯৮৩) পৃঃ ৩০-৩১

২। ঐ, **প্রথম খণ্ড,** সম্পাদনাঃ শিশিরকুমার বসু (আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮০) পৃঃ ৪০

৩। ঐ, **চতুর্থ খণ্ড,** সম্পাদনাঃ শিশিরকুমার বসু (আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯২) পৃঃ ১৭৬

৪। ঐ, **প্রথম খণ্ড,** পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১০-১১ ; Leonard A Gordon, *Brothers Against the Raj : A Biography of Sarat and Subhas Chandra Bose* (Viking, New Delhi, 1989) p. 99-102

৫। Jawaharlal Nehru, *An Autobiography* (Allied Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1962) p. 76

৬। সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১, ২০৫

৭। ঐ, পৃঃ ৪২

৮। Tridib Chaudhuri, Introduction to Buddhadeva Bhattacharyya (Ed.) *Freedom Struggle and Anushilan Samiti*, (Anushilan Samiti, Calcutta 1979) p. XIV, XV ; Tarapada Lahiri, Ibid, p. 232

৯। ত্রিশের দশকে ইউরোপে নির্বাসন জীবন অতিবাহিত করার সময় সুভাষচন্দ্র ১৯৩৫-এর এপ্রিল মাসে ফরাসী মনীষী রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতীয় সংগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রোলাঁ্যা সেই আলোচনার বিবরণ তাঁর ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে বিপ্লবীদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সুভাষচন্দ্র বসু অনুমোদন করতে অস্বীকার করেও বললেন যে, অবশ্য একমাত্র ওরাই ভারতবর্ষে ইংরেজদের উদ্বিগ্ন করে তুলতে পেরেছে ; যদিও ওরা সংখ্যায় খুব কম এবং বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ ওদের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল গভীর হয়ে উঠেছিল। এমনকি জেলখানায় ইংরেজ কর্মচারীরাও তাঁর কাছে তা স্বীকার করেছেন। এবং তিনি মনে করেন যে, এই কৌশল যদি গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়তো এতেই ব্রিটিশ নিস্পৃহতাকে কাবু করতে পারতো। কিন্তু আরও একবার তিনি জানালেন যে সন্ত্রাসবাদকে তিনি সুস্থ রাজনৈতিক পদ্ধতি বলে মনে করেন না এবং তিনি সংগঠিত প্রতিরোধের পক্ষে, তাতে হিংসাকে বর্জন করা হবে না এবং লড়াইতে তার ব্যবহারে তিনি মন ঠিক করে ফেলেছেন।' রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা, ভারতবর্ষ দিনপঞ্জী (১৯১৯-১৯৪৩) অনুবাদ ঃ অবন্তীকুমার সান্যাল (র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৯) পৃঃ ৪১৮

১০। Amiya Nath Bose, *Bose Brothers in Indian Struggle* (Sarat Bose Academy Annual Publication, Calcutta, 1983) ; Sisir Kumar Bose, *The Indian National Army and India's Freedom*, in Nisith Ranjan Ray, Kalpana Joshi (Dutt), Chinmohan Sehanavis and others (Ed.) challenge : A Saga of India's Struggle for Freedom (People's Publishing House, New Delhi, 1984) p. 575

১১। নলিনীকিশোর গুহ, **বাংলায় বিপ্লববাদ** (এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৬) পৃঃ ২২১

১২। Cecil Kaye, Communism in India, 1926, NAI, New Delhi, cited in, Gautam Chattopadhyay, *Subhas Chandra Bose and Indian Communist Movement* (People's Publishing House, New Delhi, 2nd Reprint, 1987) p. 4-5 ; চিন্মোহন সেহানবীশ, **রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী** (মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৩) পৃঃ ২২৬

১৩। Cited in Gordon, op. cit. p. 103, 115-16 ; cited in Amiya Nath Bose, op. cit.

১৪। **সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮**

১৫। Cited in, Reba Som, *Differences within consensus* (Orient Longman, New Delhi, 1995) p. 81, 85

১৬। Sarvepalli Gopal, *Jawaharlal Nehru : A Biography*, vol. 1 (Oxford University Press, Delhi, Second Impression, 1981) p. 111

১৭। Nehru, *An Autobiography*, op. cit., p. 167

১৮। Cited in Gopal, op. cit., p. 112

১৯। Jawaharlal Nehru, *A Bunch of Old Letters* (Asia Publishing House, Bombay, 2nd Edn., 1960) p. 58

২০। Gandhi to Jawaharlal, 17 January, 1928, Ibid, p. 59-60

২১। S. Gopal (Ed.) *Selected Works of Jawaharlal Nehru,* vol. 3. (Orient Lungman, New Delhi 1972) p. 19

২২। Ibid, p. 73-78

২৩। Nehru, *An Autobiography*, op. cit., p. 186

২৪। Cited in Gopal, op. cit., p. 123; N. G. Jog, *In Freedom's Quest* : A Biography of Netaji Subhas Chandra Bose (Orient Longmans, New Delhi, 1969) p. 309

২৫। সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮, ৯০; ঐ, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ঃ শিশিরকুমার বসু (আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮৭) পৃঃ ১৭৫-২২৩; ঐ, চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭১-৭৪; *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose* (Publications Division, Govt. of India, 1962) p. 51-59, 62-63

২৬। সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮; Geraldine H. Forbes, *Goddesses or Rebels? The Women Revolutionaries of Bengal,* The Oracle (Quarterly organ of the Netaji Research Burean, Calcutta, April, 1980) p. 7

২৭। S. Gopal (Ed.) *SWJN*, vol. 3, op. cit., p. 179-214

২৮। Cited in Michael Breacher, *Nehru : A Political Biography* (Oxford University Press, London, 1959) p. 136-37

২৯। সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬, ৯২

৩০। ঐ, পৃঃ ৯২

৩১। File G-1, M. Nehru MSS, NMML, Cited in Reba Som, op. cit., p. 94

৩২। Article in 'Young India', 1 August, 1929, reprinted in *Collected Works of Mahatma Gandhi*, vol. 41, p. 239-41, cited in Gopal, op. cit., p. 127

৩৩। Nehru, *An Autobiography*, op. cit., p. 194-95

৩৪। Jawaharlal to S. A. Brelvi, 7 October, 1929, S. Gopal (Ed.) *SWJN, vol. 4* (Orient Longman, New Delhi, 1973) p. 161

৩৫। সুভাষচন্দ্র বসু: সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯

৩৬। Gopal, op. cit., p. 137

৩৭। সুভাষচন্দ্র বসু: সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০১; Selected Speeches of Subhas Chandra Bose, op. cit., p. 60-61

৩৮। D. G. Tendulkar, *Mahatma*, *vol. 3* (Publications Division, Govt. of India, 1961) p. 10

৩৯। Ibid, p. 11

৪০। Ibid, p. 15

৪১। Nehru, *An Autobiography*, op. cit., p. 257

৪২। *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*, op. cit., p. 62-63

৪৩। Amiya Nath Bose, op. cit.

৪৪। প্রতিক্ষণ, ১৫ আগস্ট বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮ পৃঃ ২৩-২৪

৪৫। সুভাষচন্দ্র বসু: সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৪-৫

৪৬। ঐ, পৃঃ ২০৫-১৭

৪৭। ঐ, পৃঃ ১৮২

৪৮। Sisir Kumar Bose and Sugata Bose (Ed.) *Netaji Collected Works, vol. 9* (Oxford University Press, Delhi, 1995) p. 2

৪৯। Subhas Chandra Bose. *Fundamental Questions of Indian Revolution*, (Netaji Research Burean, Calcutta, 1970) p. 86

৫০। Subhas Chandra Bose, *Indian Struggle*, 1920-42 (Asia Publishing House, Bombay, 1964) p. 383-86

৫১। Nehru, *A Bunch of Old Letters*, op. cit., p. 115-21

৫২। Tendulkar, *Mahatma*, *vol.* 3, op. cit., p. 317-19

৫৩। Nehru, *A Bunch of Old Letters*, op. cit., p. 123

৫৪। Ibid, p. 172-73

৫৫। Cited in Gopal, op. cit., p. 209

৫৬। *Collected Works of Mahatma Gandhi*, *vol.* 40 (Publications Division, Govt. of India 1970) p. 365

৫৭। Harijan, 17. 7. 37, *CWMG*, *vol.* 65 (Publications Division, Govt. of India, 1976) p. 408

৫৮। G. D. Birla, *Bapu : A Unique Association vol.* 2 (Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 1977) p. 81

৫৯। Birla to Mahadeb Desai, 22 July, 1937, *Birla*, *Bapu : A Unique Association*, *vol.* 3 (Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 1977) p. 21

৬০। Nehru, *A Bunch of old Letters*, op. cit., p. 253

৬১। Mahadeb Desai to Jawaharlal, 19 November, 1937, *CWMG*, *vol.* 66 (Publications Division, Govt. of India, 1976) p. 474

৬২। Ibid, p. 292-93

৬৩। Ibid, p. 471-77

৬৪। Ibid, p. 285-86

৬৫। *CWMG*, *vol.* 45 (Publications Division, Govt. of India, 1971) p. 200

৬৬। *NCW*, *vol.* 9, op. cit., p. 3-30

৬৭। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, **তরী হতে তীর** (মনীষা; কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৬) পৃঃ ১৪৬

৬৮। *NCW, vol.* 9, op. cit., p. 165

৬৯। Sisir Kumar Bose and Sugata Bose (Ed.) *NCW, vol.* 8 (Oxford University Press, Delhi, 1994) p. 429

৭০। Alexander Werth, *An Assesment of Netaji's Policy of co-operation with the Axis Powers During World War II* in Sisir Kumar Bose (Ed.) Netaji and India's Freedom (Netaji Research Bureau, Calcutta, 1975) p. 255

৭১। Pattabhi Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress, vol.* 2 (Padma Publications Ltd., Bombay, 1947) p. 73 ; *NCW, vol.* 9, op. cit., p. 1

৭২। Ibid, p. 39-43

৭৩। Cited in Nirad C. Chaudhuri, *Thy Hand Great Anarch* (Chatto and Windus, London, 1987) p. 507 ; CWMG-তে চিঠিটি অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

৭৪। Subhas to Gandhi, 21 December, 1938, *NCW, vol.* 9, p. 122-26 ; Gandhi to Subhas, 18 December, 1938, *CWMG, vol.* 68 (Publications Division, Govt. of India, 1977) p. 218

৭৫। Birla, *Bapu, vol.* 3, op. cit., p. 144

৭৬। Nehru, *A Bunch of Old Letters,* op. cit., p. 320

৭৭। Ibid, p. 341-42 ; *NCW, vol.* 9, op. cit., p. 207-8

৭৮। *CWMG, vol.* 67 (Publications Division, Govt. of India, 1976) p. 401-2

৭৯। *CWMG, vol.* 68, op. cit., p. 72

৮০। E. M. S. Namboodiripad, *A History of Indian Freedom Struggle* (Social Scientist Press, Trivandrum, 1986) p. 672

৮১। Nehru, *A Bunch of Old Letters*, op. cit., p. 304, 307-9

৮২। *NCW, vol.* 9, op. cit., p. 77

৮৩। Ibid, p. 67-68, 86

৮৪। Ibid, p. 72-73

৮৫। Ibid, p. 70, 78, 81

৮৬। Ibid, p. 79-81

৮৭। Ibid, p. 83-84

৮৮। *CWMG, vol.* 68 op. cit., p. 359

৮৯। Nehru, *A Bunch of Old Letters*, op. cit., p. 354

৯০। স্বাধীনতা সংগ্রামের সরকারি ইতিহাস প্রণেতা ডঃ তারাচাঁদ তাঁর গ্রন্থে ১৬ এপ্রিল, ১৯৩৮-এ ভারত সচিবকে লেখা বড়লাট লিনলিথগো-র চিঠি উদ্ধৃত করে লিখেছেন: Gandhi met Linlithgow on April 16, 1938 and told him that "he attached utmost importance to the formula which he had indicated to Lothian. Acceptance of it, he regarded as the real test whether or not we were denying India complete sovereignty. I got the impression that he would accept federation, if some larger states introduced principle of popular choice." *History of the Freedom Movement in India, vol.* 4 (Publications Division, Govt. of India, 1983 Reprint) p. 272-73; অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের দেখা হয় ১৫ এপ্রিল, ১৯৩৮-এ। গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার পর লিনলিথগো ছোটলাটদের যে সার্কুলার পাঠান শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠী তা উল্লেখ করেছেন: "the movement is now, at any rate in the Right Wing, more in the direction of accepting Federation subject to bargaining over terms and possibly some modification of the scheme". স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭ (আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা, ১৩৯৭) পৃঃ ২৫৪-৫৫

৯১। *CWMG*, *vol.* 67, op. cit., p. 441

৯২। S. Gopal (Ed.) *SWJN*, *vol.* 9, p. 134, 135

৯৩। Birla, *Bapu*, *vol.* 3, op. cit., p. 104-5, 131-32 ; John Glendevon, *The Viceroy at Bay* p. 75-76, 88-89, cited in Suniti Kumar Ghosh, *India and the Raj*, *vol.* 2 (Research Unit for Political Economy, Bombay, 1995) p. 143 ; অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৯, ২৫০, ২৫৪

৯৪। D. G. Tendulkar, *Mahatma*, *vol.* 5 (Publications Division, Govt. of India, 1969) p. 52

৯৫। *CWMG*, *vol.* 68, op. cit., 359-60

৯৬। *NCW*, *vol.* 9, op. cit., p. 280

৯৭। *CWMG*, *vol.* 68, op. cit., p. 382-83

৯৮। *NCW*, *vol.* 9, op. cit., p. 130, 135, 197

৯৯। Ibid, p. 98

১০০। Nehru, *A Bunch of Old Letters*, op. cit., p. 355

১০১। *CWMG*, *vol.* 68, op. cit., p. 487

১০২। Tendulkar, *Gandhi*, *vol.* 5, (Publications Division, Govt. of India, 1969) p. 46

১০৩। Nehru, *The Unity of India* (Lindsay Drummond, London, 1948) p. 87

১০৪। *CWMG*, *vol.* 68, op. cit., p. 368

১০৫। Birla, *Bapu*, *vol.* 3, op. cit., p. 220

১০৬। Sitaramayya, op. cit., p. 110

১০৭। Rajmohan Gandhi, *The Rajaji Story*, 1937-1972 (Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 1984) p. 37

১০৮। Cited in Gordon, op. cit., p. 379

১০৯। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ মার্চ, ১৯৩৯; উল্লিখিত হয়েছে, নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র (সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৪) পৃঃ ১৩১

১১০। ঐ, পৃঃ ১৩১

১১১। **প্রবাসী**, বৈশাখ, ১৩৪৬, উল্লিখিত হয়েছে, ঐ, পৃঃ ১৩২

১১২। *NCW*, *vol.* 9, op. cit., p. 92-94

১১৩। *Report of the Fifty-second Indian National Congress*, Tripuri, 1939, p. 93, cited in Breacher, op. cit., p. 250

১১৪। N. N. Mitra (Ed.) *Indian Annual Register*, *vol.* 1, p. 335, cited in Gordon, op. cit., p. 379-80

১১৫। Cited in Rajmohan Gandhi, op. cit., p. 37

১১৬। Ibid, p. 37 ; Somnath Lahiri's interview, cited in Gordon, op. cit., notes item no. 20, p. 707

১১৭। *N. C. W*, *vol.* 9, op. cit., p. 140, 289 ; JP Papers, File No. 218/1936-47, cited in Buddhadeva Bhattacharyya, *Origin of the RSP* (Publicity Concern, Calcutta, 1982) p. 41 ; Gordon, op. cit., p 379-80; অমিতাভ চন্দ্র, **অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন : সূচনাপর্ব** (পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯২) পৃঃ ৩৩-৩৪

১১৮। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৪

১১৯। **আনন্দবাজার পত্রিকা**, ১৯ মার্চ, ১৯৩৯, উল্লিখিত হয়েছে নেপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২১-২২

১২০। *NCW*, *vol.* 9, op. cit., p. 193-216, 289 ; Nehru, A Bunch of Old Letters, op. cit., p. 350-63

১২১। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৫

১২২। Bose Gandhi Correspondence, *NCW*, *vol.* 9, op. cit., p. 122-81

১২৩। *CWMG*, *vol.* 69 (Publications Division, Govt. of India, 1977) p. 207

১২৪। Nehru, *A Bunch of Old Letters*, op. cit., p. 379-80

১২৫। Subhas Chandra Bose, *Crossroads* (Netaji Research Bureau, Calcutta, 2nd Edn., 1981) p. 199

১২৬। Cited in Reba Som, op. cit., p. 258

১২৭। Ibid, p. 260

১২৮। সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৬-৯৭

১২৯। Cited in Sumit Sarkar, *Modern India*, 1885-1947 (Macmillan, Madras, 1983) p. 379

১৩০। সুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৯

১৩১। A. C. N. Nambiar's interview, cited in Sisir Kumar Bose (Ed.) *Netaji and India's Freedom*, op. cit., 257

১৩২। গিরিশচন্দ্র মাইতি, ভারত ছাড়ো আন্দোলন : সুভাষচন্দ্রের প্রভাব ও গান্ধীর রণকৌশল, অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৫, ক্রোড়পত্র : সুভাষচন্দ্র পৃঃ ৩-২০

১৩৩। *Transfer of Power, vol.* 2, p. 853

১৩৪। ১৯৫৬ সালে কলকাতার রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির স্বীকারোক্তি, রমেশচন্দ্র মজুমদার, জীবনের স্মৃতিদীপে (জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৭৮) পৃঃ ২২৯-৩০

———

ডি ভ্যালেরা ও সুভাষচন্দ্র

অমিতাভ গুপ্ত

১৯৪৩ সনের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী স্বাধীন ভারত সরকার (অস্থায়ী) গঠন করবার খবর পেয়েই আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে (আজাদ হিন্দ্ সরকারের রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী) অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন ডি ভ্যালেরা (Eamon De Valere 1882—1975)। এই সরকারকে পূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও জানালেন ভ্যালেরা। এই স্বীকৃতি জানাবার অধিকার তাঁর ছিল কেননা ১৯৩২ সন থেকে তখনও তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী হয়েও বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি যে আপসহীন বিপ্লবী কর্মদ্যোগ শুরু করেছিলেন তাকে একটুও স্তিমিত হতে দেননি—নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে বিপ্লবী চেতনাকে আরো বেশি সুসংগঠিত করতে তিনি তখন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে চলেছেন।

আজাদ হিন্দ্ সরকার অর্থাৎ স্বাধীন ভারত সরকার 'অস্থায়ী' বলে চিহ্নিত হওয়ার কারণ সুভাষচন্দ্র আগেই (৪ জুলাই ১৯৪৩) সিঙ্গাপুরে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন 'ভবিষ্যতে একমাত্র স্বাধীন ভারতের জনগণই স্থায়ী সরকার গঠনের অধিকারী (পৃষ্ঠাঙ্ক ৯২৩, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৭)'। অস্থায়ী হলেও এই সরকারের একটি মন্ত্রিসভা ও পরিচালন সমিতি ছিল। লক্ষ্মী স্বামিনাথন (নারীসংগঠন মন্ত্রী), এ. সি. চ্যাটার্জি (অর্থমন্ত্রী), আজিজ মহম্মদ (লেফটেনাণ্ট কর্নেল), রাসবিহারী বসু (প্রধান উপদেষ্টা) প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এবং 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ (আন্দামান-নিকোবর)-এর স্বাধীন ভূখণ্ড নিয়ে প্রস্তুত হল আজাদ হিন্দ সরকার। প্রসঙ্গত বার্লিনে গঠিত আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের (মার্চ ১৯৪১—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩) যে বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন সুভাষচন্দ্র (আফ্রিকার যুদ্ধে বন্দী ভারতীয়দের ১৫ জনকে জেনারেল রোমেলের কাছে চেয়ে নিয়ে পরবর্তী প্রচেষ্টায় ১৫ সংখ্যাটিকে ২৫০০-এ পরিণত করে) সেই বাহিনীকে হিটলার

আবার যুদ্ধবন্দী করে এবং সাবমেরিনে জার্মানি পরিত্যাগের সময় (৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩) আবিদ মহম্মদ ছাড়া সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আর কেউ ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রের অপরাধ ছিল তিনি হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণকে সমর্থন তো জানানই নি বরং সোভিয়েতকেই সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন—তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ২৫০০ সৈনিকও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে (ওয়াইডম্যান গবেষণা, হ্যামবোল্ট) ১৯৭৩।

হিটলার ভেবেছিল নাজিতন্ত্র ফ্যাসিবাদ বিরোধী সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে আকস্মিক দুর্ঘটনা'য় মারা যাবেন (তদেব)। কিন্তু যে স্বাধীনতাসংগ্রামী বৃটিশ নজরবন্দী এড়িয়ে ভারতবর্ষ থেকে রাশিয়ায়—এবং রাশিয়া তখন সোভিয়েত গঠনের জন্যে কৌশলগত কারণে যুদ্ধে যোগ দেয়নি ব'লে রাশিয়া থেকে বার্লিনে (ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গঠনের জন্য) এসে উপস্থিত হয়েছেন—তাঁর পক্ষে আরেকটি দুর্গম পথে সগৌরব পাড়ি দেওয়া অসম্ভব হল না। রাসবিহারী বসু তাঁর হাতে একটি প্রস্তুত সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব দিয়ে দিলেন।

ডি ভ্যালেরাকে অবশ্য প্রথম থেকেই সংগঠনের কাজের ব্রতী হতে হয়েছে।

ভ্যালেরা তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে প্রথম যৌবনেই অতি নিঝুম ইস্টার আক্রমণ করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সেটি ১৯১৬ সনের ঘটনা। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে আগ্রহী সুভাষচন্দ্রের সেই ঘটনার বিবরণ জানা ছিল। 'Twentieth Century Conflicts' (হ্যামলিন ১৯৯৪ থেকে সে ঘটনার কিছু বিবরণ ঃ

At midday on Easter Monday, April 24th Patricle Henry Pearse, dressed in green uniform, stood on the steps of the GPO in Dublin and read out to a small and bewildered crOwd the proclamation of the Irish republic. His words signalled the beginning of a nationalists rebellion against British rule.

Although the risiag appeared on the face of things to have been a disastrous faileure, its leaders purpose—to

kindle the sparls of militant Irish nationalism into an unquenchable blaze—was achieved. It destroyed the basis on which, in the past, the Irish had negotioted with Britain for a degree of independence and it heralded the end of Seven Centuries of British dominance.'

For most of the second half of the 19, 'homerule' for Ireland had been the dominant political issue in British Parliament. Irish Nationalists like Parrell did not demand a fully independent republic and were not in sympathy with the Irish Republican Brotherhood (ancestors of IRA) which had launched an unsuccessful revolt in 1867, or later with militantly nationalist Sinn Fien. Home rule had finally been conceded and a bill passed in 1912, but it never went into effect because the outbreak of the war caused its postponement. The ultimate effect of the Easter Rising was to render it redundant.

The largest obstacle of Irish independence was the adamant hostility of the Protestant majority in most of Ulster. Its leader had threatened civil war rather than submit. Both sides had formed volunteer militia, and a breakway group of nationalist Irish volunteer led by Eoin Mac Neil formed the main force of the Easter rising (along with the Irish Citizen Army, a militant, nationalist workers organisation led by James Larking and James Connoly) Bloody Sunday massacre in Dublin.

The increasing civil violence in Ireland reached a new pitch on November 21 when, in three separate incidents, 28

people were killed in Dublin. IRA hit men murdered 14 Bailish officers and agents in their bedsin the early hour and 12 people died, shot or trampled upon, when British irregulars fired on a crowd in Croke Park.

Early in 1919 sinn Fien members of Parliament, who declined to take take their seats in the British House of Commons in Westminister, Set up their own Perliament of Ireland (Daiil Eireann). They declered Irish independence and elected De-Valera as President. The British authorities eventually closed this assembly down, but as they tried to maintain their grip on the country, more and more Sinn Fieners went to Prison, where several died on hunger strike, and Ireland elid stendily towards civil war. It began with isolated acts of violence but soon developed into more general guerrilla war, aggravated by the use of British irregulars, known as the Black and Tans (from their uniforms). Many atrocities were committed by both sides.

Irish Free State gained Independence : On December 6th, a treaty was signed prossiding for an autonomous republic in Ireland—the Irish Free State. Six countries of uleter (Northern Ireland) opted for continued union with Britain, an expedient accepted by Irish republicans as necessary but tempurary araangement.

A true in the Lummer had ened the guerilla warfare in Ireland, in which about 700 people had died, and the Free State treaty followed mouths of intense and often acrimorious negotiating. The precise border between

north and south was left to the decision of a comission the agreement represented the best compromise that could be attained at that time without full-scale war but proved to be burdened with future trouble—imminently for the Irish signatories (such as the IRA leader Michael Coliins, who remarked that he was also signing his death warrant), in the longer team for Britain and the people of Northern Ireland...

Michael Collins (currently a Govt. minister as well as commander-in-chief) was killed in ambush in Cork, on August 2, 1922. His death was one of many in thecivil strife which re-engulfed Ireland after the creation of the Irish Free State.

The Irish delegte had signed the Free State agreement as the only alternative to 'immediate and terible war'. The treaty came within a few votes of defeat in Dail Eireann, and the new state was given by civil war between those who supported the treaty (which left Irelands constitutional position some what vague) and those Sinn Fieaers like Eamon de Valera who opposed it for surrendering too much—not least the sin countries of Northern Ireland. The complete independence of the Iris Republic was not achiev-ed until in 1937, while the division of the country into North and South proved permanent.'

ডি ভ্যালেরার এই ইস্টার রাইজিং-এর ঘটনাটির বিবরণ বর্তমান গদ্য-প্রয়াসে করতে হল কেননা কোনো ভাবমূর্তিকে ব্যক্তিগত আবেগ দিয়ে উজ্জ্বল বা ম্লান ক'রে দেওয়ার প্রয়াস নিতান্ত বাতুল। অতএব নির্মোহভাবে তথ্য-আহরণ করতে হয়। এ ছাড়া আগেই বলা হয়েছে, ইস্টার রাইজিং-এর সংবাদের মাধ্যমেই সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথম ভ্যালেরার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্রের সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন।

অতএব সমস্ত কর্মসূচি যাচাই ক'রে নেওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র ডি-ভ্যালেরার সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডে ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারির 'কোনো একদিন' তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন।

'After meeting Bose, Valera had no hesiation to recognise Bose's nationalist zeal endloved vith his socialist attitude —জানিয়েছেন মিশেল কলিন্স তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিকথায় (যার পা-ডুলিপিই প্রকাশকের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় অবশ্য বৃটিশ মহাফেজখানা সমস্ত বাজেয়াপ্ত বই ও পাণ্ডুলিপি এখন পর্যন্ত সযত্ন সংরক্ষণ করে চলেছে ঃ সেখানে অজস্র বাংলা বইও রয়েছে)।

এই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ভ্যালেরা ও সুভাষচন্দ্রকে আরো কাছাকাছি নিয়ে এল। ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচে গেল মেধা ও প্রতিজ্ঞার নৈকট্যে। উভয়ের কাছেই সোভিয়েত যে একটি পরম আদর্শ ছিল তা সকলেরই জ্ঞাত। এ ছাড়া সমাজতন্ত্রের শত্রু পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদ নাজিতন্ত্র ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তখন সবচেয়ে সক্রিয় কর্মী রোমাঁ রোলাঁ—ভ্যালেরার সঙ্গে সংযোগ তো ছিলই এবার রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রেরও প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটল (আগস্ট ১৯৩৫)। 'মডার্ণ রিভিউ' (সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) পত্রিকায় অবিলম্বে, সুভাষচন্দ্র রোল্যাঁ-এর কর্মদ্যোগকে উচ্ছ্বসিত সমর্থন করলেন—যেভাবে করেছিলেন ডি ভ্যালেরা, যদিও ভ্যালেরা-সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎকার ঘটে পাঁচমাস বাদে—এবং রোল্যাঁর ফ্যাসিবাদবিরোধিতার জন্যে ভ্যালেরা সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে কোনো ফাঁক ছিল নাঃ 'Both had points of view (sharing earnestly with each other) including 1) Internationalism (with equal rights for all races and without distinction), ii) Justice for the exploiters and workless implying again that the fundamental fight is for a society without exploited—hence without the exploited, iii) Freedom for all supressed nationalities' iv) Equal rights for women and men (তদেব)'।

ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের, এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যাদি অনুসারে কর্মসূচিগত তফাত এই যে সুভাষচন্দ্র ইঙ্গো-মার্কিন জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করেছিলেন আর ভ্যালেরা ছিলেন নিরপেক্ষ। এই তফাতটুকুর রাজনৈতিক কারণ নিশ্চয়ই পাঠকের কাছে ধরা পড়বে, তবে বর্তমান তথ্য-সংকলনে তা আলোচ্য নয়। যেমন অনালোচিত রইল, অস্ত্রোপচারের জন্যে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে (১৯৩৫—১৯৩৬) সুভাষচন্দ্র কীভাবে রোল্যাঁ-ভ্যালেরার সঙ্গে দেখা করে আজাদ হিন্দের রাজনৈতিক দর্পণ তৈরি করেছিলেন। অনালোচিত রইল সুভাষচন্দ্রের সেই পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গ ও যেটি, লাহোর বিমানবন্দরে, কলিন্স-পাণ্ডুলিপির মতোই বৃটিষ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রচনাপঞ্জী

সংকলক ঃ রতনকুমার দাস
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা-৭৩

বাংলা বই ঃ

১। কোন পথে? সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুদিত; শিশির বসু সম্পাদিত। ২ খণ্ড। কলিকাতা, পত্রপুট।
১ম খণ্ড ঃ ১৯৭৩, ৩১৫ পৃ। ২৫'০০
২য় খণ্ড ঃ ১৯৭৪। ৩১৬ পৃ। ২৫'০০

২। চিঠি ঃ মেজবৌদিদিকে। কলিকাতা, নবারুণ পাবলিশার্স, ১৯৬০। ৪+৭২ পৃ। ২'০০
শরৎ চন্দ্র বসুর স্ত্রী বিভাবতী বসুকে লেখা ১৫টি চিঠি।

৩। তরুণের আহবান। কলিকাতা, জয়শ্রী প্রকাশন, ১৯৮৪। ১৪৪ পৃ। ১০'০০

৪। তরুণের স্বপ্ন। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২৩ সং; ১৯৯০। ১৫২ পৃ। ২০'০০ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২৮

৫। দিল্লী চলো। কলিকাতা, জয়শ্রী প্রকাশন, ১২'০০
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৪৬

৬। নূতনের সন্ধানে, ৪র্থ সং। কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৫২ পৃ।
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৩৩

৭। নেতাজীর বাণী ঃ ১৯৪২-১৯৪৫।
কলিকাতা, এস, সি, সরকার, ১৯৪৭। ১৯৩ পৃ।
নেতাজীর বেতার বক্তৃতা, বিবৃতি প্রভৃতির প্রামাণ্য সংকলন।

৮। পত্রাবলী ১৯১২-১৯৩২। কলিকাতা, এস, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৬৭। ৩০৮ পৃ। ২০'০০

৯। ফরওয়ার্ড ব্লক কেন এবং অন্যান্য রচনা। কলিকাতা, লোকমত প্রকাশনী, ১৯৯০। ৬৫ পৃ। ৮'০০

১০। বাঙ্গলার মা ও বোনদের প্রতি। ভূমিকাঃ বীণা দাস পূর্বাভাসঃ প্রসন্নকুমার পাল কলিকাতা, প্রসন্নকুমার পাল, মার্চ ১৯৪৬। ৩+৫০ পৃ। ১'০০ প্রথম প্রকাশঃ বেণু পত্রিকায় ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসে, এখানে ৫৩টি ছোট ছোট প্রবন্ধের সংকলন।

১১। ভবিষ্যৎ ভারত। কলিকাতা, জয়শ্রী প্রকাশন, ১০'০০

১২। ভারত পথিকঃ ১৮৯৭-১৯২১। কলিকাতা, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৭২।
ভারত পথিকঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী। সুভাষ সেন অনুদিত। কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৫। ১৯২ পৃ। ৮'০০

১৩। ভারতের মুক্তি সংগ্রামঃ ১৯২০-১৯৪২। কলিকাতা, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, ২ খণ্ড।
১ম খণ্ডঃ ২য় সং ১৩৭৭
২য় খণ্ডঃ ১৯৭৫

১৪। মুক্তি সংগ্রাম। ১৯৩৫-১৯৪২। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৫৩। ১০৮ পৃ।

১৫। রাধাকৃষ্ণ পালকে লেখা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর একটি অপ্রকাশিত পত্র। অন্তর্জগৎ, ১৩৮৯ আশ্বিন, পূজা সংখ্যা, পৃ ২

১৬। সমগ্র রচনাবলী। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮০-১৯৯২।
১ম খণ্ডঃ ১৯৮০। ৩৫'০০
২য় খণ্ডঃ ১৯৮৩। ৩০'০০
৩য় খণ্ডঃ ১৯৮৭।
৪র্থ খণ্ডঃ ১৯৯২। ২৫২ পৃ। ৫০'০০

১৭। স্মরণীয় বরণীয়। কলিকাতা, জয়শ্রী প্রকাশন, ১৯৮৫। ৯৩ পৃ। ৭'০০

১৮। সুভাষ বসু, ১৯৩৯-৪০; নৃপেন চক্রবর্তী, ইংরাজী হইতে অনুদিত। কলিকাতা, ফরোয়ার্ড পাব, কনসার্ন ১৯৭৫। ১৫৬ পৃ। ৮'০০

১৯। সুভাষ রচনাবলী; সুনীল দাস সম্পাদিত। কলিকাতা, জয়শ্রী প্রকাশন, ১৯৮৪। ১ম খণ্ড-৬ষ্ঠ খণ্ড। ২১০'০০

Books (English) Writings of Subhas Candra Bosu

20. All power to the Indian people ; 1939-1940. Compiled by the Forward Bloc office, Calcutta,
21. Atlas of Fight for Freedom, ed. by. Sivaprasad Das-Gupta. Calcutta, Sree Guru Library.
22. Blood Bath. ed. by Narayan Menon, Singapore, The Indian Independence League, 1944.
23. Boycott of British Goods. ed. by Hrishikesh Chatterjee, Calcutta, Sree Adwait Press, 1929.
24. Correspondence : 1924-1932 : Collection of Letters. Calcutta, Netajee Research Bureau, 1967. 432 P.
25. Crossroad : being the works of 1938-'40, Bombay, Asia Publishing House, 1962. 367 p.
26. Dreams of a Youth, original Articles and Letters in Bengali, transl, into English, by prof. Hirendranath Datta, Calcutta, Bhubonmohan Majumdar, 1947.
27. Famous Speeches and Letters of Subhas Chandra Bose. ed. by Ganpat Rai, Lahore, Lion press, 1946.
28. Important Speeches and Writings of Subhas Bose. ed. by. J.S. Bright, Lahore, The Indian printing Works, 2nd ed. 1947.
29. Impressions in Life ; Lahore, Hero Publications, 1947.
30. (An) Indian Pilgrim ; or Autobiography of Subhas Chandra Bose, 1897-1920. Calcutta, Thacker, Spink & Co., for Netaji Publication Society, 1948. VII, 144p. plate. 5.00
31. (An) Indian Pilgrim : an unfinished autobiography and Collceted Letters, 1897-1921. Bombay, Asia Publishing House, 1965. 199p.

32. (The) Indian Struggle, 1920-1934 Calcutta, Thacker, Spink and Co. for Netaji publication Society, 1948. ii, 440p. 10.00

33. (The) Indian Struggle ; 1920-1942. compiled by the Netaji Research Bureau, Calcutta. Bombay, Asia Publishing House, 1964. 476p.

34. Inportant Speeches and Writings of Subhas Bose. ed. by Jagat S. Bright. Lahore, The India Printing Works, 1946. Vi, 336p. plate. 6.50

35. In quest of the New, transl-by N.C. Chatterjee. Calcutta, Sree Guru Library, Several eds. in Bengali, Hindi and Tamil.

36. La-Lotta-Dell India,1920-1934. ed. by. G. C. Sansoni. Vienna, 1942.

37. (The) Mission of Life, ed. by, Gopal Lal Sanyal. Calcutta, Thacker, Spink and Co. 1953. VI, 238 p. 7.00

38. (The) Mission of Life, transl. by, H. Datta, combined ed. of two Previous Publications-Dreams of a Youth and In quest of the New, Gopal lal Sanyal, ed. Calcutta, Thacker, Spink and Co. 1953.

39. Netaji : Collected works vol. 1 : The Indian Pilgrim and Letters 1897-1921. ed. Sisir Kumar Bose. Calcutta, Netaji Research Bureau, 1980. 280p. 30.00
Vol. II : The Indian Struggle 1920-42. ed. Sisir Kumar Bose Calcutta, Netaji Research Bureau 1981. 418p. 30.00

39. Vol. III : Correspondence 1922-'26. ed. by. Sisir Kumar Bose. Calcutta, Netaji Research Bureau, 1981. 344p. 30.00

Vol. iv : Correspondence 1926-1932 ed. by. Sisir Kumar Bose, Calcutta, Netaji Besearch Rureau, 1982. 350p. 30.00

Vol. V : Statements, Speeches, Prison Note Book and Boycott of British Goods 1923-29. ed. by. Sisir Kumar Bose, Calcutta, Netaji Research Bureau, 1985 370p. 30.00

Vol. VI : Correspondence, Statements, Speeches 1924-32. ed. by. Sisir Kumar Bose Calcutta, Netaji Research Bureau, 1987 . 270p. 50.00

40. Netajis Life and Writings : Autobiography by Subhas Chandra Bose 1897-1920. Calcutta, Thacker, Spink and Co, 1948.

41. Netaji Speaks : A collection of Speeches and Writings, Calcutta, Jayasree Prakashan, 1973. 5.00

42. Netaje Subhas Chandra Bose : Correspondence and Selected documents 1930-1942. ed. by. Subhas Bhattacharya, Calcutta, International Books, 1990. 166p. 45.00

43. Netaji's Letters to his nephew. New Delhi, Arnold, 1992. 126p. 75.00

44. On to Delhi. ed. by. K. M. Tamhankar. Bombay, Phoenix Publications, 1946. VIII, 142p. Plate. 3·00

45. On to Delhi : Collection of War Time Speeches. ed by. Narayan Menon, Singapore, The Indian Independence League, 1944.

46. On to Delhi, or Speeches & Writfngs of Netaji Subhas Chandra Bose. ed. by G. C. Jain. Delhi, Saraswati Pustak Mandir, 1946 156p. plate, 5.50

47, On with the Fight, ed. by. Narayan Menon, Singapore The Indian Independence League, 1944.

48. Revolution—What is it ? Substance of an ex-tempore Speech delivered in Hindustani, Calcutta, 1946.

49. Selected Speeches, ed. by. S. A. Ayer. Delhi, Publication Division, Govt, of India, rev. ed. 1074. 239p.

50. Speeches, Series 7 Bangalore. 2nd ed. Azad Publications.

51. Subhas Chandra Bose ; Correspondences 1924-1932. Calcutta, Oxford University Press, 1967. 432p. 17.50

52. Swadeshi and boycott. Calcutta, Liberty News papers, 1931. IX, 35p. o. 75p.
(Bengal Swadeshi League, Research Section, Bulletin-1)

53. Testament of Subhas Bose. comp. and ed. by Arun. Delhi, Raj Kamal Publication, 1946. XIII, 275p. 7.50
(A complete and authentic record of Netaji's broadcast Speeches, Press Statements, 1942-45)

54. Through Congress eyes. Allahabad & London, Kitabistan, 1938. VIII, 243p. 2.50 Collection of Speeches and Writings.

55. Total Mobilization in East Asia. ed. by. Narayan Menon. Singapore, The Indian Independence League ; 1944.
(Articles, addresses, Statements etc.)

56. Act quickly. Forward Bloc, 18 may 1940.
(On present international crisis and appeals to Indians to rise to the occasion)

57. Address at the conference of the Indian Independence League. 21 October 1943.

58. Address at Dublin, 10 February 1936.

59. Address at Hazra Park, Calcutta 16 May 1939.

60. Address at the Private Conference of Industrial and Political Leaders of the Labour Party. London, January 1938.

61. Address at a public meeting at Howrah, 8 may 1939.

62. Address at Rangpur, Rangpur.

63. Address at Silver corn Royal Theatre. Bangkok, 15 may 1943.

64. Address in Delhi. 12 Oetober 1939.

65. Addres in Malaya 6 September 1943.

66. Address, The Indian Situation in East Asia. 10 July 1944.

67. Address to the Indians in East Asia. 30 July 1943.

68. Address to the Students of Imperial University, Tokyo. November 1944.

69. After Paris. Foward Bloc, 15 June, 1940 (On Nazi aggression.)

70. American Imperialism. Broadcast from Berlin on 15 October 1942.

71. An Appeal to National Unity. The Forward Bloc, 11 May 1940.

72. The Axis Powers and India. Broadcast from Berlin on 1 May 1942.

73. The Axis Powers are our Friends. Broadcast from Berlin on 13 march 1942.

74. Bose's Message on the occasion of the 20th anniversary of the Blood Both of Amritsar. Read on 13 April 1943.

75. Boses Speech on the occasion of foundation of the Indo-German Society in Humburg. Azad Hind, no. 7/8, 1942 p. 7-11.
76. Bose's Statement at Konan Club. 28 October 1943.
77. Britain is Doomed. Broadcast over Berlin Radio on January 1943.
78. Britain's Burma Policy. Broadcast from Singapore on 25 June 1945.
79. Call off the drive against the left-wing. Adopt a bold and dynamic policy : replies to Gandhiji and Rajendra Prasad. Forward Bloc, 4 November 1939.
80. Carry on the Struggle. Broadcast over the provisional Government of Radio. Singapore on 28 June 1945. This Speech was originally broadcast in Bengali of which this is translation.
81. Come to Nagpur. Forward Bloc, 14 June 1940.
    On Forward Bloc's All-India Conference.
82. Comment on First Wavell offer. Statement broadcast by the provisional Government of Azad Hind Broadcasting Station Saigon on 18 January 1945.
83. Congress and communal organisations. Forward Bloc 4 May 1940
    States that Forword Bloc does not regard the communal organisation as untouchable.
84. Congress and foreign contacts. B. u. pseud. Forward Bloc, 26 August 1939.
    এই লেখাটা খুব সম্ভব সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা। নামের আদ্যক্ষর দেখে মনে হয়।
85. Co-operation with Japan. Broadcast from Singapore on 26 June 1945.

86. The Correct line. Forward Bloc, 23 December 1939. on Congress indecision.
87. Countrymen ! Keep fighting. Broadcast over Azad Hind Radio Germany on 31 Augast 1942.
88. Cripps Imperialist Hypocrisy. Broadcast over Azad Hind Radio, Germany on 25 March 1942.
89. Dacca conference to Give lead : appeal to Bengal Congress workers, Forward Bloc, 18 May 1940.
90. Danger ahead. Forward Bloc, 6, January 1940
    On leftist move of congress working committee for a Constituent Assembly.
91. Deepening Crisis, Forward Bloc, 31 August 1940.
92. Europe Today and Tomorrow, Modern Review, 1937.
93. Fight between forces of reaction and progress. High Command for compromise-drive against leftists. Forward Bloc, 3 February 1940
    Bose's Speech at a Calcutta rally.
94. First Bit of Free Indian Soil. Broadcast from Rangoon on 9 July 1944.
95. The first I. N. A. Proclamation on entering India 1944.
96. First Speech from Tokyo Broadcast on 21 June 1943.
97. France. Forward bloc, 26, October 1940.
98. Free India and her Problems. Azad Hind, 9 August 1942 P. 1 – 9.
99. Freedom comes to those who dose and act. Forward Bloc, 6 January 1940. Bose's speech at all-India Students conference in Delhi.
100. Freedom is at Hand. Broadcast from Berlin on 1 March 1943.

101. The Freedom of India…necessary for the whole World. The Azad Hind, 4 June 1942 P 48.

102. Friend of India in Poland. Stanislaw F. Michalski. Modern Review, 1936 April, P. 452-453.

103. Gandhi-Jinnah meeting.
Broadcast from some where in Burma on 12 September 1944.

104. The German Defeat : a statement issued by Netaji as broadcast by the provisional Government of Azad Hind Radio, Singapore on 25 May 1945.

105. He appealed to Germans and Italians for the cause of Indian Independence. 22 June 1943.

106. He appealed to Indians over Radio Tokyo for the cause of Indian Independance. 21 June 1943.

107. Heart Searching. Forward Bloc, 28 October 1939 Bose on Resolution passed by Forward Bloc at Wardha and the contents of which were passed on to the A. I. C. C.

108. He broadcast after the A. I. C. C. resolution was passed in Bombay for the quit India movement from Berlin, 8 August 1942.

109. He rediculed the British authority which charged him with being an enemy agent, from Berlin 1 May 1942.

110. He warned his countrymen on the issue of Pakistan. 12 September 1944.

111. His broadcast, an "open letter" to Sir Stafford Cripps, from Berlin. 31 March 1942.

112. His broadcast over the Nanking (China) Radio 20 November 1943.

113. His first broadcast to the World over the Azad Hind Radio after the fall of Singapore, from Berlin, 19 February 1942.

114. His message to the Japanese, 28 June 1943.

115. Holwell must go. Forward Bloc, 29 June 1940.

116. Homage to Mother of the Indian People, Statement issued by Netaji on the death of Shrimati Kasturba Gandhi on 22 February 1944.

117, India's Day of Independence.-Broadcast from Berlin on 26 January 1943.

118. I am a Revolutionary. Broadcast from Singapore on 27 June 1945.

119. The I. N. A. is Ready. Broadcast from Singapore on 1 January 1944.

120. Indian National Army.
Rangoon Radio on 8 January 1944.

121. Indian National Army. Special order of the day. Supreme Commander, Azad Hind Fauz, Burma. Dated the 9th February 1944.

122. Indian National Army. Rangoon Radio on 21 May 199.

123. Indian National Army. Supreme Commander, Azad-Hind Fauj, Burma, 14 th August 1944.

124. Indian National Army. Free India Radio, Saigon on 18 August 1944.

125. Indian National Army. Berlin Radio on 30 August 1944.

126. Indian National Army. Shonan Broadcasting Station Singapore, on 2 January 1945.

127. Indian National Army. Supreme Commander, Azad Hind Fauj, Burma, on 13 March 1945.

128· Indian National Army. Shonan Broadcasting Station Singapore, on 14 June 1945.

129. Iudian National Army. Voice of India Radio, Rangoon, on 18 June 1945.

130. Indictment of Britain. Speech broadcast over Berlin Radio on 19 March 1942.

131. International Relations, Azad Hind, 9 August 1942. P-9

132. Interview with Mussolini 1934.

133. Is it fair ? Forward Bloc, 8 June 1940.
(On Forward Bloc which have to face tremendous hurdles including criticism.

134. Japan's roll in the Far East, Modern Review, 1937.

135. Join Forward Bloc. Forward Bloc, 19 August 1939.
(on disciplinary action Taken against Bose by Congress Working Committee.)

136. Labour in Jamshedpur. The other side of the picture. Modern Review, 1936. Lebruary, P 159-163

137. Leaders misleading. Forward Block, 30 December 1939.
(Bose alleges that the national demand of a Government having been whitheld down)

138. Longlive Deshbandhu. Forward Bloc, 15 June 1940.

139. Looking back, Forward Bloc, 4 November 1939
(Tracing history of Congress from Haripura session to drive against Left.)

140 Manifest Statements Azad Hind, 1942.

no. 3 P. 9—13

no. 4 P. 14—19

no. 7-8 P. 1—7

no. 11—12 P. 1

141. March Forward. Azad Hind, 19 January 1944.

142. A message to Germans. Broadcast from Tokyo on 22 June 1943.

143. Message to the officers and men of the Azad Hind Fauj. Azad Hind, 5 June 1944.

144. Miscellaneous Statement. Singapore Radio on 15 August 1941.

Berlin Radio on 12 September 1942 and 6 October 1942 and 7 October 1942 and 15 October 1942. Azad Hind Radio Singapore on 16 June 1943 Free India Radio on 23 June 1943 in Tamil.

Berlin Radio on 28 June 1943, Tokyo Radio on 28 June 1943 in Japanese Free India Radio Saigon on 4 July 1943 in Tamil. Singapore Radio on 4 July 1943. Tokyo Radio on 4 July 1943 in English.

148. Singapore Radio on 5 July 1943.

Rome Radio on 9 July 1943 in Hindustani.

Singapore Radio on 9 July 1943 and 13 July 1943.

Bangkok Radio on 18 July 1943 and 28 July 1913.

Free India Radio Saigon on 30 July 1943 in Tamil and 31 July 1913 .

Bangkok Radio on 6 August 1913 Rangoon Rapio on 8 August 1913.

Berlin Radio on 26 August 1943.

Rangoon Radio on 20 August 1943 Azad Hind Radio, Germany on 25 August 1943 in Tamil.

Singapore Radio on 25 August 1943.

Berlin Radio on 26 August 1943.

Rangoon Radio on 30 August 1943 and 31 August 1943.

Singapore Radio on 6 Septomber 1943 and 8 September 1943 and 3 October 1943,

Indian independence League Radio Singapore on 21 October 1943 in Hindustani.

146. Singapore Radio on 21 October 1943 and 23 October 1943.

Indian Independence League Radio Singapore on 24 October 1943.

Free India Radio Saigon on 25 October 1943 in Hindustani.

Tokyo Radio on 8 November 1943

Batavia Radio on 12 November 1943.

Tokyo Radio on 16 November 1943 and 18 November 1943

Nanking Radio on 24 November 1943.

Singapore Radio 7 December 1943.

Free India Radio Saigon on 27 February 1994

Rangoon Radio on 25 March 1944 and 17 April 1944.

Berlin Radio on 20 June 1944 in Bengali.

Tokyo Radio on 4 July 1944.

Singapore Radio on 10 July 1944.

Domei News Agency on 21 July 1944.

Berlin Radio on 12 August 1944.

Free India Radio Saigon on 13 August 1944.
Berlin Radio on 18 August 1944 .

147. Rangoon Radio on 21 August 1944.
Domei News Agency on 3 November 1944 and 4 November 1944
Free India Radio Saigon 4 November 1944.
Tokyo Radio on 4 November 1944 and 7 November 1944 in Hindustani and 1 January 1945.

148. My strange illness. Modern Review, 1930 April, P. 462-467.

149. National Unity. Azad Hind, 9 August 1942 P. 5

150. The Need of the hour. Forward Blac, 26 August 1939 (only a free India can should be in the event of war—)

151. Need of Stock Taking. Forward Bloc. 24 August 1940.

152. (A) New Age is Dawning. Speech broadcast over Azad Hind Radio a North German Station on 11 March 1 942.

153. The New Awakening. Azad Hind, 9 August 1942 P. 1

154. The New Parade. Forward Bloc, 27 April 1940 (Stalemate in Indian Political Situation.)

155. No compromise on Independence. Broadcast from Singapore on 19 June 1945.

156. No Compromise with Britain. Broadcast from Singapore on 24 June 1945.
Summary of a speech delivered by Netaji at a mass-rally of Indians in Singapore on 24 June 1945. This Summary was broadcast to listeners in India by the

provisional Government of Azad Hind Radio Station the same night.)

1 7. On the future constitution and policy of Congress. Modern Review, 1935 October, P 490.

158. On Presidents, advice. Forward Block, 28 October (on resignation of Congress Ministries).

159. Open letter to Cripps. Broadcast over Azad Hind Radio. Germany on 31 March 12.

160. Our critics. Forward Bloc, 14 August 1939 (Bose on criticism hurled at the Forward Block.

161. Our Internal and External Policy. The Indian Struggle. 1935. (Full Text of Statement issued from Geneva in February 1935.

16?. Our needs and our duties, National front, 23 October 1638

163. Our Problem. Forward Bloc, 20 January 1940 (on Forward Bloc conference held in Bombay)

164. Our working committee. Forward Bloc, 2 December 1939

165. Parting message, Modern Review, 1933 March, P 356

166. Passing through Cairo. Modern Review. 1935 April, P- 426-431.

167. The Political Situation in India. Broadcast over Azad Hind Radio, Germany on 10 April 1942.

168. Presidential address Modern Review, 19 0 April, P. 376-377.

169. Presidential address by Snbhas Chandra Bose. 51 st Session, Haripura, 1938, in Report of the Annual Session, 51 st, 1938, INC, Haripura. P. 161-195. (comments on differences between right and left within the Congress and calls the people to rally under the banner of INC to fight the imperialist rule.)

167. Presidential address by Subhas Chandra Bose, 52nd Session, Tripuri, 1939 in Report of the Annual Session, 52nd, 1939, INC, Tripuri, p. 61-68
(Stresses on Sinking diferences to fight the British imperialists.)

168. Presidential Speech. All India Anti-compromise conference, Ramgarh, 19 March 1940, All-India Forward Bloc conference, Nagpur, 18 June 1940, Maharashtra provincial conference, poona.
Third Indian political conference. Friars Hall, London 10 June 1933.

169· Press Statements, Berlin Radio on 19 June 1942 and
170. Tokyo Radio on 19 June 1943, Berlin Radio on 28 June Free India Radio Saigon on 3 July 1943.
Bangkok Radio on 30 July 1943 Berlin Radio on 7 August 19 and 21 October 1943.
Ajad Hind Radio Singapore on 26 October 1943.
Tokyo Radio on 3 November 1943 in Hindustani and 5 November 1943.
Free India Radio Saigon on 24 November 1943 in Tamil and 17 January 1944 Rangoon Radio on 17 April 1944 and 28 April 1944 and 18 May 1944 and 21 May 1944.
Berlin Radio on 22 May 1944 and 21 June 1944 in Bengali.
Azad Hind Radio Singapore on 9 July 1944.
Tokyo Radio on 5 August 1944.
Free India Radio Saigon on 26 October 1944 and 27 October 1944.
Azad Hind Radio Singapore on 28 October 1944.

Tokyo Radio on 7 November 1944 and 8 November 1944.

Rangoon Radio on 2 January 1945.

171. The proclamation of the provisional Government of Azad Hind 4 April 1944 Azad Hind, 3 April 1944.

172. Pros and cons of office acceptance. Modern Review, 1944 August, P. 121–12o.

Ramgarh. Forward Bloc, 13 January 1940.
(Ramgarh Get-together in face of Rightists Red Politcal in fighting the leftists with non-violence in their lips.)

173. Reflections on the Wavell offer. Broadcast from Singapore on 22 June 1945.

174. Reject the Wavell offer. Broadcast over the provisional Government of Azad Hind Radio Singapore on 23 June 1945.

175. Reminder. Forward Bloc 16 December 1939.
(on the role of Forward Bloc)

176. Reply to the Japanese Prime Minister Tojo. Azad Hind 3 April 1942
(on the fall of Singapore and Rangoon)

177. Report to Gandhiji. (This is the full text of a message to Mahatmaji which Netaji broadcast over Rangoon Radio on 7 July 1944.

178. The Role of Forward Bloc. Forward Bloc, 12 August 1939.

179. Scheme of Provisional National Government, Hindus and muslims to put forward joint demand. Forward Bloc, 15 June, 1940.

180. Second I. N. A proclamation on entering India. 4 April 1944.

181. S Silver dining. Broadcast from Singapore on 2o uune 1945.

182. The Situation in Burma. Statement on the Burma Situation broadcast by the I. N, A Army Headquarters Radio Singapore on 26 May 1945.

183. The Situation in India Azad Hind, 5 June 1942. P. 45-54.

(Article written before the meeting of A. I. C. C on 7th August and the arrest of Mahatma Gandhi and other leaders on 9th August.)

184. The Situation Today. Broadcast from Berlin on 7 December 1942.

185. Speaks on the occasion of India's Independence Day. Azad Hind, 2, 1944.

(Bose is sanguine of the ultimate defeat of the enemy and the I. N. A. no puppet army of the Japanese is stated catagoricaly.)

186. Speeoh at the Calcutta Congress. Calcutta, December 1928.

187. Speech at the central provinces Youth Conference, Nagpur, 29 November 1929.

188. Speech at Lahore Congress, Lahore, December 1929,

189. Speech at Syonan.

Proclamation of the provisional government of Azad Hind, 21 October 1943.

190. Speech following the proclamation of the provisional Government of Azad Hind. 21 October 1943

191. Speech in Berlin. 26 January, 1943
192. Speech in East Asia. 12 July 1944
193. Speeches in East Asia. Azad Hind, 7 August 1943.
(Tokye Speech—carry on the fight for liberty inside, India and outside India.)

194. Statement. Azad Hind, 9 October 1944.
(Bose Still belives that Germany is invlinsible, Also- Statement on compromise Statement on Gandhi-Jinnah talks—on the eve of a new offensive)
195. Statement, Azad Hind, 11 February 1942.
(Bose States that Axis power is mighty and opening of the Second Front in Europe has failed miserably also states that India and the countries of the near east have a common role to play.)
196. Statements 11 December 1944 (on Japanese victory ; Bose's message to Adolf Hitler ; message to the members of the I, N. A. in Europe ; Azad Hind war council.)
197. Statements. Azad Hind 1 February 1943.
(On World Situation ; U.S.A. and India ; prophesies the fall of the British Empire ; Calcutta bombing ; Advises People of Bengal to make more Sacrifice.)
198. Statement. Azad Hind, 3 April 1942.
(Stafford Cripp's mission and India's political Situation by Bose over Berlin Radio.)
199. Statement on Disciplinary Action. The Forward Bloc. 19 August 1939.
200. Statement on the march to Delhi. Azad Hind, 3 April 1944.

(Also on the death of Madame gandhi ; [on the Suceess of the Japanese and I. N. A. ; on the beginning of the National week on 6 april 1944.)

201. Statement, our Internal and External policy. from Geneva, February 1935.

202. Statement over Berlin Short-wave Station. Azad Hind 5 June 1942.
(on rejecting the impending offer of Sir Stafford Cripps and Gandhiji having risen to the occasion according to Bose.)

203. Statement to the world press. Azad Hind, 5 June 1942. p. 1-8 (Address to the world press on his arrival in Beriin.)

204. Stem the rot. Forward Bloc, 10 February 1944.
(on rumours of persistent efforts at a compromise between the Congress High Command and the British Govt.)

205. Storm in Sanghai, Forward Bloc, 27 January 1939.

206. Task before the country. Forward Bloc, 29 June 1940.

207. Thank you Japan ! Broadcast over Azad Hind Radio Germary on 6 Aaril 1942.

208. This belated effort is bound to fail-on war resolution of A. I. C. C. Forward Bloc, 14 October 1930

209. Time for armed struggle has come. Spcech delivered Shonan (Singapore) on 4 July 1943.
(This is the full text of a Singapore Broadcast by Netaji in Hindustani. On 4 July 1943, Netji was unanimously elected president of the Indian Indepen-

dence League ; and in this broadcast Netaji broadcast a summarised version of the spcech he had made earlier that day at the meeting of the Indian Indepndence League.

210. Wake up, India ! Forward Bloc, 11 May 1940.

211. We shall fulfil our promise. Broadcast from Singapore on 1 January 1944.

(This New year Message was translated into Hindustani and broadcast to India by the provisional Government of Azad Hind Radio.)

212. Welcome speech to the Prisoners from Italy, June 1942.

213. Wavell offer exposed. Broadcast from Singapore on 20 June 1945.

214. Whither the Baltic States. Forward Bloc, 27 July 1940.

215. Whither High command ? Forward Bloc, 18 November 1939.

(Editorial on indecision of the Congress to guide the Nation with the beginning of war.)

216. Why Forward Bloc : Editorial. Forward Bloc, 15 January 1939 and 15 August 1939.

217. Widen and intensify Struggle on Slogan all power to Indian people. Forward Block, 29 June 1940.
(Presidential address of Bose at Nagpur conference of Forward Bloc.)

218. Whom they fight ? Eorward Bloc, 25 November 1939 (Editorial on the Congress working committec for an honourable settement with the British Government.)

নীলিমা সেন স্মরণে

"স্নেহের নীলিমা, একটা কথা তোমাকে জানাবার আন্তরিক প্রয়োজন বোধ করছি। অনেক দিন আগেই জানানো উচিত ছিল। 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার' আমার অসাধারণ ভাল লেগেছে। গানটি কথায় ও সুরে আশ্চর্য মহিমান্বিত। মনে হল সবটুকু মহিমা ও বেদনা রূপ পেয়েছে তোমার গাওয়াতে। আবারো বলতে ইচ্ছে করছে You have surpassed yourself। বার বার এই কথা বললে ফিকে শোনায়। তবে সত্যের রঙ যদি ফিকে হয়, তাকে সাহিত্যের ভাষায় রঙিন করতে গেলে তা কম সত্য হয়ে যাবে।"

অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবের নীলিমা সেনকে লেখা (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) অপ্রকাশিত এই চিঠিটি শিল্পীর মেয়ে নীলাঞ্জনার কাছ থেকে পেয়েছি। তার থেকেই একটি অংশ উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মরমী শিল্পী নীলিমা সেনকে স্মরণ করছি।

নীলিমা সেনের কণ্ঠ ছিল সুমধুর ও সূক্ষ্ম। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গে এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা মেশানো থাকত আবার এটাই তাঁর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানকে, বেদনার গানকে সংলগ্ন করে তিনি আনতে পারতেন এক অসাধারণ দুর্লভ অনুভূতি। আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর এক বিশেষ নিবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান' নিবেদন করেছেন "শ্রীমতী নীলিমা সেন শ্রদ্ধাস্পদেষু"—এই বলে।

নীলিমা সেনের জন্ম কলকাতায়। ১৮২৮ সালের ২৮ এপ্রিল। ছয় বছর বয়সেই চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। শৈশব থেকেই গানের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। স্কুল—পাঠভবনের পড়া শেষ করেই চলে আসেন সঙ্গীত ভবনে। সেখানে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন। এস্রাজ বাজানো শেখেন অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওস্তাদ—ভি. ভি. ওয়াজেলওয়ারের কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের স্নাতক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেন তদানীন্তন শিক্ষাভবনে। ১৯৫১ সালে স্বামী অমিয়

সেনের সঙ্গে নীলিমা সেন আমেরিকা যান। সেখানকার নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে সোস্যাল সায়েন্স, ও রেডক্রশ আয়োজিত ফার্স্ট-এইড-এ সার্টিফিকেট পান। জীবনের স্মরণীয় ঘটনা প্রসঙ্গে বলতেন—প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র প্রতিকৃতির উন্মোচনে শিক্ষক শৈলজারঞ্জনের নির্দেশে 'তুমি কি কেবলি ছবি' গানটি গাওয়ার কথা। একই সঙ্গে স্মরণ করতেন মাস্টারমশাই নন্দলালের কথা। "বসন্ত" গীতি আলেখ্যের নাচের জন্য স্টেজে ওঠার সময় নন্দলাল তাঁর হাতে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রদীপটি হাতে নিয়ে 'ধীরে ধীরে বও উতল হাওয়া' গানটি গাইতে গাইতে তিনি নেচেছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময়েই নাচে গানে অভিনয়ে খেলাধূলায়—বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে আশ্রমের সকলের দৃষ্টি ছিল ছোট্ট আশ্রম বালিকা নীলিমার প্রতি। 'ডাকঘর' নাটকে অমলের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন শিল্পী নীলিমা। তখন তাঁর বয়স আট কি নয়। ঠাকুরদার ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মহড়া চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ নিজেই নীলিমাকে দেখিয়ে দিতেন অভিনয়ের বিভিন্ন কলাকৌশল। রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিনয় শিক্ষার এক দুর্লভ সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। তেরো বছর বয়সে নীলিমা সেন উদয়নের বারান্দায় কবির শেষ জন্মদিনে শান্তিদেব ঘোষের বাজানো এস্রাজের সঙ্গে গাইলেন 'গানের ঝরণাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে'। একক গান গাওয়ার যে সুযোগ সেদিন তিনি পেয়েছিলেন তা ছিল তাঁর সারা জীবনের গান গাওয়ার পাথেয়। সেদিন সেই গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথের চরণ স্পর্শ করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন।

১৬ বছর বয়সে নীলিমা গুপ্তের প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড। দুটি গান—'আমার দোসর যে-জন ওগো তারে' এবং 'বুঝি বেলা বয়ে যায়'। সেই বয়স থেকেই বেতারে গান গাওয়া। দূরদর্শনেও তিনি নিয়মিত গান গেয়েছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করতে বেশ কয়েকবার তিনি বিদেশে গিয়েছেন। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডে বার বার, শেষ বার ১৯৯২ সালেও বাংলাদেশে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মদিনে গিয়েছিলেন ব্রহ্মদেশে।

কলকাতার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন 'সুরঙ্গমার' অন্যতমা প্রতিষ্ঠাতা নীলিমা সেন—সেখানে গান শিখিয়েছেন। কিছুদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৭২ সাল থেকে তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনে। সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের অধ্যাপিকা, বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যক্ষ পদে ছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁরই প্রচেষ্টায় সেখানকার ড্রামা ইউনিট—কাজ শুরু করে। ১৯৯৩ সালের সেখান থেকে অবসর নেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ 'সুরের গুরু'র স্বামী অমিয়কুমারের সঙ্গে তিনিও ছিলেন যুগ্ম লেখিকা।

১৯৯৩ সালের শেষ দিকে নীলিমা সেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতায় ও মাদ্রাজে তাঁর চিকিৎসা হয়। তাঁর স্বদেশ ও বিদেশের গুণগ্রাহীরা সহানুভূতি ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁরা চান নীলিমা সেন সুস্থ হয়ে আবার গান শুরু করুন। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধিতে কিডনি কাজ না করায় ১৯৯৬-এর ২৮ জুন কলকাতায় মাত্র ৬৮ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নীলিমা সেন সারা জীবন ছিলেন বিরল প্রকৃতির একজন আত্মনির্ভরশীল শিল্পী। তাঁর মানবিক সত্তা যেন তাঁর শিল্পী সত্তাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

তাঁর জীবনের আর একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। ১৯৪৫ সালে শেষবারের মতো গান্ধীজী শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসেছিলেন। সেবার শান্তিনিকেতনের আশ্রম মন্দিরে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীর জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রিয় গান "জীবন যখন শুকায়ে যায়" শোনালেন নীলিমা সেন। গান্ধীজী নীলিমার গান শুনে তৃপ্ত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এই গানটি প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ৮ই ডিসেম্বর অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবের লেখা একটি অপ্রকাশিত চিঠির অংশ (নীলাঞ্জনার কাছে পাওয়া) উল্লেখ করছি। তিনি তার স্নেহের নীলিমাকে লিখছেন,—"পরশুদিন রেডিয়োতে তোমার গান শুনে বড়ো নির্মল আনন্দ পেলাম—আবারো, আরো একবার। সকালের আসরে প্রথম গানটি খুব ভালো লেগেছিল এবং শেষের কীর্তনাঙ্গ গানটি। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' —কে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ গানের তালিকায় ফেলতাম না এতদিন। কিন্তু তোমার কণ্ঠে শুনে বড়ই Moved হলাম। তুমি কত ভুল আমার ভাঙলে এমনি করে।"

দেবী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন

চিত্তদা নেই

চিত্তদা নেই। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। অধ্যাপক। নাট্যকার। গল্পকার। প্রাবন্ধিক। সম্পাদক। গত শনিবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তাঁর জীবনাবসান হল। রেখে গেলেন অতি বৃদ্ধা মা আর সন্তানহীনা স্ত্রীকে। ৬৬ বছর কি সত্যি সত্যি চলে যাওয়ার বয়স?

খুব মনে পড়ে। ১৯৫৩। স্কটিশ চার্চ কলেজে আই এ পড়ি। চাঁদছোঁওয়া গ্যালারিঅলা হলে বিশেষ বাংলার ক্লাশ নিতে এলেন এক টকটকে গৌরবর্ণ তরুণ। প্রথম ক্লাশ নিচ্ছেন একদম অনভ্যস্ত পরিবেশে, তাই মুখময় গোধূলির আভা। মাথা উঁচু করে একবার গ্যালারির শেষ অবধি তাকালেন, তারপর বিনা ভূমিকায় শুরু করলেন 'মুক্তধারা'। এই প্রথম দেখা ও শোনা। সময় গড়াতে গড়াতে অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ কবে যে চিত্তদা হয়ে গেলেন, তা আজ আর মনে নেই। যেমন মনে নেই, কবে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পাকাপাকিভাবে স্কটিশ চার্চ-এ আসার আগে কিছুদিন তিনি মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে পড়িয়েছিলেন। সেখানে ছাত্র হিসেবে পেয়েছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। চিত্তদা-র রক্তে ছিল নাটক। তার নাগালের মধ্যে অজিতেশ, কুলোয় বাতাস লাগল। অজিতেশের সূত্রেই তাঁর জানাশোনা হল কেয়া চক্রবর্তী ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-র সঙ্গে। নাটক লিখতে শুরু করলেন চিত্তদা। তাঁর অধীর কলম ধারাবাহিকভাবে জন্ম দিতে লাগল পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক নাটক আর অনুবাদ-নাটকের। মনে আছে, তাঁর প্রথম অভিনীত একাঙ্ক নাটক 'কন্যকা'য় প্রথম মঞ্চে নেমে আমাদের অভিবাদন কুড়িয়েছিলেন কেয়া।

গল্পকার চিত্তদাকে আমি অবশ্য প্রথম আবিষ্কার করি ষাটের দশকের শেষে পরিচয় পত্রিকার দপ্তরে। এর মধ্যেই বিখ্যাত নাট্যপত্র বহুরূপী বছরের পর বছর সম্পাদনা করে রীতিমত সুনাম কুড়িয়েছিলেন তিনি। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পরিচয়-এর সম্পাদক। আমি তাঁর সহযোগী। শারদীয় সংখ্যার জন্য গল্প দিতে এসেছিলেন চিত্তদা। বহুকাল পর আমাকে দেখে খুব খুশি। বলা বাহুল্য, আমিও।

পটলডাঙার বাড়ি থেকে মাঝেমাঝেই গুটি গুটি পায়ে পরিচয় দপ্তরে এসে হাজির হতেন চিত্তদা। এসেই আমাকে বলতেন, এই শিষ্য, চা বল। যতক্ষণ থাকতেন, হাসি ঠাট্টা, গাল-গল্পে আমাদের ছোট্ট ঘরটা গুলজার করে রাখতেন তিনি। এমন মুক্ত, চমৎকার মানুষ খুব কমই দেখেছি।

নাটকপ্রাণ চিত্তদা-র নাটক নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ বা আলোচনা পড়ার সুযোগ হয়েছে আমাদের। তাছাড়া অসংখ্য-নাটকের সমালোচনাও লিখেছেন নানা কাগজে। কয়েকটি সেমিনার-এ তাঁকে বলতে শুনেছি। অল্প কথায়

গুছিয়ে বলতেন, বক্তৃতার বাহার ছিল না। অন্য যাই করুন না কেন, আসলে নাটকই ছিল তাঁর পৃথিবী।

যাকে বাজারি ভাষায় বলে মঞ্চসফলতা, তা পায়নি তাঁর 'নীলের পালা' 'অভিমন্যু' বা 'ডিরোজিও'। কিন্তু জ্যাকপট জিতেছিল অন্তত তাঁর তিনটি নাটক 'আন্তিগোনে', 'নটি বিনোদিনী' এবং 'নিধুবাবু-র গান' ও জীবন নিয়ে লেখা 'পিরিতি পরম নিধি।' তাছাড়া 'আত্মজা' ও অমরগীতি'র মত ছবির চিত্রনাট্যও লিখেছিলেন। পাশাপাশি অধ্যাপক হিসেবে তিনি বরাবরই অর্জন করেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের অকুণ্ঠ ভালবাসা। খুব ইচ্ছে ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনের বেঞ্চে বসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত একদিন তাঁর ক্লাস করি। এজন্মে হল না।

অসামান্য অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর অকালমৃত্যুর কিছুদিন পর চিত্তদা-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল কেয়ার কিছু লেখা ও কেয়া সম্পর্কে কিছু লেখা নিয়ে একটি মহার্ঘ বই—'কেয়ার বই।' শুটিং করতে গিয়ে গঙ্গায় ভেসে গিয়েছিলেন ডাকাবুকো তরুণী কেয়া। শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন তাঁর স্মরণে একটি মর্মস্পর্শী রচনা—'আগুন যখন জলে ঝাঁপ দেয়।' অনেক বই হারিয়ে গেছে, কিন্তু কেয়ার বই আমি আজও যত্ন করে আমার আলমারিতে বাঁচিয়ে রেখেছি। প্রিয় ছাত্রী ও শিষ্যা সম্পর্কে চিত্তদা-র সম্পাদিত এই স্মৃতি তর্পণের কোনও জুড়ি নেই।

বেশ কিছুদিন ধরেই রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন চিত্তদা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েছিলেন গতবছর। প্রথমে আক্রান্ত হয়েছিলেন 'পার্কিনসন্‌স ডিজিজ-এ। তারপর তা ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য অসুখে বাঁক নেয়। শুনেছি, কিছুকাল আগে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী ও নটবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী-কে নিয়ে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ সমাপ্ত করেছিলেন। একটি পত্রিকা মারফত জানলাম, তাঁর ওই রচনাটি প্রকাশিত হচ্ছে নাট্য আকাদেমি-র আসন্ন সংখ্যায়।

দুর্বল শরীর নিয়ে পটলডাঙা থেকে রিক্‌শা চেপে কয়েকমাস আগে শেষবার পরিচয়-এর দোতলার ঘরে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠে এসেছিলেন চিত্তদা। চা খেয়েছিলেন, ঠিক আগের মতই প্রাণ খুলে গল্পগুজব করেছিলেন। তারপর একসময় আমাকে বলেছিলেন, 'এই শিষ্য, আমাকে নামিয়ে নিয়ে একটা রিক্‌শায় তুলে দে।' দিয়েছিলাম। আপনার মৃত মুখ দেখবার সাহস বা শক্তি কোনোটাই অর্জন করতে পারিনি আমি। এই অকৃতার্থ ছাত্রকে নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন চিত্তদা।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

বাংলাদেশে সমাজ সংস্কারে এবং
সংস্কৃতি চর্চায় একেবারে সামনের
সারিতে রয়েছে ঠাকুর বাড়ির সবাই।
তাঁদের মধ্যেও আবার লেখালেখি
করতেন অনেকেই।
দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ থেকে
শুরু করে গগনেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী,
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, মাধুরিলতা
রথীন্দ্রনাথ, মীরা দেবী, প্রতিমা ঠাকুর—
এমন অনেকেই একদিন কলম ধরেছিলেন
ছোটদের জন্যে।

সেই সব লেখা নিয়েই
দুই বাংলায় এই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে

ঠাকুরবাড়ির লেখা

সম্পাদনা : অশোককুমার মিত্র

দাম : ৮০ টাকা

শিশুসাহিত্য সংসদ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯